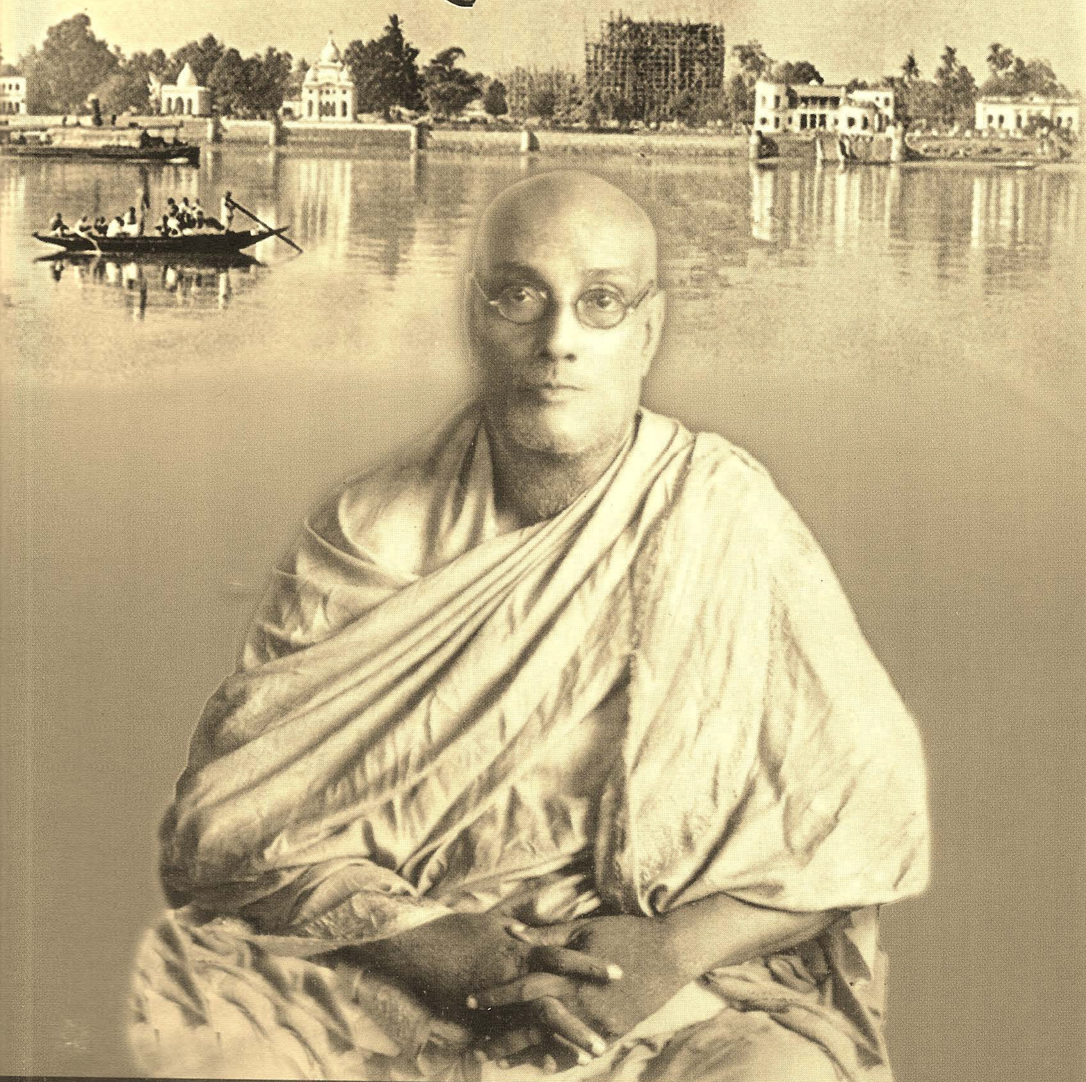
স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা



সঙ্কলক

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা

সঙ্কলক

স্বামী চেতনানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক :
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা—৭০০ ০০৩
e-mail : info@udbodhan.org

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ তিথি
১ জুন ২০১৪
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
2M2C

ISBN : 978-81-8040-570-9

মুদ্রক :
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা—৭০০ ০৩০
চলভাষ : ৯০৮৮৬৯৭২৭৪

প্রকাশকের নিবেদন

প্রাচীন ধর্মের ইতিহাসে অবতার-জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—অবতারগণের সঙ্গে সর্বদা একদল পার্ষদ আবির্ভূত হন, যাঁরা অবতার-জীবনে অনুসৃত সত্যসমূহ নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করাতে এবং তাঁদেরই প্রবর্তিত যুগধর্ম প্রবর্তনে ও জীবকল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করাতেই চরম সার্থকতা খুঁজে পান। শ্রীবুদ্ধ, ঈশামসি, চৈতন্য প্রমুখ অবতারগণের সপার্ষদ আগমন, ঐ সনাতন ধারারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মহাশক্তিধর পার্ষদগণের আগমনে উপরোক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মটিই যেন আগের চেয়ে আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্ম তথা পৃথিবীর ধর্মান্দোলনে যে নবজাগরণ এসেছে—তা এককথায় অভূতপূর্ব, সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অনন্তভাবের ঘনীভূত মূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি তাঁর সকল শিষ্যের মধ্যেই প্রবিষ্ট হয়েছিল। ঠাকুরের কঠোর ত্যাগ-তপস্যাপূর্ণ, অনুভূতিসমৃদ্ধ, অনন্তভাবময় জীবনের দিগ্‌দর্শনে তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসি-শিষ্যবর্গের জীবন, জগতের ধর্মাকাশে এক-একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় চিরকাল দীপ্যমান থাকবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্থ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। তিনি যে কীরকম অনুভূতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন—তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ঠাকুর একবার বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সম্পর্কে বলেছিলেন, "ওর জাম্বুবানের অংশে জন্ম, জ্যোতির্বিদ, ঘরবাড়ি করতে ভালবাসে। জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, 'অঙ্ক কষতে ভাল লাগে।' কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল; ও কম নয়।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একবার এক ভক্তকে বলেছিলেন, "হরিপ্রসন্ন মহারাজ (পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূর্বনাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ প্রমুখ সেজন্য তাঁকে ঐ নামেই ডাকতেন) এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছ? যাও, যাও, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে এসো। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বস্তুলাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর। আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে বসে আছেন, ওঁকে চেনা বড় মুশকিল। উনি বড় একটা ধরা দিতে চান না।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ নিজেকে এক দুর্ভেদ্য কঠোরতার আবরণে আবৃত করে রাখলেও শরণাগতের কল্যাণকামনা তাঁর চিত্তকে সদা অধিকার করে থাকত। তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁর মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই বিষয়ে তিনি তাঁর গুরুবাক্যকেই আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। সাংসারিকতা তাঁর অলৌকিক জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি—এক অপার্থিব ভাবে তিনি সদা অভিভূত থাকতেন। তাঁর সরলতার তুলনা হয় না। ঐ সরলতার জন্যই তিনি অতিমাত্রায় স্পষ্টবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্পষ্টভাষণে হুল না থাকায় লোকে অপমান বোধ করত না। তাঁর উপদেশসমূহ ও দেবজীবন আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

স্বেচ্ছায় বা অনুরুদ্ধ হয়ে ডায়েরি বা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বা পুস্তকে মহাপুরুষদের সম্পর্কে লিখিত স্মৃতিচারণার খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে কখনোই কোনো মহাপুরুষের সম্পূর্ণ চরিত্রায়ণ সম্ভব নয়; তবু এই স্মৃতিকথাগুলিই তাঁদের সম্পর্কে জানার ও তাঁদের স্মরণ-মননের একমাত্র সম্বল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি থেকে মহারাজজীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা'—সেইরূপ আরো একটি অমূল্য গ্রন্থ। স্বামী চেতনানন্দ মহারাজ সুদূর আমেরিকায় বসে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বইটির কাজ করতে গিয়ে যখনই আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করামাত্রই, যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় পরামর্শদানে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে আমাদের ভক্তিনত প্রণাম জানাই। এছাড়া তিনি একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন—যেটি পাঠ করলে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যাবে। বাহুল্যভয়ে সেপ্রসঙ্গের উল্লেখ থেকে বিরত হলাম।

তবে বইটি পাঠ করতে গিয়ে পাঠকসমাজ বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হবেন, যথা—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যথেষ্টই ঘটেছে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বা একই ঘটনায় একই ব্যক্তিকে আপনি/তুমি/তুই সম্বোধনের উল্লেখ বিভিন্ন স্মৃতিচারণায় পাওয়া যাবে, তথ্য বা তারিখ সংক্রান্ত কিছু বৈপরীত্য রয়েছে এবং বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। যদি এই ব্যাপারগুলিকে উপেক্ষা করে আমরা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনের মূলসুর অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরনির্ভরতা, ধ্যানপরায়ণতা, তীব্র বৈরাগ্য, সরলতা, পবিত্রতা, সত্যের প্রতি আঁট, মন তুলে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা, সময়ানুবর্তিতা, সঙ্ঘের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদির ভাবকে

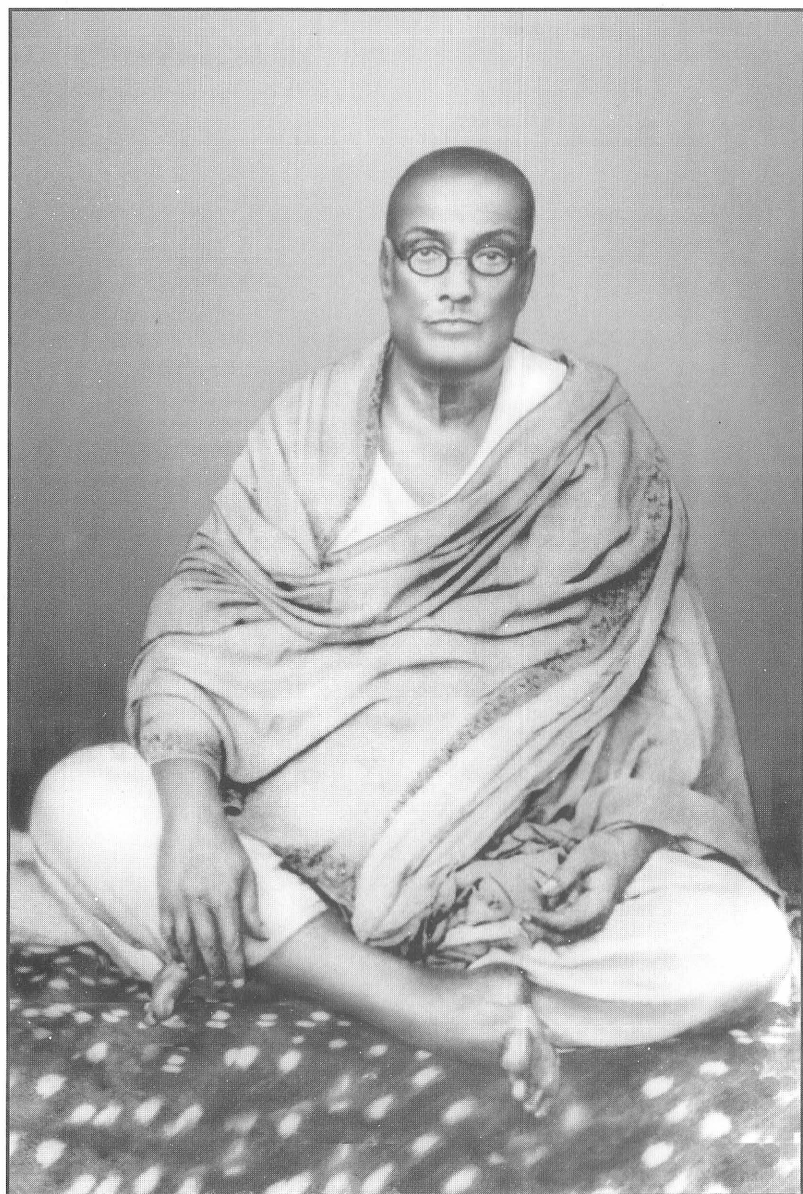
প্রকাশকের নিবেদন

সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করি—তাহলে প্রত্যেকে অবশ্যই উপকৃত হব।

বইটির প্রকাশনা-কার্যের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে প্রকাশনা-সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও স্বামী চেতনানন্দজীর বদান্যতায় বইটির মূল্য কম রাখা সম্ভব হলো। বইটি আগ্রহী সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে সহায়ক হোক—শ্রীরামকৃষ্ণচরণে এই প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণ তিথি
১ জুন ২০১৪

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
কার্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক



সূচিপত্র

ভূমিকা

ভূমিকা জীবনী নয়। এটি কোনো গ্রন্থের বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। ভূমিকা পড়লে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানা যায়। ভূমি বা বিষয়টি কা অর্থাৎ কীদৃশী—তা-ই হচ্ছে ভূমিকা। এই গ্রন্থটির নাম 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা'। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৮৬৮-১৯৩৮ খ্রিঃ) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্য। কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে যা দেখেছেন বা শিক্ষালাভ করেছেন, তা উদ্বোধন পত্রিকায় ও অন্যান্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই গ্রন্থটিতে ৪৩টি স্মৃতিকথা সঙ্কলিত হলো; এছাড়া, সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে আর একটি গ্রন্থে ৪২টি স্মৃতিকথা সঙ্কলন করেছেন। ('প্রত্যক্ষদর্শী' গ্রন্থে স্বামী শঙ্করানন্দ ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দের স্মৃতিচারণ সংক্ষিপ্তাকারে ছাপা হয়েছে, তাই এই 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে সেগুলি সম্পূর্ণাকারে দেওয়া হলো। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ উভয় গ্রন্থে প্রকাশিত হলো।)

শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের মূল্যবান সব স্মৃতি উদ্বোধন ও অন্যান্য পত্রিকা, নানান গ্রন্থ ও বিভিন্ন সাধুর ডায়েরিতে ছড়ানো রয়েছে—সেসব একত্র করে গ্রন্থাকারে ছাপানো এই স্মৃতি-সাহিত্যমালার মূল উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থটিতে আছে অধ্যাত্মজীবনের উপদেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজী ও অন্যান্য শিষ্যের জীবনকথা ও স্মৃতি, তাঁদের সাধনা ও সিদ্ধি এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস। এসব স্মৃতিকথা সন্ন্যাসী ও ভক্তসাধকদের অধ্যাত্মতৃষ্ণা মেটাবে, বহু প্রশ্নের উত্তর জোগাবে এবং লেখক ও গবেষকদেরও বৌদ্ধিক প্রয়োজন পূরণ করবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের এটাওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্মব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে ছিলেন। হরিপ্রসন্ন কাশীতে পড়াশোনা শুরু করেন এবং শেষে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান বেলঘরিয়াতে আসেন। তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন এবং পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ.এ., পাটনা কলেজ থেকে

বি.এ. এবং পুনা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পান। তারপর, কয়েক বছর চাকরি করে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন।

কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় তিনি বেলঘরিয়াতে দেওয়ানদের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন পান। ঠাকুরের সমাধিস্থ মুখখানি দেখে পরবর্তিকালে বলেছিলেন, "দেখলুম, যেন 'আনন্দে ফুটিফাটা'।" কী অপূর্ব উপমা। ফুটি কিংবা ডালিম পাকলে ফেটে যায়, তেমনই সমাধিস্থ মুখ আনন্দে আটখানা হয়।

যৌবনে কলেজ-জীবনে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়লেন এবং গুরুকে ঠেলে ঠেসে ধরলেন দেওয়ালের সঙ্গে। তারপর ঠাকুরের স্পর্শ থেকে একটি শক্তি এসে তাঁকে অভিভূত করে ফেলল। পরে বলতেন, "তখন ভেবেছিলাম জিতেছি, এখন কিন্তু দেখছি—হেরে গেছি। তিনিই আমার দেহ-মন-প্রাণ দখল করে নিয়েছেন।"

মন চঞ্চল, তার ওপর যৌবনকাল—ধ্যান হবে কী করে! হরিপ্রসন্নের ধ্যান হয় না শুনে ঠাকুর বললেন, "কিরে ধ্যান হয় না? কাছে আয়। জিভ বের কর।" ব্যস! ঠাকুর ঐ জিভের ওপর আঙুল দিয়ে একটা মন্ত্র লিখে দিয়ে বললেন, "যা, এবার পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যান কর।" তারপর ভাবে ও আনন্দে ভরপুর হয়ে হরিপ্রসন্ন পঞ্চবটীতে ধ্যানমগ্ন হলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে দেখেন—ঠাকুর কাছে বসে আছেন এবং বললেন, "এখন থেকে তোর গভীর ধ্যান হবে।" কী আশ্চর্য! ঠাকুর অন্যান্য গুরুর মতো চঞ্চলতা নিবারণের জন্য গীতার উপদেশ 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে' বা পতঞ্জলির সূত্র 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ' না বলে কেবল স্পর্শের দ্বারা শিষ্যকে ধ্যানমগ্ন করে দিলেন। এটি উত্তম অধিকারীর লক্ষণ।

হরিপ্রসন্ন ছাত্রাবস্থায় কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরে রাত কাটিয়েছেন। ঠাকুর একদিন তাঁকে বলেন, "দেখ, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটি যেন গায়ে না লাগে। সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি গেলেও সে-দিকে ফিরেও তাকাবিনি। তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। কাকে-ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না। তাই বলছি, খুব সাবধানে থাকবি।" এই গুরুবাক্য তিনি এমনভাবে পালন করেছিলেন যে, পরবর্তিকালে সাধনজীবনে এলাহাবাদ আশ্রমে মেথরের মেয়েকে পর্যন্ত প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। মহাপুরুষ মহারাজ

তাই মন্তব্য করেছিলেন, "পেসনের আশ্রমে একটা মেয়ে-মাছি পর্যন্ত ঢুকতে পারে না।"

গুরুর আদেশ পালন করেছিলেন বলে তিনি কিন্তু নারীজাতিকে অবজ্ঞা করেননি। পরবর্তিকালে তিনি বহু নারীকে দীক্ষা দিয়েছেন এবং একবার এক স্ত্রী ভক্তকে বলেন, "ঠাকুর বড় দুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা পায় না। মা বড় ভাল। মাকে দেখিয়ে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন—এঁকে ডাকবি। তাতেই আমার সব হয়ে গেল।"

বেলুড় মঠে একদিন কৌতূহলবশত বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, আপনি তো পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ ছিল—মেয়েদের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। আমাকেও বলেছিলেন, 'খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবিনি—হাজার ভক্তিমতী হলেও না।' তাই আমার মনে হচ্ছিল যে, আপনি কেন এমনধারা করলেন?" একথা শুনে স্বামীজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। খানিকক্ষণ পরে বিজ্ঞান মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস, ঠাকুর কি ততটুকুই? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস! জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন? আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কিরে? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছিলেন? তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন—স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই। তোরা নিজ নিজ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মেপে ঠাকুরকে এত ছোট করতে চাস! তাঁর কৃপা এ-দুনিয়ার সকল নর-নারী তো পাবেই—অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছাবে তাঁর কৃপার প্রভাব। তিনি তোকে যা বলেছেন, তা তো মিথ্যে নয়। সে খুবই সত্যি। তিনি তোকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তুই ঠিক সেভাবেই চলবি। কিন্তু আমাকে অন্যরূপ বলেছেন। বলেছেন কিরে, স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি হাত ধরে আমায় যা করাচ্ছেন—আমি তা-ই করছি।" ক্রমে স্বামীজী রুদ্রমূর্তি থেকে শান্তমূর্তি ধারণ করলে বিজ্ঞান মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতিটি শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লোকশিক্ষার জন্য গড়ে তুলেছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন খুবই গুরুগম্ভীর, সত্যনিষ্ঠ, কঠোর তপস্বী ও আত্মজ্ঞ; আবার অন্যদিকে শিশুর মতো সরল, পবিত্র ও হাসিঠাট্টা করে অন্যদের হাসাতেন। কখনো নীরব, কখনো মুখর। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের যেসব

লক্ষণ আছে সেগুলি বিজ্ঞানানন্দজীর জীবন, কথা ও আচরণে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চেহারা, বেশভূষা, কথাবার্তা, দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী দেখলে বা শুনলে মনে হতো—এ মানুষটি সাধারণ নন।

স্বামীজীর নির্দেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠের নির্মাণকার্য করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের প্ল্যান তৈরি করেন। পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ঐ মন্দিরে ঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে বহু তীর্থ ভ্রমণ করে শেষে এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি বহু বছর সাধনভজন, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্বামী শিবানন্দের মহাপ্রয়াণের পর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দের মহাপ্রয়াণের পর প্রেসিডেন্ট হন। ঐকালে তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বহু ভক্তকে দীক্ষা দিয়েছেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন অনুভূতিসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর বহু দেবদেবীর দর্শন হয়েছিল। প্রয়াগে একদিন সঙ্গমে স্নানের পর আশ্রমে ফিরবার পথে দেখলেন, দেবী ত্রিবেণী তিনটি বেণী দুলিয়ে তাঁর সামনে সামনে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল। একবার কাশীতে সেবাশ্রমের কাজের জন্য যান। পথে এক্কাগাড়ি উলটে যায়। তিনি খুব আঘাত পান এবং রাতে জ্বর হয়। তারপর বিশ্বনাথ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আলিঙ্গন করে যন্ত্রণা ও জ্বর দূর করে দেন। বর্মাদেশের পেগুতে তিনি একবার বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে যান। পরে সাধুদের বলেন, "বুদ্ধদেব কৃপা করে আজ আমায় দর্শন দিয়েছেন। দেখলাম, শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি জীবন্ত। তাঁর সৌন্দর্যের কী অপূর্ব বিভা।" কালীঘাটে মা-কালীর দর্শন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমায় মন্দিরের ভেতর নিয়ে গেল। খুব ভাল করে দর্শন ও স্পর্শন করলাম। তারপর যখন মাকে প্রদক্ষিণ করছি—মা কৃপা করে দর্শন দিলেন। কুলকুণ্ডলিনী সড়সড় করে উঠে সহস্রার একেবারে আলো করে দিলেন।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, "গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। ওঁকে চেনা মুশকিল। উনি কাউকে বড় একটা ধরা দিতে চান না।"

স্বল্পভাষী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আধ্যাত্মিক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে খুব অল্পকথায়, কখনো বা হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে, কখনো বা গম্ভীরভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

জটিল দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "তুমি বইতে পড়েছ—'সদা সত্যকথা কহিবে। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়' [অর্থাৎ লোভ ত্যাগ করবে]। এগুলি কার্যে পরিণত করো।" তিনি অপরের মনের কথা জানতে পারতেন। মাদ্রাজে একবার এক মহিলা সেজেগুজে এসে তাঁর কাছে উপদেশ চাইলেন। মহারাজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "Eat much, talk much, and quarrel much." (খুব করে খাও, অনেক কথা বলো, আর খুব ঝগড়া করো।) মহিলা সবার সামনে লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে রইলেন। মনে হয়, মহারাজ ঐ মহিলাটির ঝগড়াটে স্বভাবের কথা জানতে পেরেছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপদেশ হয়তো চিরদিনের জন্য তাঁর ঐ স্বভাবের পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

বিজ্ঞান মহারাজের বেশভূষা অদ্ভুত রকমের ছিল। জ্ঞানি-ব্যক্তিরা লোকসঙ্গ এড়াবার জন্য মনে হয় ঐরূপ করেন। নিজের খেয়ালমতো কদাকার ঢোলা, অনেকগুলি পকেটযুক্ত সুতোর বা ভোটকম্বলের জামা, সোয়েটার, কোট, কানঢাকা টুপি, হাঁটু পর্যন্ত গেরুয়া কাপড়, কখনো জীর্ণ জুতো-মোজা পরে রাস্তায় এক্কাগাড়ি করে যেতেন। লোকেরা তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। তিনি হেসে বলতেন, "ক্যা দেখতে হো? হাম বান্দর হ্যায়—রামজীকা বান্দর।" কী অহংশূন্যতা। এভাবেই mystic-রা আত্মগোপন করেন।

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কলম্বো যাওয়ার পথে তিনি মাদ্রাজ মঠে ওঠেন। তিনি যখন একটার পর একটা জামা গেঞ্জি খুলছিলেন, তখন জনৈক সন্ন্যাসী বলেন, "মহারাজ, ঠাকুর যে পেঁয়াজের খোসার কথা বলেছিলেন, এ তো প্রায় সেই রকম দেখছি।" শুনে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "শরীরের মধ্যেই তো পঞ্চকোষ, তার উপর আরো সাত-আটটা রেখেছি, নইলে লোকে যে আত্মাকে দেখে ফেলবে।" সবাই হেসে উঠল।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ জাগ্রদবস্থায় মায়ার সঙ্গে খেলা করেন। তাঁরা জানেন, জগৎ অনিত্য। লোকশিক্ষার জন্য মনকে নানা বস্তু বা বিভিন্ন hobby দিয়ে নিচে নামিয়ে রাখেন। তাঁর ফাউন্টেন পেনের শখ ছিল। অনেকগুলি দামি দামি পেন কালি ভরে পকেটে বা টেবিলে সাজিয়ে রাখতেন। ঐসব পেন দিয়ে লিখতেন বা বইয়ের অনুবাদ করতেন। পকেটে অনেকগুলি চাকু বা ছুরি রাখতেন। তাঁর অনেকগুলি পকেটঘড়িও ছিল। চা খেতে ভালবাসতেন এবং বাজার থেকে তাঁর জন্য দামি চা কেনা হতো। তাঁর কয়েকটা flask ও tea set ছিল। কোথাও যাওয়ার সময় তিনি একটা স্যুটকেসে তাঁর চায়ের সরঞ্জাম ও flask-এ চা নিতেন। একবার শুনলেন,

স্বামী শুদ্ধানন্দ প্লেনে চড়েছেন। বিজ্ঞান মহারাজেরও প্লেনে চড়বার ইচ্ছা হওয়ায় তার ব্যবস্থা হলো। এলাহাবাদে গ্রীষ্মকালে খুব গরম। তাই তাঁর তিনটে বিছানা থাকত—একটা উঠোনে, বৃষ্টি হলে বারান্দায়, আর খুব ঝড়বৃষ্টি হলে ঘরে শুতেন। সেবক বেণী ছাড়া আর কাউকে তাঁর ঘর পরিষ্কার করতে দিতেন না।

বিজ্ঞান মহারাজের কার্যপ্রণালীও ছিল অদ্ভুত। আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হঠাৎ কাজে ইস্তফা দেন। নতুন ডাক্তার আসতে বেশ বিলম্ব হবে। তখন মহারাজজী ভেবে দেখলেন—'এ তো ঠাকুরের কাজ, আমি তাঁর নাম করে একধার থেকে ওষুধ দিয়ে যাব'; করলেনও তা-ই। রোজ সময়মতো ডাক্তারখানায় গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে আলমারি থেকে ওষুধ এক-এক করে বার করে ফোঁটা ফোঁটা দিতে লাগলেন। কী রোগ বা কার রোগ তা শোনবার অপেক্ষা না করে ওষুধ দিতে লাগলেন এবং অভাবনীয় উপায়ে সব রোগীই আরোগ্যলাভ করতে লাগল। রোগীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। তাদের মুখের দিকে না তাকিয়ে ওষুধ দিতেন। কেউ যদি নিজের রোগের কথা বা শারীরিক অসুবিধার কথা শোনাতে চাইত, তিনি গম্ভীরভাবে বলতেন, "বেমারি কি বয়ান মাৎ কর। দাওয়াই লে কে চলা যাও।"

লোকমুখে প্রচার হলো এই অদ্ভুত ঘটনা। এক বার ওষুধ খেয়েই রোগ সেরে যেত; রোগীকে আর আসতে হতো না। এর ফলে রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। মহারাজ তখন বাধ্য হয়ে সত্বর কাশী থেকে একজন ডাক্তার আনালেন এবং নিজে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ডাক্তারবাবু তাঁর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেখবার জন্য আলমারি খুলতেই দেখেন, সব ওষুধই প্রায় শেষ—এমনকী, নাইট্রিক অ্যাসিড পর্যন্ত শেষ। ডাক্তার ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে বললেন, "করেছেন কী মহারাজ, এ যে নাইট্রিক অ্যাসিড পর্যন্ত শেষ!" মহারাজ সহজভাবেই উত্তর দিলেন, "ঠাকুরের নাম করে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ দিয়েছি, সবাই ভাল হলে কী করব!" একেই বলে গুরুভক্তি!

এই 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের দিব্যজীবন, দর্শন ও অনুভূতি, বিচিত্র আচরণ ও লোকব্যবহার, তাত্ত্বিক উপদেশ ও হাসিঠাট্টা, কার্যাবলি ও গ্রন্থরচনা, আত্মকথা ও ঠাকুর-স্বামীজী প্রমুখের স্মৃতিকথা, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতি ভালবাসা ও লোককল্যাণে তাঁর জীবন উৎসর্গ ইত্যাদি বিষয়ের কথা পাঠক জানতে পারবেন। বৈরাগ্য ও পবিত্রতা—এই দুই ডানায় ভর করে তিনি

পরমহংসের ন্যায় এই জগতে বিচরণ করতেন। মায়ার মালিন্য তাঁকে কোনোদিনই স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন মুক্তপুরুষ। তাঁর মন ও মুখ ভিন্ন ছিল না। ব্যবহারে কোনো আদবকায়দা, রীতিনীতি বা লোকে কী ভাববে বা বলবে—তার কোনো ধার তিনি ধারতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যের মতো বিজ্ঞান মহারাজ দীর্ঘদিন গুরুর সান্নিধ্যলাভ ও সেবা করতে পারেননি, তবে ঠাকুর তাঁকে অধ্যাত্মভাবে ভরপুর করে দিয়েছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁর নিজের একটি পট দেখিয়ে বললেন, "একে ধ্যান করবি। আমি এর মধ্যে আছি।" তারপর তিনি সারাজীবন গুরুর ধ্যানে এমন মগ্ন ছিলেন যে পরবর্তিকালে স্বামীজী বলতেন, "পেসন, আমি তোমার মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে পাই।" একেই বলে ধ্যান।

সত্যি বলতে কী, ঠাকুরের শিষ্যদের স্মৃতিকথা পড়তে ও শুনতে আমার ভাল লাগে। আমি অনুপ্রেরণা পাই। আশা করি, এই গ্রন্থপাঠে পাঠকবর্গও আমার মতো অনুপ্রেরণা পাবেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৪

স্বামী চেতনানন্দ
সেন্ট লুইস, আমেরিকা

প্রথম পর্ব

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জীবনকথা

স্বামী শঙ্করানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবন আদ্যোপান্ত বিমল পবিত্রতা, অপূর্ব ত্যাগ, অটল ভক্তি-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক আত্মনির্ভরতা প্রভৃতির আদর্শে মহিমান্বিত। একদিন বিদ্যালয় হইতে বাটি ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরস্থ রানি রাসমণির বাগানে যে পরমহংস বা 'পাগলা বামুন' থাকেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন। পরমহংসদেবের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ামাত্র তিনি তাঁহাকে ভিতরে আহ্বান করেন। পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতেই, তাঁহার বাটি কোথায়, তাঁহার নাম কী ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করেন এবং বলেন, "তুমি তো আপনার লোক।" পরে পরমহংসদেব তাঁহার নিজের নানাবিধ সাধন-অবস্থার কথা ও দর্শনাদির কথা বলিতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মা দর্শন দেবার পরে মনে হলো—'মা কি ঠিক দর্শন দিলেন, না একটা ভাঁওতা দিলেন। যদি ঠিক ঠিক দর্শন দিয়ে থাকেন, তাহলে ঐ (নহবতখানার সম্মুখে পতিত) পাথরখণ্ড নাচবে।' এই কথা মনে হওয়ামাত্র পাথরখণ্ড নাচতে লাগল।" ইহা শুনিয়া তিনি তখন মনে ভাবিলেন—'লোকে যে পাগল বলে ঠিক-ই—পাথর কখনো নাচে!' পরে পরমহংসদেব মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, কীভাবে জীবন পরিচালিত করিলে জীবন সফল হয়, এইসকল বিষয়ে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি ঐপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করেন এবং স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে বলেন। কীরূপ ধ্যান করিতে হইবে ও কীরূপ অনুভূতি ও দর্শনাদি হইবে তাহাও বলেন। নিজেকে বালকবৎ সরল ভাবিতে ও উলঙ্গ হইয়া ধ্যানধারণা করিতে শিক্ষা দেন। মোট কথা, এই প্রথম দিনেই পরমহংসদেব সারাজীবনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে কথাবার্তায় বিমুগ্ধ অবস্থায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায় এবং তিনিও বাটি ফিরিবার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান। অনেকক্ষণ পরে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করেন, "হ্যাঁ রে, তোর খিদে পেয়েছে?" তিনি ভাবিলেন—'কোন্ সকালে খেয়ে ইস্কুলে গেছি, আর খিদে পাবে না?' পরমহংসদেব রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে এর খিদে পেয়েছে, চারখানা লুচি ও সন্দেশ দে।" তিনি ভাবিলেন, 'এতে আমার আর কী হবে?' কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব বলিলেন, "হ্যাঁ রে, তোর ঘুম পাচ্ছে

দেখছি!'' এই কথা বলিয়া মেঝেতে একটা মাদুর পাতিয়া দিলেন ও বলিলেন, ''এর ওপর শো।'' একটা ছোট বালিশও দিলেন। নিদ্রাঘোরে তাঁহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর পরমহংসদেব একটা মশারি আনিয়া নিজে টাঙাইয়া দিলেন এবং মশারির চতুর্দিকে কয়েক বার পরিক্রমাপূর্বক কী-সব কথা অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন। নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি দেখিতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—'পাগলই বটে!' পরে নিদ্রিত হইলেন।

অনেকক্ষণ পরে উচ্চকণ্ঠের শব্দে এক-এক বার তাঁহার ঘুম ভাঙিতে লাগিল। এইরূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, ''তবে আমায় বকলমা দাও।'' রামবাবু এবং সুরেশবাবুসহ গিরিশবাবু ঐ রাত্রে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কখন ফিরিয়া যান, তিনি জানিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রত্যুষে তিনি উঠিতেই ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, ''কাল রাতে তোর ভাল ঘুম হয়নি। গিরিশরা সব এসেছিল, যেরকম জোরে সব কথা হচ্ছিল তাতে ঘুম না হবারই কথা।'' উত্তরে তিনি বলেন, ''আমি বেশ ঘুমিয়েছি। এখন বাড়ি যাব।''

সকালবেলা বাটিতে ফিরিতেই তাঁহার মাতাঠাকুরানি রণচণ্ডীমূর্তি ধারণ করিয়া রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ''কাল কোথায় থাকা হয়েছিল?'' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, ''দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছেন, তাঁর কথা শুনতে শুনতে রাত হওয়ায় সেখানেই ছিলাম।'' তাহাতে মাতাঠাকুরানি বলিলেন, ''ও সেই পাগলা বামুনের কাছে?'' তিনি বলিলেন, ''পাগলা কেন হবে! তিনি বেশ ভাল ভাল কথা বলেন।'' ইতোমধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সেইখানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ''ও দাদা, তুমিও সেই পাগলা বামুনের কাছে গিয়েছিলে? সে দুশো ছেলের মাথা খারাপ করেছে।'' তিনি বলিলেন, ''পরমহংস তো পাগল নন!'' তদুত্তরে ভগিনী বলিল, ''দাদা, তোমার মাথাটাও খারাপ করে দিয়েছে দেখছি।''

পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, ঠাকুর তাল ঠুকিয়া কুস্তি লড়িবার ভঙ্গিমায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হন। তিনিও জামার আস্তিন গুটাইয়া হাত বাড়ান। ঠাকুর তাঁহাকে ঠেলিতেই তিনিও তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া দেওয়ালে ঠেসিয়া ধরেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজেকে কেমন যেন অবশ বোধ করায় ভাবেন—'এ তো দেখছি, আমারই হার হলো।' ঠাকুর বলিলেন, ''আগে আমার গায়েও খুব জোর ছিল, এখন পেটের অসুখে ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে গেছি।'' এইরূপে কয়েক

[illegible] ঠাকুরের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। প্রথম দিনের ন্যায় আর কখনো [illegible] আলাপ-পরিচয়ের সুবিধা হয় নাই, কারণ পড়াশোনার জন্য তাঁহাকে অন্যত্র [illegible] করিতে হইয়াছিল।

[illegible]স্থায় তিনি যখন কলেজে বি.এ. পড়িতেছিলেন তখন ঠাকুরের দেহান্ত হয়। [illegible] পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাস করিয়া সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন [illegible] 'জেলা ইঞ্জিনিয়ার'-রূপে কার্য করেন। কর্মোপলক্ষ্যে গাজীপুরে অবস্থানকালে [illegible]দের কাহারো কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মঠ [illegible] জানিতে পারেন ও তদবধি মঠে প্রতিমাসে কিছু কিছু সাহায্য করিতে [illegible]। পরে স্বামীজীর আহ্বানে চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে চলিয়া [illegible]। মঠে গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি খুবই আনন্দলাভ করেন ও [illegible], "এরকম জানলে এত বছর কী আর চাকরিতে নষ্ট করতাম!" এই সময়ে [illegible] গঙ্গার উপর মঠনির্মাণের জন্য জমি খরিদ করা হয় এবং আলমবাজার [illegible] সকলে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাটিতে চলিয়া আসেন। এইখানে [illegible] মহারাজের তত্ত্বাবধানে মঠবাড়ি এবং পুরাতন ঠাকুরবাড়ি ও মঠবাড়ির [illegible] পোস্তার কিয়দংশ নির্মিত হইয়াছিল। মঠবাড়ির নির্মাণকার্য শেষ হইলে [illegible] স্বামীজী সকল গুরুভ্রাতা ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের সভা আহ্বানপূর্বক তাঁহাকে [illegible] ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ঐসময়ে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের সুবৃহৎ মন্দিরনির্মাণের [illegible] সম্পর্কে বিশদভাবে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। তিনি তদানীন্তন জনৈক [illegible] মিঃ গুয়ইথার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বর্তমান মন্দিরের [illegible] অঙ্কিত করেন। অতঃপর, বাংলাদেশে তাঁহার শরীর ভাল না থাকায় তিনি [illegible]স্থ 'ব্রহ্মবাদিন্' ক্লাবে গিয়া বাস করেন।

[illegible]বাদিন্ ক্লাব—রাস্তার ধারে দোতলার উপর দুইটি সরু ঘর; [illegible] ফুট × ৮ ফুট) ও (৮ ফুট × ৮ ফুট) মাত্র। রাস্তার দিকে ২ ফুট মাত্র সরু [illegible] বারান্দা। বাটির বাম পার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিবার জন্য বড় বড় ধাপের সোজা [illegible] ফুট চওড়া সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ছাদের উপর পর্যন্ত গিয়াছে। ছাদের উপর [illegible] পায়খানা।

[illegible]খানে তিনি দীর্ঘকাল দুইটি কেরোসিন স্টোভ জ্বালাইয়া ভাত ও একটিমাত্র [illegible] রান্না করিয়া খাইতেন। প্রত্যহ মেজর বি. ডি. বসুর বাড়িতে গিয়া [illegible] ভ্রাতা শ্রীশ বসুর সহিত কথাবার্তা বলিতেন। কয়েকখানি পুস্তক তাঁহাদের [illegible] অফিস হইতে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাকি সময় তিনি পাঠে ও

ধ্যানধারণায় মগ্ন থাকিতেন। এইখানে দোতলার উপর তিনি প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাও করিয়াছিলেন।

মুঠিগঞ্জের বর্তমান মঠবাড়িটি দোতলা-অবস্থায় ক্রয় করা হইলেও বর্ষান্তে বহুস্থানে ফাটল দেখা দেওয়ায় উপরতলা ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। তদবধি উহা একতলা মাত্রই আছে। তিনি মঠের পার্শ্বে ও সম্মুখে জমি লইয়া কার্যাদির প্রসার করেন এবং এইসময় হইতে তাঁহার সহকারিরূপে একজন থাকিতে আরম্ভ করেন। পাছে তাঁহার ধ্যানধারণার অসুবিধা হয়, সেই জন্য মঠবাড়ির মধ্যে তিনি রাতে কাহাকেও থাকিতে দিতেন না।

সঙ্ঘনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইবার পর, একদিন বর্তমান মুঠিগঞ্জ মঠের প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ''এতকাল এখানে কাটিয়েছি। কিন্তু এযাবৎ কোনো স্ত্রীলোক ঐ চৌকাঠের এ-দিকে আসতে পায়নি। এখন দীক্ষাদি দিতে হচ্ছে বলে আর সে-অবস্থা নেই।'' এই সূত্রে তিনি আরো বলেন, ''ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবের ছাদের ওপর খুড্ডি পায়খানা রোজ জমাদার এসে পরিষ্কার করত। একদিন দেখি, একটি যুবতী মেয়ে ওপরে গেল ও পায়খানা পরিষ্কার করে নেমে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হেসে চলে গেল। আমি ওপর থেকে রাস্তার দিকের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললাম, 'কাল থেকে আর পরিষ্কার করার আবশ্যক হবে না। কেউ যেন আর না আসে।'" সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে জমাদার এই সংবাদ শুনিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবা, একটা জরুরি কাজ পড়ায় আমায় যেতে হয়েছিল। সেজন্য মেয়েকে এখানে কাজ করতে বলে গিয়েছিলাম। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করুন।" তিনি জমাদারকে বলিলেন, "কাল থেকে কাউকেও আসতে হবে না। আমি সরকারি পায়খানায় যাব।" পরে জমাদারের বহু কাকুতিতে তিনি বলিলেন, ''তুমি নিজে আসতে পার তো এসো। অন্য কাউকে পাঠিয়ো না।'' কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, ''এই জগৎ মায়ের রাজ্য। মায়েরাই এই জগৎ চালাচ্ছেন।''

তিনি একবার যিশুখ্রিস্টের শিষ্যগণের ছবি দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর উহা পাওয়া গেলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন, ''হ্যাঁ, ঠিকই।'' সম্ভবতঃ, পূর্বে ভাবনেত্রে যাহা দেখিয়াছিলেন, উহা ঠিক তদনুরূপ হইয়াছিল।

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের পথ তিনি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং

তাহার একটি নক্সাও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে দিবার ইচ্ছা ছিল।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর পরিকল্পিত শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির-নির্মাণকার্য ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হইলে, তিনি পুরানো ঠাকুরঘর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন মন্দিরে স্থাপনা করিয়া যেন জীবনের শেষকর্তব্য পালন করিলেন। ইতঃপূর্বে স্বামীজী যে-মন্দিরের অনুমোদিত নক্সা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই মন্দির বিজ্ঞান মহারাজের সম্মুখেই নির্মিত হইল ও তাঁহার দ্বারাই শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন মন্দিরে আনীত হইয়া সকলের হৃদয়ে শান্তি এবং আনন্দের উৎস খুলিয়া দিলেন। এই আনন্দদায়ক চিন্তাতেই তিনি জীবনের সকল দায়িত্বের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন।

(উৎস ঃ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)

বিজ্ঞান মহারাজের প্রসঙ্গে

স্বামী শঙ্করানন্দ

এমন লোক দেখেছি, যিনি কারোর সেবা নিতেন না—শরীর যাওয়ার কয়েক দিন আগে পর্যন্ত কোনো লোককে কাছে আসতে দিতেন না। কিছুই খেতেন না—না পথ্য, না ওষুধ। ইচ্ছা হলো তো এক বোতল লেমনেড আনিয়ে নিতেন, সেটাই দু-তিন বার একটু একটু খেতেন। তিনি হচ্ছেন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। আমায় কী ভালটাই না বাসতেন! একবার বললেন, ‘‘আচ্ছা, এখন কেয়াফুল পাওয়া যাবে?’’ তখন গরমকাল। আমি বললাম, ‘‘এখন পাওয়া যায় না। তবে কেয়ার আতর কিংবা কেয়ার নির্যাস পাওয়া যেতে পারে। তাতে কি আপনার চলবে?’’ তিনি বললেন, ‘‘না। আমার কেয়াফুলই দরকার।’’ মনে পড়ে গেল, পুরীতে এসময়ে পাওয়া যায়। বললাম, ‘‘চেষ্টা করে দেখতে পারি। তিন দিন সময় দিতে হবে—পুরীতে লিখে ব্যবস্থা করতে।’’ বললেন, ‘‘আমার কাছ থেকে পোস্টকার্ড নিয়ে এখনই লিখে দাও।’’ লিখে দিলাম এক ভক্তকে। এমনই যোগাযোগ যে, যে-দিন আমার চিঠি পুরীতে পৌঁছাল, সে-দিনই ‘দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’-এর মালিক বিভূতিভূষণ চৌধুরী কলকাতায় ফিরে আসবে। সে সপ্তাহখানেক আগেই পুরী গিয়েছিল। সত্যকাম, আপ্তকাম পুরুষের বাক্য নিষ্ফল হয় না। বিভূতিকে ভক্তটি দশটা কেয়াফুল দিল—যাতে সে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। সে অতিযত্নে ফুলগুলি নিয়ে এল ও কলকাতায় পৌঁছেই পার্সেল করে মহারাজজীকে পাঠিয়ে দিল। চতুর্থ দিনে বিজ্ঞান মহারাজের নামে পার্সেল এসে হাজির। ফুল পেয়ে খুব খুশি। ঐ বিভূতিভূষণ বিজ্ঞান মহারাজের চেলা। তার গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। সে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে এলাহাবাদ আশ্রমে ফি-মাসে মোটা টাকা চাঁদা দেয়। বিজ্ঞান মহারাজের জন্মতিথির দিনে মঠে প্রতি বছর সে তার দোকানের যাবতীয় মিষ্টি ও খাবার তৈরি করিয়ে নিজে গাড়িতে করে এসে দিয়ে যায়। ফুলগুলি দিয়ে বিজ্ঞান মহারাজ ঠাকুরকে সাজালেন। ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজানো, ঠাকুরঘরটিকে ঝকঝকে তকতকে করে রাখা—তাঁর একটা নেশার মতো ছিল। আমায় একবার যিশুখ্রিস্টের সব শিষ্যের ছবি জোগাড় করে আনতে বললেন। আমি কলকাতায় ঘুরে ঘুরে খ্রিস্টানদের publication office থেকে ছবিগুলি কিনে তাঁকে পাঠিয়ে

দিই। সেগুলি পাওয়ামাত্র আনন্দ প্রকাশ করে আমায় এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। আমার ওপর তাঁর যেমন ছিল গভীর ভালবাসা, তেমন ছিল অগাধ বিশ্বাস। এইসব মহাপুরুষের কৃপা ও আশীর্বাদের জোরে বিপদ-আপদ-বিপর্যয়-বাধাবিঘ্ন ঠেলে জীবনের শেষসীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। জীবনের খেয়াঘাটে সূর্য নিত্য ওঠে আর ডোবে, আমার জীবন-সন্ধ্যায় এবার ভানু অস্ত গেলে আর উদিত হবে না।

ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি ঃ

কৈশোরে বিজ্ঞান মহারাজ ঠাকুরকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, "কুস্তি লড়তে পারিস?" উনি বললেন, "পারি বইকি।" ঠাকুর বললেন, "আমার সঙ্গে একহাত লড় তো।" বিজ্ঞান মহারাজ তো হেসেই খুন। ঠাকুরের সঙ্গে কী কুস্তি লড়বেন! তখন ঠাকুর নিজেই তাঁর হাত ধরে কুস্তি শুরু করলেন। বিজ্ঞান মহারাজ এক মিনিটের মধ্যেই ঠাকুরকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে কোণঠাসা করে ফেললেন। তখন ঠাকুর বললেন, "আমি এখন বুড়ো হয়েছি, তাই তোর সঙ্গে পারলুম না। আগে হলে পারতিস না।"

পরে ঠাকুরকে বিজ্ঞান মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার?"

উত্তরে ঠাকুর বলেন, "ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। যেমন জল আর বরফ। তোর কীসে বিশ্বাস? সাকারে? তা বেশ। তিনি ভক্তের নিকট সাকার, জ্ঞানীর নিকট নিরাকার।"

কলকাতার এক ভক্তের কাছা ধরে টান ঃ

কলকাতা থেকে একজন ভক্ত এসে ঐসময় প্রণাম করতেই ঠাকুর বলে উঠলেন, "তোমার গত রোববার আসার কথা ছিল, তুমি এলে না? আমি দু-তিন বার পোস্তার কাছে গিয়ে ঘরে ফিরে এলুম। মনে মনে বললুম—'কথারই ঠিক নেই, তা আবার ধর্ম করবে!' তা তোমার পরিবার ঐসময় কাছা ধরে টেনেছিল, তাই না?"

ভদ্রলোক শুনেই অবাক হয়ে বললেন, "হ্যাঁ মশায়, আপনি কী করে জানলেন?"

ঠাকুর বললেন, "তা জানা যায় গো বাবু, জানা যায়।"

ভক্তটি বলতে লাগলেন, "আমি সে-দিন আসব মনে করে ঘর থেকে বেরুচ্ছি, এমনসময় আমার স্ত্রী এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি দক্ষিণেশ্বরে

যাচ্ছি শুনেই আমার কাছা ধরে টেনে ঘরে নিয়ে চলল এবং বলল, 'ও! ঐ পাগলা বামুনের কাছে? তা হবে না। আজ রোববার, এসো, গল্পটল্প করা যাক।' তাই আসতে পারলুম না। তা মশাই, ঐ-ব্যাপার তো কলকাতায় হলো। আপনি ওখানকার ঘটনা কী করে জানলেন, তাই ভাবছি!"

ঠাকুর বললেন, "মা আমাকে সব দেখিয়ে দেন গো।"

এসব কথা শুনে বিজ্ঞান মহারাজ ভাবলেন—'তবে তো তাঁর কাছে কিছু গোপন থাকবে না। দুষ্টুমি করলেও তিনি টের পাবেন।'

ভদ্রলোকটি চলে গেলে ঠাকুর বিজ্ঞান মহারাজকে বললেন, "দেখ দেখি, কথার ঠিক রাখতে পারে না, কী করে ধর্ম করবে! কথার ঠিক রাখতে হয়। আমি যদি ভুলেও বলে ফেলি ঝাউতলায় যাব, আমাকে যেতেই হবে।"

Search light-এর আলো ঃ

একদিন বিজ্ঞান মহারাজ বেশি রাতে কলকাতা থেকে মঠে ফিরছেন। মঠের দক্ষিণের সদর ফটক সবেমাত্র পার হয়েছেন, দেখেন—একটা search light-এর (সন্ধানী আলো) মতো light পড়ছে। প্রথমে ভাবলেন—গঙ্গার ওপর দিয়ে বোধ হয় স্টিমার আসছে। কিন্তু যতই সামনে এগোচ্ছেন, দেখেন—light স্টিমারের নয়, স্বামীজীর ঘর থেকে আসছে।

ঠাকুরের ভোগ এবং ত্রিনয়ন ঃ

বিজ্ঞান মহারাজ একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, ঠাকুরকে যে ভোগ দিই, তিনি তা গ্রহণ করেন?" উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, "গ্রহণ করেন বইকি। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে একটা ray (রশ্মি) ভোগের ওপরে পড়ে। তিনি তা গ্রহণ করে পূর্ণ করে দেন। দেখতে চাস তো আজ ঠাকুরঘরে তোকে দেখাব।"

গঙ্গাজল মহৌষধ ঃ

বিজ্ঞান মহারাজ দেহত্যাগের কিছুদিন আগে থেকেই অসুখে ভুগছিলেন। তাঁর পা একটু ফুলেছিল। ঐ-অবস্থায় তিনি মঠে এসেছিলেন। প্রাচীন সাধুরা তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, "মহারাজ, আমরা এখানকার একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে আপনার চিকিৎসা করাতে চাই। আপনি অনুমতি দিলে সব ব্যবস্থা করব।"

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ আমাকে তো একজন বিজ্ঞ ডাক্তার দেখছেন।

সাধুগণ ঃ এলাহাবাদে আপনি বুঝি ডাক্তার দেখিয়েছেন?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরই আমায় দেখছেন। সাধুর আবার ওষুধ কী, গঙ্গাজলই মহৌষধ।

পেসন, মন্দিরের plan কর দেখি ঃ

বিজ্ঞানানন্দজী একবার বলেছিলেন, "আমি স্বামীজীকে বড় ভয় করতুম বলে তাঁর সামনে দিয়ে বেশি চলাফেরা করতুম না। হঠাৎ একদিন তাঁর সামনে পড়ে গেলুম। তিনি বললেন, 'পেসন, চল আমার ঘরে।' তাঁর পেছন পেছন গেলুম। তিনি বললেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় মন্দির করতে হবে। তুই একটা নক্সা আঁক দেখি।'

"আমিও সেইভাবে নক্সা করলুম। তিনি দেখে খুশি হলেন। আমি বললুম, 'আপনার plan (নক্সা)-মতো মন্দির করতে গেলে কয়েক লাখ টাকার দরকার। কী করে হবে, স্বামীজী?'

"তিনি বললেন, 'তোরা পরে করবি। আমি idea (ভাব) দিয়ে গেলাম। আমি পরে ওপর থেকে দেখব।'

"ঠাকুরের ইচ্ছায় সেই মন্দির এতকাল পরে হলো। স্বামীজীর কথা মিথ্যা হতে পারে না। কী করে যে সাত লাখ টাকা আমেরিকা থেকে এসে গেল, তা ঠাকুরই জানেন। স্বামীজী বলেছিলেন, তিনি ওপর থেকে দেখবেন—সেকথাও সত্য হলো। দেখলুম, সত্যি সত্যি তিনি মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন ওপর থেকে দেখছেন। দেখে আমার চোখে জল এল।"

এলাহাবাদে বিজ্ঞান মহারাজ খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। সন্ধ্যার পর তাঁর ঘরে কেউ যেতে পারতেন না। ভক্ত হলেও কোনো স্ত্রীলোক তাঁর আশ্রমপ্রাঙ্গণে যেতে পারতেন না।

(উৎস ঃ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা ও স্বামী শঙ্করানন্দ)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

"যখন যেভাবে মাগো রাখিবে আমারে,
সেই সে মঙ্গল, যদি না ভুলি তোমারে।"

ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যেও এই ভাবটি দেখা যেত। বিজ্ঞান মহারাজের তখন শারীরিক অসুস্থতা চলছে। তাঁর আশ্রিত জনৈক ধনিভক্ত অতি বিনীতভাবে তাঁর কাছে বলছে, "মহারাজ! একজন বড় ডাক্তার দেখালে হয় না?" বিজ্ঞান মহারাজ মাঝে মাঝে বেশ মজার উত্তর দিতেন। বললেন, "হ্যাঁ, তা তো হয়।" ভক্তটি ভরসা পেয়ে অতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, "আচ্ছা মহারাজ! তাহলে বড় ডাক্তার আনি?" তিনি উত্তর দিলেন, "কিন্তু কী জান, আমি একজন ডাক্তারের চিকিৎসায় আছি, তাঁর থেকেও কি তোমার ডাক্তার বড়?" ভক্তটির ইচ্ছা ছিল, তখনকার বড় ডাক্তার নীলরতন সরকারকে আনে। ভক্তটি বলল, "ডাক্তার নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার এদেশে আর নেই।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "কিন্তু আমার ডাক্তার যে তোমার ডাক্তারের চেয়েও বড়—তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার ত্রিভুবনে নেই।" ভক্তটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তিনি কে?" উত্তরে মহারাজ সামনে-টাঙানো ঠাকুরের ছবিটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন। ভক্তটি চুপ হয়ে গেল। কেমন নির্ভরতা!

আরেক বার বিজ্ঞান মহারাজকে জনৈক ভক্ত এসে বলছে, "মহারাজ, আপনি ঠাকুরের সন্তান, আপনি চলে গেলে ঠাকুরের কাজ কী করে চলবে?" বিজ্ঞান মহারাজ বেশিরভাগ সময় চুপ করে থাকতেন—যেন অন্যমনস্ক। বারবার তিন বার যখন ভক্তটি প্রশ্ন করল, তখন তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বললে? ঠাকুরের কাজ? 'ঠাকুরের কাজ' এটি বিশ্বাস হয়?" ভক্তটি ঘাড় নাড়ল। মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন, "ঠাকুরের কাজ হলে ঠাকুরই চালাবেন। আমি কে?"

কী নিরভিমানতা! আমি করছি—এই বোধই নেই। সব ঠাকুর করছেন—এই তাঁর ও তাঁদের ভাব।

একদিন রাজা মহারাজ আর বিজ্ঞান মহারাজ কথা বলছেন, তখন স্বামীজীর ঘরের কাছে গঙ্গার ঘাটটা তৈরি হচ্ছে। নৌকায় করে চুন আসার কথা। মহারাজ বললেন, "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মুশকিল হবে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "না না, বৃষ্টি হবে না।" মহারাজ তখন বললেন, "হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "না, কোথাও কিছু নেই, বৃষ্টি হবে না।" তখন দশ টাকা বাজি ফেলা হলো। নৌকা যখন প্রায় ঘাটের কাছাকাছি এসেছে—তখন মেঘ নেই, কিছু নেই, হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল। তখন রাজা মহারাজ বললেন, "দে, দে, বাজির টাকাটা দে।" এমনি ওঁদের ছেলেমানুষি ছিল।

মহারাজের মজা করার অনেক ঘটনা মনে পড়ছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান মহারাজকে নিয়ে একটি ঘটনা এখন বলব। বিজ্ঞান মহারাজ তখন মঠে স্বামীজীর মন্দিরের কাজ দেখছিলেন। মঠে তখন স্বামী অভেদানন্দও আছেন। শীতের সকাল। মহারাজ মঠবাড়ির দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বিজ্ঞান মহারাজের জন্য কলকাতা থেকে একটা গরম পাঞ্জাবি তৈরি করিয়ে আনা হয়েছে। পাঞ্জাবি দেখে মহারাজ খুব খুশি। আমাকে বললেন, "দেখ সুয্যি, পেসনকে[১] নিয়ে একটু মজা করতে হবে। তুই গঙ্গাজলের পাত্রটা ঠিক করে রাখ। পেসনকে জামাটা 'সম্প্রদান' করতে হবে।" হঠাৎ দেখা গেল, রামলালদা[২] মঠের ঘাটে নৌকা থেকে নামছেন। রামলালদাকে দেখে মহারাজ খুব খুশি। বললেন, "ভাল হয়েছে, রামলালদা-ই সম্প্রদান করবেন।" রামলালদা দোতলায় এসে পৌঁছালেন। দু-একটি কথার পরই জামাটা কীভাবে বিজ্ঞান মহারাজকে সম্প্রদান করা হবে, মহারাজ তার পদ্ধতি রামলালদাকে বোঝাতে লাগলেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান মহারাজও এসে গিয়েছেন। তিনি দেখলেন, মহারাজ রামলালদার সঙ্গে আস্তে আস্তে কী কথা বলছেন। মহারাজকে তো তিনি জানতেন, আর মহারাজের সঙ্গে রামলালদার রসিকতার সম্পর্কটিও তিনি জানতেন। তাঁর আশঙ্কা হলো, তাঁকে নিয়েই বোধ হয় উভয়ের কোনো ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি সোজা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে নিয়ে কী-সব মতলব হচ্ছে?" মহারাজ ভালমানুষের মতো বললেন, "তোমার জন্য একটা জামা আনিয়েছি, সেটা তোমায় দেব। মতলব আবার কী?" বিজ্ঞান মহারাজ নতুন জামা কিছুতেই নেবেন না, আর মহারাজও ছাড়বেন না। তাঁর ভয়, জামা দেওয়ার পিছনে মহারাজের নিশ্চয়ই

---

১ এই নামে স্বামীজী, রাজা মহারাজ এবং মহাপুরুষ মহারাজ বিজ্ঞান মহারাজকে ডাকতেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'হরিপ্রসন্ন'। 'হরিপ্রসন্ন'-র 'প্রসন্ন' থেকে 'পেসন'।

২ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়।

কোনো দুষ্টুমির মতলব আছে। শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে মহারাজ তাঁকে রাজি করালেন। মহারাজের আদেশে বিজ্ঞান মহারাজ টুপি, গলাবন্ধ কোট ইত্যাদি খুলে নতুন গরম পাঞ্জাবিটা পরলেন। মহারাজ রামলালদাকে চোখের ইশারা করলেন। মুখে বললেন, ''তবে দাদা, এবার হোক।'' রামলালদা কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মহারাজের রচিত কী-সব উদ্ভট মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। বিপদ্‌গ্রস্ত বিজ্ঞান মহারাজ ব্যাপার-স্যাপার দেখে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। মহারাজও চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন। উলটো দিক থেকে অভেদানন্দ মহারাজ তখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দু-জনের মধ্যে পড়ে বিজ্ঞান মহারাজের ছোট ছেলের মতো সে কী হাত-পা ছোঁড়া! তা দেখে উপস্থিত সকলে হেসে কুটিপাটি।

(উৎস ঃ দেবলোকের কথা)

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুধর্মে যে নবজাগরণ আসিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব, সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর। বর্তমান মহাজাগরণের তুলনায় পূর্ব পূর্ব জাগরণ ক্ষুদ্র, নগণ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যেই তাঁহার বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশিত ও কার্যকরী হইয়াছিল। তিনি স্থূলদেহে অবস্থানকালেই বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাও একবার ভাবাবেশে দর্শন করেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র বিবেকানন্দের মধ্যে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহার সকল শিষ্যের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি সকল শিষ্যের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছিল। শিষ্যগণ বুঝিতেন ও বলিতেন—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরই আছেন, তাঁহাদের আমিত্ব নাই। যিনি এক জন শিষ্যকেও দর্শন করিয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকেই দর্শন করিয়াছেন। যিনি এক জন শিষ্যের কৃপা পাইয়াছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপা পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অনন্তভাবের ঘনীভূত মূর্তি। তাঁহার এক একটি ভাব তাঁহার এক-একজন শিষ্যে মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহারা যখন একত্রিত হইতেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তথায় পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যগণ অভেদ। তাঁহার এক জন শিষ্যকে চিন্তা বা আশ্রয় করিলে, তাঁহাকেই চিন্তা বা আশ্রয় করা হয়। তাঁহার কোনো শিষ্য যাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরই কৃপা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর তাঁহার শিষ্যগণের পদতলে বসিয়া সহস্র সহস্র সংসারতপ্ত নর-নারী শান্তিলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহাদের বাক্যে, দর্শনে বা স্পর্শে শত শত ব্যক্তির সংসার-জ্বালা দূরীভূত হইয়াছে। শিষ্যগণের প্রত্যেকেরই ছিল বিরাট ব্যক্তিত্ব, অসীম আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিক জীবন ও দিব্যজ্ঞান। যিনি এক জন শিষ্যেরও পূতসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন; ইহা অপরকে বোঝানো অসম্ভব। কিন্তু হায়! তাঁহারা সকলেই স্বধামে প্রস্থিত! তাঁহাদের দেখিয়া বিশ্বাস করিবার সুযোগ আর নাই। তবে তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ পাঠেও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের দিব্যসঙ্গ লাভ হয়, আমাদের অশেষ কল্যাণ ও চিত্তশুদ্ধি হয়।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অন্যতম। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট (অধ্যক্ষ) হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ পরমহংস বলিয়া মনে হইত। তিনি এক দুর্ভেদ্য কঠোরতার আবরণে নিজেকে সদা আবৃত রাখিতেন। রুদ্রভাবের মধ্যেও যে করুণা কোমলতা প্রকাশিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। তিনি যেন ইহজগতের লোকই ছিলেন না। স্বামী মাধবানন্দজী সত্যই লিখিয়াছেন[১] ঃ "তীব্র বৈরাগ্য ছিল তাঁহার মহান চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। এই বিষয়ে তিনি তাঁহার গুরুবাক্যকেই আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্য। তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও দেবজীবন আমাদের স্বর্গীয় সম্পদ। এক অপার্থিবভাবে তিনি সদা অভিভূত থাকিতেন; ঐহিক কোনো বিষয়েই তাঁহার ভ্রুক্ষেপ থাকিত না। মহাপণ্ডিত হইয়াও তিনি মূর্খবৎ বিচরণ করিতেন। বজ্রবৎ কঠোর হইলেও শরণাগতের কল্যাণকামনা তাঁহার চিত্তকে সদা অধিকার করিয়া থাকিত। সাংসারিকতা তাঁহার অলৌকিক জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

পূর্বাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, রাশনাম পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি বাসস্থান ছিল ২৪ পরগনা জেলার অন্তঃপাতী বেলঘরিয়ায়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর শুক্রবার বৈকুণ্ঠ-চতুর্দশীর দিন[২] পিতার কর্মস্থল এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তারকনাথ ইংরেজ সরকারের কমিশারেটে কাজ করিতেন। অনুমান, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারকনাথের দুই পুত্র—হরিপ্রসন্ন ও হরিকমল। কনিষ্ঠ হরিকমল ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যানসার রোগে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। হরিপ্রসন্ন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তাঁহার চার ভগিনী ছিল—গিরিবালা, রজনীবালা, ক্ষীরোদবালা ও সাবিত্রীবালা। ভগিনীদের মধ্যে গিরিবালা দেবী পাটনায় থাকিতেন এবং তাঁহার দুই পুত্র আজও বর্তমান।

শৈশবে কাশীধামের নিজবাটিতে (বাঙালিটোলা, নাথুসার, ব্রহ্মপুরী) থাকিয়া নসীরাম সরকারের পাঠশালায় হরিপ্রসন্ন পড়িতেন। পরে বাঙালিটোলা হাইস্কুলে প্রায় দুই বৎসর (১৮৭৭-৭৮ খ্রিঃ) পড়িয়াছিলেন। সেই স্কুলে স্বামী নির্মলানন্দজী, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ বরদাপ্রসন্ন দত্ত প্রমুখ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অতঃপর তিনি কলকাতায় পড়িবার জন্য বেলঘরিয়াস্থ আদি বাসস্থানে

১ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জুন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২ কাশী সেবাশ্রমের পুরাতন পঞ্জিকা দেখিয়া জন্মতারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আসেন। তাঁহার বাল্যকাল বেলঘরিয়াতেই কাটিয়াছিল। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার হেয়ার স্কুল হইতে ১৫ বৎসর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং ইহাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি বেলঘরিয়া হইতে প্রত্যহ বি. সি. রেলওয়ের (বর্তমান বি. এ. রেলওয়ে) গাড়িতে কলকাতায় যাতায়াত করিতেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ.এ. পাস করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন বহুবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল। স্বামী সারদানন্দজী, কুমিল্লার বরদাসুন্দর পাল, 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উক্ত কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় কোয়েটাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং মাতা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বেলঘরিয়া গ্রামে দেহত্যাগ করেন। হরিপ্রসন্নের এক জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন; তাঁহার নাম যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি খুব বড় হঠযোগী ছিলেন এবং অনেক প্রকার আসন, প্রাণায়াম, নেতি-ধৌতি অভ্যাস করিতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থাও বেশ উন্নত ছিল। তাঁহার কথা আলিগড়ের এক ভদ্রলোকের নিকট স্বামী বিরজানন্দজী শুনিয়াছিলেন। উক্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে হরিপ্রসন্নের এই জ্যেষ্ঠতাত মাঝে মাঝে থাকিতেন। হরিপ্রসন্ন উক্ত জ্যেষ্ঠতাতকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। উল্লিখিত ভদ্রলোকের সহিত হরিপ্রসন্নের খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও তিনি কখনো কখনো আলিগড় যাইয়া তাঁহার বাড়িতে থাকিতেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিপ্রসন্ন সত্যানুরাগী ছিলেন। একবার তাঁহার জননী নকুলেশ্বরী দেবী কোনো বিষয়ে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষারোপ করেন। হরিপ্রসন্ন পুনঃপুন প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও জননী পুত্রের কথায় বিশ্বাস করেন নাই। তখন তিনি ক্ষোভে উত্তর দিলেন, "আমি যদি মিথ্যাকথা বলে থাকি, তবে আমি ব্রাহ্মণ নই।" ইহা বলিয়া তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলেন। মাতা উক্ত অশুভ কার্যে অত্যন্ত শঙ্কিতা ও দুঃখিতা হইয়া বলিয়াছিলেন, "কী ভয়ানক অকল্যাণ করলি?" দৈব-দুর্বিপাকে উহার পরদিনই তারযোগে কোয়েটা হইতে পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিল। শোকসন্তপ্তা জননী উক্ত দুঃসংবাদ-শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "তোর অভিশাপেই এমনটি হলো।"

আরেক দিনের ঘটনা ঃ একদিন তিনি তাঁহার বাটির বাঁশঝাড়ের দিক হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, একটি হনুমান বন্দুকের গুলি খাইয়া চিৎ হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। উহার নিকটে যাইয়া তিনি স্পষ্টই শুনিতে পাইলেন, হনুমানটি হাতজোড় করিয়া 'রামনাম' দুই বার উচ্চারণপূর্বক প্রাণত্যাগ করিল।

বি.এ. পড়িবার জন্য হরিপ্রসন্নকে তাঁহার ভগিনীপতি নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে বাঁকিপুরে থাকিতে হয়। তথায় তিনি আলাদা বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিতেন এবং পাটনা কলেজে পড়িতেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পাটনা কলেজ হইতে তিনি বি.এ. পাস করেন। অতঃপর তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য পুনায় গমন করেন। পুনাতে ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহার এক জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাকে মাসিক পঁচিশ টাকা পাঠাইতেন। তিনি উহার মধ্য হইতেই পনেরো টাকা খাওয়া-থাকার জন্য খরচ করিতেন। বাকি দশ টাকায় কলেজের বেতন, কাপড়-জামা, পুস্তকাদির খরচ চালাইতেন। পুনাতে স্বল্পব্যয়ে পড়া হইত বলিয়া বাঙালি ছাত্রগণ শিবপুরে পূর্তবিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও পুনা যাইতেন। পুনা কলেজটির পুরা নাম ছিল—পুনা কলেজ অব্ সায়েন্স। উহাতে একটি পূর্তবিভাগ ছিল। সেই বিভাগে অনেক বাঙালি ছাত্র পড়িতেন। বাঙালি ছাত্রগণ পুনাতে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য বাঙালি মেস খুলিয়াছিলেন। কলেজের নিকটেই একটি বড় ভূতুড়ে বাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতেই মেস করিয়াছিলেন। ভূতুড়ে বাড়ি বলিয়া উহা মাসিক মাত্র সাত টাকা ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছিল, নচেৎ উহার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা হইত। পুনাতে হরিপ্রসন্নের অবস্থানকালে মাত্র সাত জন বাঙালি ছাত্র ছিলেন। সহপাঠিগণের সম্মতিক্রমে তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, পূর্তবিভাগে পড়িবার জন্য যেসকল পুস্তক ও যন্ত্রপাতির আবশ্যক হইবে সেই সমুদয় প্রথমে যাঁহারা খরিদ করিবেন, তাঁহারা ছাড়াও মেসের সকল ছাত্রই সেসকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। পাঠান্তে উক্ত মেসেই সেইগুলি থাকিবে, কেহ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এইগুলি পরবর্তী বাঙালি ছাত্রদের ব্যবহারে লাগিবে।

সেই সময় এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া পুনা যাইতে হইত। তখন বি. এন. রেলওয়ে চালু হয় নাই। এলাহাবাদের সরকারি ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার খুব সদাশয় ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। বহু বাঙালি তাঁহার গৃহে অতিথি হইত। হরিপ্রসন্নও পুনা যাইবার পথে একবার মহেন্দ্রবাবুর বাসায় দুই দিন আতিথ্যগ্রহণ করেন। এই অল্পসময়ের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। হরিপ্রসন্ন যখন পুনাতে ছিলেন তখন মহেন্দ্রবাবু কার্যোপলক্ষ্যে তথায় গিয়া একটি হোটেলে উঠেন। হরিপ্রসন্ন তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিজেদের বাঙালি মেসে আনিয়া খুব আদরযত্ন করেন। মহেন্দ্রবাবুও বাজার হইতে উৎকৃষ্ট সবজি, ফল ও মিষ্টান্নাদি আনিয়া বাঙালি মেসের ছাত্রদের খাওয়াইয়াছিলেন। পুনা কলেজের নিয়মানুসারে ছাত্রদেরকে চার বৎসর পড়িতে ও দুই বার পরীক্ষা দিতে হইত। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কলেজে একটি নূতন বিভাগ খোলা

হয়। উহাতে তিন বৎসর পড়িবার ও প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। হরিপ্রসন্ন নূতন বিভাগে ভর্তি হন। তাঁহার সহপাঠী রাধিকাপ্রসাদ রায়ও নূতন বিভাগে পড়িতে লাগিলেন। বাকি পাঁচ জন বাঙালি ছাত্র পুরাতন বিভাগেই রহিলেন। কলেজের পূর্তবিভাগের বেতন বাৎসরিক মাত্র ১০০ টাকা ছিল।

কলেজের এই নিয়ম ছিল যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্য হইতে যে দুই জন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহারা যথাক্রমে বোম্বাই সরকার ও ভারত সরকারে চাকরি পাইবেন। রাধিকাবাবু মেধাবি-ছাত্র হইলেও হরিপ্রসন্ন যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে কাহারো সন্দেহ ছিল না। জনৈক মারাঠি যুবক এম.এ. পাস করিয়া মহীশূর সরকারের বৃত্তি পাইয়া তাঁহাদের সহিত পড়িতেন। তিনি সকল বিষয়ে ভাল ছাত্র ছিলেন। সকলের বিশ্বাস ছিল, সেই মারাঠি যুবকই প্রথম স্থান অধিকার করিবেন। রাধিকাপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি কলেজ হইতে একটি বৃত্তি লইয়া পড়িতেন এবং সরকারি চাকরি পাইবার চেষ্টায় ছিলেন। অন্ততঃ দ্বিতীয় স্থান অধিকার না করিলে সরকারি চাকরি পাইবার আশা কম—ইহা জানিয়া হরিপ্রসন্ন রাধিকাপ্রসাদকে বলিলেন, ''ভাই, তোমার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অতএব, তুমি যদি পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হতে পার, তবে একটি সরকারি চাকরি পাবে। সেজন্য আমি এ-বছর পরীক্ষা না দিয়ে পরের বছর দেব।'' যদিও রাধিকাবাবু পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি হরিপ্রসন্নের মহানুভবতা ও বন্ধুপ্রীতির কথা আজীবন স্মরণ করিতেন ও তাঁহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ হরিপ্রসন্নের পরীক্ষার শেষ বৎসর হইলেও তিনি পরবর্তী বৎসরে উক্ত পরীক্ষা দিলেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি এল.সি.ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পুনা কলেজের ক্যালেন্ডার হইতে জানা যায়, সেই বৎসর ভাণ্ডারকর বিঠল সীতারাম নামক এক মারাঠি যুবক প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বোম্বাই সরকারে চাকরি পান। পরীক্ষায় হরিপ্রসন্নের দ্বিতীয় হইবার একটি বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের কলেজে জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রি ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন উক্ত অধ্যাপক যখন ক্লাসে পড়াইতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তখন পার্শ্ববর্তী মাঠে একটি গরু চরিতেছিল। পাদ্রি অধ্যাপক পরিহাসচ্ছলে হিন্দুছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "Lo Lo, your grandfather is grazing." (দেখো, দেখো, তোমাদের পিতামহ চরিয়া বেড়াইতেছে।) হিন্দুগণ জন্মান্তর-বিশ্বাসী, কিন্তু খ্রিস্টানগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। হিন্দুগণের এই বিশ্বাসকে পরিহাস করিবার উদ্দেশ্যেই অধ্যাপক উক্ত মন্তব্য করেন। হরিপ্রসন্ন

অপর ছাত্রগণের ন্যায় স্বধর্মের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তর দিলেন, "Your Christ is a son of a virgin lady and you call him the son of God. How do you explain it?" অধ্যাপক জবাব না দিলেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং হরিপ্রসন্নের শেষ পরীক্ষার উত্তরপত্রাদি অত্যন্ত কঠোরতার সহিত দেখেন। ভূতত্ত্বে একটু কম নম্বর পাওয়ায় হরিপ্রসন্ন প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মেসের সাত জন ছাত্রের মধ্যে চার জন ব্রাহ্মণ ও দুই জন বৈদ্য এবং একমাত্র রাধিকাবাবু কায়স্থ ছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে হরিপ্রসন্ন ও আরেক জন ছাত্র নিত্য যথাসময়ে নিষ্ঠার সহিত গায়ত্রী জপ করিতেন। প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদেরকে বোম্বাই যাইতে হইত। তাঁহাদের মেসে এক বৃদ্ধা মারাঠি ব্রাহ্মণী রান্নাদি করিত। সে মাছ-মাংস খাইত না। ছাত্রদের মাছ-মাংস খাইতে ইচ্ছা হইলে নিজেদের রান্না করিয়া খাইতে হইত। তাঁহাদের এক সহপাঠী (খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বোম্বাইতে হৃদ্‌রোগে মারা যান। তাঁহার সৎকার করিবার জন্য হরিপ্রসন্ন ও তাঁহার সহপাঠিগণকে রানাডে নামক এক মারাঠি ভদ্রলোক যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সুদূরপ্রবাসী বাঙালি যুবকদের বিশেষ অসুবিধা হইত। রানাডের পরোপকারিতার প্রশংসা হরিপ্রসন্নের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যাইত।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রসন্ন গাজীপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন। ইহাই তাঁহার প্রথম চাকরি। গাজীপুর U.P.-তে অবস্থিত। তখন U.P. Govt. নাম ছিল না, N.W.P. Govt.—এই নাম ছিল। হরিপ্রসন্নের কর্মকালে গাজীপুর-বেনারস রোড তাঁহার তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হয়। কর্মজীবনে গাজীপুরে অবস্থানকালে তিনি কয়েক বার পওহারীবাবার দর্শনলাভ করেন এবং স্বামী অভেদানন্দ একবার তাঁহার অতিথি হন। গাজীপুর ব্যতীত তিনি স্বীয় জন্মস্থান এটাওয়া, বুলন্দশহর, মীরাট এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি স্থানে ভারত সরকারের অধীনে চাকরি করেন। গাজীপুরে তিনি যখন চাকরি করিতেন তখন তথাকার মুনসেফ শ্রীশচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। শ্রীশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর মেজর বামনদাস বসু (আই.এম.এস.) হরিপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উত্তরকালে এই দুই বন্ধুর পরিচালিত পাণিনি অফিস (এলাহাবাদ) হইতে হরিপ্রসন্ন কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত কয়েকখানি হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন যখন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু বিপ্রদাস বিশ্বাসের এটাওয়াস্থ বাড়িতে এবং গাজীপুরে থাকিতে শ্রীশবাবুর বাড়িতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ আতিথ্য গ্রহণ করেন। উভয় স্থানেই স্বামীজীর সহিত হরিপ্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। এইসময় হইতেই তিনি সংসার

ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। হরিপ্রসন্ন ঘোড়ায় চড়িতে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার তিনটি ঘোড়া ছিল। তিনি সমস্তদিন ঘোড়ায় চড়িয়া কাজকর্মের তদারকি করিতেন। তিনি যখন চাকরি ত্যাগ করেন তখন উপরিস্থ ইঞ্জিনিয়ার তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে গাজীপুরে প্রমোশন দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি বিরক্ত হইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে যখন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের (বাবুরাম মহারাজ) নিকট শ্রীবৃন্দাবনধামে কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিয়া স্বামী বিরজানন্দজী কঠোর সাধনভজনে দিনাতিপাত করিতেছিলেন, সেইসময় বৃষ্টিতে ভেজা এবং নানা কারণে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি ব্রঙ্কাইটিস ও বুকধড়ফড়ানি (Bronchitis and palpitation of heart) ইত্যাদি রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকেন। পূজনীয় প্রেমানন্দ মহারাজ তাঁহার জন্য বিশেষ পথ্যাদি ও দুধের বন্দোবস্ত করা সত্ত্বেও তাঁহার শরীর সারিতেছিল না। তখন প্রেমানন্দজী বলিলেন, "দেখো, এটাওয়াতে হরিপ্রসন্ন আছেন। তিনি ওখানকার সরকারি ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর ওখানে যাবে? তিনি ওখানকার সিভিল সার্জনকে দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত করতে পারেন এবং তাঁর ওখানে গেলে বায়ু পরিবর্তনও হবে। চলো, সেখানে যাওয়া যাক।" ইহাতে বিরজানন্দজী বলিলেন, "হরিপ্রসন্নবাবু কে?" উত্তরে বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন শিষ্য ও পরমভক্ত; ছেলেবয়সে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। পুনাতে পূর্তকার্য (Engineering) শিক্ষা করে এখন তিনি সরকারি চাকরি করছেন। আলমবাজার মঠের যখন আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল তখন দৈবযোগে আমাদের কোনো গুরুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি মঠের ও আমাদের সকলকার খবর পেয়ে আলমবাজার মঠে মাসিক যাট টাকা হিসাবে সাহায্য পাঠাতে থাকেন। তিনি খুব ভদ্র ও ভক্ত লোক। তাঁর ওখানে গেলে তিনি আমাদের বিশেষ যত্ন করে রাখবেন।" এইসকল শুনিয়া বিরজানন্দজী বলিলেন, "বেশ তো, আপনার যখন মনে হচ্ছে সেখানে গেলে ভাল হয়, এতে আমার আর কী আপত্তি হতে পারে।" অতঃপর পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ এটাওয়াতে পত্র লিখিয়া সকল বিষয় স্থির করেন ও তথায় বিরজানন্দজীকে লইয়া যান। তাঁহাদের দেখিয়া হরিপ্রসন্ন অতিশয় আনন্দিত হন এবং খুব যত্নের সহিত সিভিল সার্জন দ্বারা বিরজানন্দজীর চিকিৎসা ও পথ্যাদির

বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারবাবু বিরজানন্দজীকে দেখিয়া সামান্য ঔষধের বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু বেশ পুষ্টিকর খাদ্য খাইবার ও কিছু কিছু ব্যায়াম করিবার নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী হরিপ্রসন্ন সমস্ত কিছুর বন্দোবস্ত করেন।

তাঁহারা আরো দেখিলেন যে, অর্থব্যয়ে হরিপ্রসন্নের হস্ত উন্মুক্ত। বামুন ও চাপরাশিদের সর্বদা হুকুম করিতেন, "ঘি লে আও, দুধ লে আও, অচ্ছী অচ্ছী চিজে লে আও।" সেইসময় হরিপ্রসন্নের একটি টমটম গাড়ি ও একটি বড় ঘোড়া ছিল। তাহাতে তিনি অফিসে যাতায়াত ও সরকারি কার্যাদি তদারক করিতে যাইতেন। হরিপ্রসন্ন বিরজানন্দজীকে উক্ত ঘোড়ায় চড়িয়া সকালে দুই-চার মাইল বেড়াইতে বলেন। উত্তরে পূজনীয় বিরজানন্দ মহারাজ বলেন, "আমি তো কখনো ঘোড়ায় চড়িনি। কেমন করে তা শেখা যায়?" ইহাতে হরিপ্রসন্ন বলেন, "সহিস সঙ্গে থাকবে ও ঘোড়া বেশি জোরে না চালালেই চলবে।" প্রত্যহ প্রাতে চা খাওয়ার পর বিরজানন্দ মহারাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সহিসের সহিত বেড়াইতে যাইতেন এবং দুই-এক মাইল বেড়াইয়া ফিরিতেন। ইহাতেই তাঁহার বেশ ব্যায়ামের কাজ হইত। পরে দুপুরবেলা সকলেরই একসঙ্গে স্নানাহার হইত। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ মাছ-মাংস খাইতেন না। হরিপ্রসন্ন খাইতে বসিয়া জোর করিয়া বিরজানন্দ মহারাজের পাতে ঘি, মাছ, তরকারি প্রভৃতি দেওয়াইতেন।

তখন বিকালে হরিপ্রসন্নের বাংলোতে অনেক ভদ্রলোক প্রায়ই আসিতেন। উঠানে চেয়ারের উপর সকলে বসিয়া গল্প ও কথাবার্তাদি বলিতেন। ঐ সময় একজন বাঙালি ভদ্রলোক (জঙ্গি মিলিটারি বিভাগের, সম্ভবতঃ রসদের ঠিকাদার) আসিতেন। তিনি খুব আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন এবং সিপাহি বিদ্রোহ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যাইত—কীরূপে তাঁহারা ভয়ে দিন কাটাইতেন, কীরূপে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করেন ইত্যাদি। ঐসব ঘটনা ও গল্প শুনিতে সকলেরই বেশ আনন্দ হইত। হরিপ্রসন্ন খুব কম কথা কহিতেন। বাবুরাম মহারাজের সহিত তাঁহার শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক কথা হইত। এইরকম আনন্দে হরিপ্রসন্নের নিকট তাঁহারা এক মাস ছিলেন। তাঁহার যত্নে এবং আহার ও ব্যায়ামাদিতে বিরজানন্দ মহারাজ ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করিলেন এবং স্বামী প্রেমানন্দজীও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইলে পুনরায় উভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিলেন। তাঁহাদের ফিরিবার স্বল্পকাল পরেই হরিপ্রসন্ন চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৯তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

সন্তোদ্যানে পুষ্পচয়ন

স্বামী বাসুদেবানন্দ

এলাহাবাদ সেবাশ্রমে যখন (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, গ্রীষ্মকাল) আমাদের ডিসপেনসারিতে কম্পাউন্ডারি করতাম, তখন কয়েক দিন ঝুসিতে ছিলাম। সেখানে এক বড় গুহায় স্বামী মাধবানন্দ পুরী নামে একজন প্রাচীন সাধু ছিলেন, ঠিক সমুদ্রগুপ্তের কুয়োর সামনে। তাঁর কাছ থেকে অনেক তত্ত্বকথা শুনতাম। তিনি দুপুরে শুয়ে শুয়ে গীতার শ্লোক মুখস্থ বলতেন ও বিশ্রাম করতেন। যে-দিন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো, দাঁড়িয়ে আছি দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ জী, তুম্ ক্যা মাঙ্গতে হো?", "কহাঁসে আতে হো?", "কহাঁ যাওগে?" ইত্যাদি। আমার সঙ্গে দেবতা মহারাজ ছিলেন—তিনি একবার তাঁর চিকিৎসাও করেছিলেন। তিনি হিন্দিতে বললেন, "আমাদের এখানে হাসপাতাল আছে, সেখানে গরিবদের সেবা হয়।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুম্হারে গুরুমহারাজ কৌন মহাত্মা?" আমি বললাম, "মেরা সন্ন্যাসগুরু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দপুরী মহারাজ।" শুনে বললেন, "উনকো মৈঁ পহচান্তা হুঁ, উন কে সঙ্গ ছোড়কে তুম ইধর-উধর ঘুমতে হো কিঁউ? বে তো সিদ্ধপুরুষ হৈঁ। উনকী সেবা করনে সে তো সব কুছ হী মিল সকতা হৈ। গুরুকা স্থান মেঁ কুত্তেকে মাফিক পড়ে রহো।" আমি বললাম, "আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল, তাই এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছি এবং সেবার কাজও করি।" জিজ্ঞাসা করলেন, "ইসকে বাদ কহাঁ যাওগে?" দেবতা মহারাজ আমার হয়ে উত্তর দিলেন, "উসকা একদফে হরিদ্বার যানেকা মতলব হৈ।" শুনে হাসতে হাসতে বললেন, "হাঁ হাঁ, একদফে লক্ষ্ণৌ যাও, একদফে কানপুর যানা—হমেশা ঘুমতে হী রহো। বহুত রোজ অগাড়ি হৃষীকেশ মেঁ উনকে সাথ মুলাকাত হোনে কা সৌভাগ্য মেরা হুয়া থা। তুম্হারা উচিত হৈ উনহীকে সাথ সাথ রহনা। তুম্হারী উমর বহুত কম হৈ—জানতে হো সৎসঙ্গ সে সবহী কুছ মিল সকতা হৈ।" আমার মনে আছে, তিনি তাঁর গুহাতে নানা দেবদেবী ও মহাপুরুষের ছবির সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিও একখানি রেখেছিলেন। সেসময় কাশী সেবাশ্রমের চারুবাবু ও টাঙ্গাইলের শঙ্করও ঝুসিতে ছিলেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এলাহাবাদ আশ্রমের ছাদে শুয়ে শুয়ে

বিজ্ঞান মহারাজ নানান বিষয় আলোচনা করতেন; আকাশের নক্ষত্রগুলি দেখিয়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র বোঝাতেন; কখনো কখনো রামানুজ-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হতো। বলতেন, "শ্রীভাষ্যটা বেশ ভাল করে পড়ো, সেব্য-সেবক ভাব নিয়ে শরীরধারণ করাই ভাল। শঙ্করের অদ্বৈত নিয়ে থাকা খুব উত্তম অধিকারীর পক্ষেও কঠিন। রামানুজ চার ভাবে উপাসনার কথা বলেছেন, প্রথম ঃ বৈকুণ্ঠনাথ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ভগবান, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, অনন্তকল্যাণগুণ-মহোদধি; দ্বিতীয় ঃ অন্তর্যামিরূপে সর্বজীব ও জড়ে বর্তমান—সুতোয় যেমন মালা গাঁথা, তাঁতে তেমনই জীবজগৎ গ্রথিত রয়েছে; তৃতীয় ঃ অবতার—যিনি লোকশিক্ষা, সাধু ও ধর্মরক্ষা আর ভক্তদের দর্শন দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হন এবং চতুর্থঃ অর্চা (বিগ্রহ)—যেখানে ভক্তিতে প্রকট হয়ে থাকেন। এর মধ্যে সবগুলোই বেশ ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় এবং এর কোনো একটির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে সংসারে বেশ সেব্য-সেবক ভাব নিয়ে থাকা যায়।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাকুর যাঁদের ঈশ্বরকোটি বলেছেন, তাঁরা সকলেই কি সমান? তাঁরা শক্তিমান হয়েও স্বামীজীর মতো সকলে কাজ করে গেলেন না কেন?" তিনি বললেন, "সকলে সমান শক্তিসম্পন্ন না হলেও তাঁরা প্রত্যেকেই এমন শক্তিধর ছিলেন, যা ত্রিভুবনে অতুলনীয়। এঁরা হলেন খুব ভাল race-horse; যদি বা একবার হোঁচট খায়, উঠে কিন্তু এমন দৌড় দেবে যে, তাদের এক ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার ছ-মাস লেগে যাবে। ঠাকুর স্বামীজীকে ফুলের মধ্যে সহস্রদল, ঘট-কলসির মধ্যে জালা বলতেন। দেখো—কাজ করানো, না করানো ঠাকুরের ইচ্ছা; তিনি যাকে দিয়ে যা করাবেন, তাকে তা-ই করতে হবে। মহাশক্তিমান হলেও তাঁর ইচ্ছা না থাকলে সে পঙ্গু হয়ে যায়। যদুবংশ-ধ্বংসের পর অর্জুন গাণ্ডিব তুলতে পারলেন না; আহিররা এসে যদুদের স্ত্রীলোক ধরে নিয়ে যেতে লাগল। স্বামীজীর দিব্য-ঘরের চাবিকাঠিটি ঠাকুর তুলে রাখলেন, কাজ শেষ হলে তবে খুলে দিলেন। ঈশ্বরকৃপাতেই জীবের পুরুষকারের স্ফূর্তি হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এক জ্যৈষ্ঠের রাতে এলাহাবাদ আশ্রমের ছাদে একদিন কথাপ্রসঙ্গে হরিপ্রসন্ন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দজী) সম্বন্ধে বললেন, "কাশীর বটুকনাথ ভৈরব দেহধারণ করে অদ্বৈতাশ্রমে বসেছিলেন, এখন মঠে গেছেন।" আমি একদিন বিজ্ঞান মহারাজকে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথমদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, "ঠাকুর আমাকে দেখে কী জানি কেন, হুঙ্কার দিয়ে তাল ঠুকে দাঁড়ালেন এবং আমিও যন্ত্রচালিতের মতো

আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়ালুম—দু-জনে ঠেলাঠেলি। পরে জানলুম, তিনি ভাবমুখে ঐরূপ করেন।'' গোলাপ-মায়েরা বলতেন, ''পরমহংসদেব ওর (বিজ্ঞান মহারাজ) সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'ওর জাম্বুবানের অংশে জন্ম, জ্যোতির্বিদ, ঘরবাড়ি করতে ভালবাসে। জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, অঙ্ক কষতে খুব ভাল লাগে। কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল; ও কম নয়।'''

একদিন ছাদে দক্ষিণ দিগন্তের একটি তারা দেখিয়ে বললেন, ''উনি অগস্ত্য। তাঁর দক্ষিণ-যাত্রার প্রতীকরূপে দাক্ষিণাত্যে ও যবদ্বীপে তাঁর মূর্তি আছে। তিনিই ঐসব দেশে আর্যসভ্যতা প্রথম প্রচার করেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও বণিক ওসব দেশে যেত, কিন্তু রাবণের জাতভাইরা তাদের ওপর অত্যাচার করত, সেজন্য শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সীতাহরণকে উপলক্ষ্য করে সবংশে রাবণের সংহার করলেন। আবার বানররাজ বালীও খুব অত্যাচারী ছিলেন, সেজন্য তাঁকেও বধ করলেন। তারপর ওদেশে শান্তি স্থাপিত হলো।'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''তিনি অন্তরাল থেকে বালীকে বধ করলেন কেন?'' তিনি বললেন, ''বালীর বর ছিল, যুদ্ধকালে যে তাঁর দিকে তাকাবে, সে-ই হীনবল হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র কোনো দেবতা বা ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘন করতেন না। হনুমান, অঙ্গদ এক লাফে সাগর পার হয়ে গেল, কিন্তু রামচন্দ্র নিজে 'কী করে সাগর পার হব' বলে আকুল! সীতার শোকে ব্রহ্মাস্ত্রে সাগর শুষ্ক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মহিমায় শিলা জলে ভাসল! দেখালেন, কারোর জন্য শোক করা ভাল নয়। শোক তমোগুণ থেকে ওঠে এবং তা থেকে আবার ক্রোধ হয়। রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান হয়েও নিজে শোক নিয়ে জীবকে দেখালেন যে, শোক কী ভীষণ বস্তু!

"সতীর শোকে শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন, ক্রোধে মদনভস্ম করলেন। অর্জুন শোকগ্রস্ত হয়ে ধর্মযুদ্ধ ও দুষ্টের দমনে বিরত হয়েছিলেন, ভগবানের কথাও শুনতে চাননি। ভগবান কত বুঝিয়ে, ভয় দেখিয়ে তবে রাজি করালেন—'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি', 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব', 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে', 'নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ'—এসব বলতে লাগলেন এবং শেষে বিশ্বরূপ দেখিয়ে যুদ্ধে রাজি করালেন। শোক তমোগুণ থেকে ওঠে, তাতে লোক মোহগ্রস্ত হয়, মোহ থেকে লোকে আত্মহত্যা করে অথবা ক্রোধে অপরকে হত্যা করে। আবার একেবারে নিশ্চেষ্ট জড় হয়ে থাকতে চায়, গুরুবাক্যও অবহেলা করে। সেজন্য শরীরে তমোগুণ আসতে দিতে নেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, ''সন্ন্যাসীর মদনভস্মে দোষ কী?'' বললেন, ''সন্ন্যাসী হিংসা করবে না, কারণ সে তো সর্বভূতকে অভয় দিয়েছে! ভাগবতে

(১১ স্কন্ধ, ৪ অধ্যায়) দেখো, নারায়ণঋষি তপস্যা করছিলেন; ইন্দ্র বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্য কামদেব ও অপ্সরাদেরকে পাঠালেন। পুরাণে দেখা যায়, নরঋষি তাঁদের দেখে যোগদণ্ড নিয়ে তাড়া করলেন। নারায়ণঋষি বললেন, 'ভাই এরা আমাদের আশ্রমের অতিথি, তুমি অতিথি-সৎকার না করে এদের তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? তখন নারায়ণের শ্রীঅঙ্গ থেকে অপূর্ব সুন্দরীরা বেরোলেন। তার মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী—নারায়ণের উরু থেকে বেরিয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর নাম উর্বশী। তাঁরা বায়ু, কামদেবাদিকে নানারকমে খাইয়েদাইয়ে সেবা করলেন। সবশেষে নারায়ণ উর্বশীকে তাঁদের দান করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন। এরই নাম সত্ত্বগুণের সংযম। নিঃশেষরূপে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। আমাদের ঠাকুরের মধ্যে সংযম পূর্ণভাবে বিরাজ করত। ঠাকুরই আমাদের আদর্শ। তোমরা সংযমী হও, তবে তো ব্রহ্মজ্ঞানী হবে।"

* * *

একদিন বেলুড় মঠের দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় হরিপ্রসন্ন মহারাজ (তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট) বসে আছেন, গঙ্গাবক্ষ চন্দ্রোদ্ভাসিত—বললেন, "কেমন সুন্দর জায়গায় স্বামীজী মঠ করেছেন। কিন্তু তবু কী জান, চাঁদের আলো ভোগীর জন্য, আর অন্ধকার যোগীর জন্য। অন্ধকারের একটা শান্ত গাম্ভীর্য আছে। একদিন দেখলুম—স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরের মায়ের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে (তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে) গাইছেন, 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।। অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ-হিল্লোলে।' ঠাকুর বলতেন, এইখানটাই ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল গোল করে ফেলেছে—অচঞ্চল নির্বাণে আবার হিল্লোল এল কী করে? এ যেন 'এক গোয়াল ঘোড়া' অর্থাৎ যে একথা বলে বুঝতে হবে, তার ঘোড়াও নেই, গরুও নেই। তবে গানটা খুব আর্টিস্টিক।" আমি বললাম, "আমি 'হিল্লোল'-পদটার জায়গায় 'সায়র' বসিয়ে গাই।" তিনি বললেন, "তারা তোমার কথা নেবে কেন?" খানিক চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন, "গঙ্গায় জ্যোৎস্নার খেলা দেখে মহামায়ার খেলা মনে পড়ে—এই এমন সৌন্দর্য, এখনি আবার নিভে যাবে। আবার এ দেখে অদ্বৈত-বেদান্তীদের প্রতিবিম্ববাদও মনে পড়ে। ঐ দেখো না, সাক্ষিবিম্বচৈতন্য চাঁদ, জলে তার প্রতিবিম্ব পড়ে ঝিকমিক করছে—যেন অসংখ্য জীবপ্রতিবিম্ব; আর যেখানে একটু অন্ধকার বলে বোধ হচ্ছে, সেইটে যেন জগৎ—সেখানেও কিন্তু অস্পষ্ট চাঁদের আলো আছে, নইলে দেখতে পাচ্ছ কী করে। আলোর একেবারে অভাব হলে দেখা যায় না। সেরূপ চৈতন্যের অভাব

হলে কোনো জিনিসের সত্তাই থাকে না। জগৎ জড় হলেও তার সত্তা স্বীকার করতে হয়; কারণ অস্পষ্ট ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করেই তার সত্তা, ব্রহ্মসত্তা যার পেছনে নেই তার অস্তিত্বও নেই।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫৩ তম বর্ষ; ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম সংখ্যা)

ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রসঙ্গে

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ ওহে, তুমি যতদিন থাকতে চেয়েছিলে, তা তো হয়ে গেছে। এখন সরে পড়ো।

আমি ঃ সেকী মহারাজ! আমার কাজ শিখতে এখনো বাকি আছে।

মহারাজ আরো পীড়াপীড়ি করায় আমি বললাম, "দেখুন, বাপ বুড়ো হলে ছেলেরা কী করে জানেন?"

মহারাজ ঃ কী করে?

আমি ঃ বুড়ো বাপকে ঘরে আটকে রাখে এবং বাইরে থেকে চারটি খাবার দেয়, আর নিজেরা মজা করে খায়। আমরাও এখন তা-ই করব। বুঝেছেন?

মহারাজ ঃ ও বাবা, তুমি তো ভয়ঙ্কর লোক হে! যাক ভাই, তুমি ইচ্ছামতো যতদিন দরকার থাকো।

একদিন আমি একজন বিপন্ন রোগীকে হাসপাতালে আনলে, মহারাজ দেখেই খাপ্পা হয়ে বললেন, "কেন তুমি আনলে?"

আমি ঃ আপনি সাইনবোর্ড টাঙিয়েছেন—'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম' এবং চাঁদাও সাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। যদি রোগী না রাখবেন, তবে এসব কেন?

মহারাজ নরম হয়ে বললেন, "রোগী এনেছ, এর পথ্যাদির কী হবে?" আমি বললাম, ''সে ব্যবস্থা আমি করেছি। লালজীর বাড়ি থেকে সাগুর ব্যবস্থা হবে।''

পরে মহারাজ বললেন, "রোগী যখন এনেছ, তখন আশ্রম থেকেই পথ্যের ব্যবস্থা হবে। বাইরে থেকে আনার আর দরকার নেই।"

আমি ঃ মহারাজ, আপনি এমন করেন কেন? আমরা এলেই আপনি 'এখানে হবে না' বলে বিদায় করেন। কোথায় আমরা আপনাদের কাছ থেকে স্নেহভালবাসা পাব, তার পরিবর্তে এই রূঢ় ব্যবহার!

মহারাজ ঃ দেখো, আমি দশ হাজার টাকা ধার করেছি। এই ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত আশ্রমে লোকজন রাখা সম্ভব নয়—বুঝলে?

আমি ঃ এই দশ হাজার টাকা কোথা থেকে ধার করেছেন?

মহারাজ ঃ আমার নিজের টাকা ছিল, তা থেকে নিয়েছি।

আমি ঃ টাকা আপনার নিজের—ধার হলো কী প্রকারে? এ যেন সেইরকম —দেনায় আমার মাথার চুলটি বিকিয়ে যাচ্ছে—গিন্নির কাছে এত, বড় ছেলের কাছে এত, বড় বৌমার কাছে এত...ইত্যাদি।

মহারাজ ঃ তা যা-ই বল ভাই—সামনের হাতাটা (বস্তি) কিনতে আমার অনেক টাকা ধার হয়েছে। ঐ টাকা আমার চাই, নতুবা মিশন থেকে চলে যেতে বললে আমি খাব কী?

আমি ঃ আপনাকে চলে যেতে বলবে কেন? আর আপনার খাওয়া-পরার অভাবই বা হবে কেন?

মহারাজ ঃ তুমি যা-ই বল, আমি ধারস্বরূপই নিয়েছি এবং তা আদায় না হলে আমি কিছু করতে পারব না।

আমি ঃ মহারাজ, মর্ভির রাজা মায়াবতী আশ্রমে এক লক্ষ টাকার চেক দিয়েছেন।

একথা শুনেই মহারাজ বললেন, "এক লাখ টাকা! আমাকে কিন্তু একটা পয়সাও দেবে না।"

এলাহাবাদের আশ্রমে স্বামীজীর উৎসব। আমাকে জায়গায় জায়গায় নিমন্ত্রণ করতে বলায় আমি তদনুরূপ করেছি। উৎসবের দিন দেখা গেল, প্রায় ৫০০-৫৫০ জন লোক প্রসাদের জন্য সমবেত। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আধ মণ ময়দার লুচি ভাজা হচ্ছে। আমি বললাম, "আধ মণ ময়দায় ৫০০ জন লোক!"

মহারাজ ঃ ঐ রকম লোকই হয় এবং ঐ পরিমাণ ময়দাতেই কাজ হয়। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

আমি শুনে অবাক। লোকগুলো প্রসাদের জন্য চেঁচামেচি করছে। মহারাজ প্রত্যেককে গুণতি করে চারখানা লুচি দেওয়ালেন। লোকগুলো মহা বিরক্ত হয়ে গালাগাল দিতে দিতে চলে গেল। আমাকে খাওয়ানোর জন্য ডেকে আনতে তিনি বারবার লোক পাঠালেন; আমি লজ্জায় ঘরের বাইরে বার হতে পারলাম না।

রাতে খেতে গিয়ে দেখলাম, এক ঝুড়ি (তিন-চার সের ময়দার) লুচি রেখে

দিয়েছেন। তাই বাধ্য হয়ে খেতে হলো। তার পরদিন সকালেও তা-ই ভোজন হলো।

* * *

জগবন্ধু ঔষধাদি দিত। তার জন্য সব উত্তম ব্যবস্থা। প্রত্যহ ভাল জলখাবার। তার জুতো নেই। মহারাজ স্বয়ং সঙ্গে করে বাজারে গিয়ে তার পছন্দমতো ন-টাকা দামের জুতো কিনে দিলেন। তখনকার দিনে ন-টাকা এখনকার অনেক টাকা। তার জন্য পৃথক কল ও বাথরুম। আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তাকে বললেন, ''হ্যাঁ, ও বাইরে থেকে এসে আমাদের সমান বা অধিক সুবিধা কেন পাবে? তোমার জন্য ঐ কল ও বাথরুম তালা বন্ধ করে রাখো।'' আমাকে অন্য কল ও বাথরুম দেখিয়ে বললেন, ''তোমার জন্য ঐ দুটো থাকল। দরকার কী ভাই হাঙ্গামায়?''

জগবন্ধু পঞ্চাশ টাকা খেয়ালমতো লোকসান করে এসেছে। মহারাজ তা সত্ত্বেও তাকে আশ্রমে রাখলেন এবং সে আগের মতোই সমান ব্যবহার পেতে থাকল।

জগবন্ধুকে একটা বিদ্যা শেখাবার জন্য আমাকে বললে—আমি বললাম, "ও এটা শিখলে লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করবে। ওকে শেখাব না।"

মহারাজ বললেন, "তুমি শেখাবে না? তাহলে আমিই ওকে শিখিয়ে দেব।"

পরে মহারাজ নিজে পড়ে তাকে শিখিয়ে দিলেন এবং ঐ-বিদ্যার ছোট একটি পুস্তিকাও ছাপালেন। এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসার পর সেটা আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আমাকে বলেছিলেন, ''এ ছেলেটা কারো কাছে থাকতে পারে না। আমি এর আবদার সহ্য করে দেখছি, একে ভাল করা যায় কি না।'' দুঃখের বিষয়, তিনি কৃতকার্য হননি।

* * *

এলাহাবাদ মঠের একটি ঘরে জিনিসপত্র বোঝাই ছিল। ঘরখানা ধুলো-ভর্তি—কখনো ঝাঁটপাট হয়নি। একদিন আমাকে পরিষ্কার করতে দেখে মহারাজ বললেন, "ওখানে কেন? বেরিয়ে এসো।" আমি বললাম, "দেখুন, কত ধুলো!" তবুও আমাকে ঝাঁটপাট দেওয়া থেকে বিরত করে বাইরে আসামাত্র ঐ-ঘর তালাবন্ধ করে বালকের মতো বললেন, ''এখন সাফ করো!''

একদিন এক ঝুড়ি আপেল ও অন্যান্য ভাল ভাল ফল এসেছে। কয়েক জনকে ফল দিয়েছেন। আমি এলে বললেন, ''তুমি পাবে না'' এবং অপরকেও আর দিলেন না। তারপর বেণীকে (চাকর) বললেন, ''এগুলি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসো।'' বেণী কথামতো সব গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এল।

একদিন ঘরে দুধ নেই। মহারাজ বললেন, ''আজ আর চা খাওয়া হবে না।'' এক ভদ্রলোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক পোয়া দুধ কিনে আনলেন। মহারাজ নিজেই চা তৈরি করলেন। কাছেই ঐ অতিথি ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার পাশের ঘরেই থাকেন। মহারাজ তাঁকে বললেন, ''তুমি মনে করেছ যে, চা তৈরি করে তোমাকে দেব? তা হবে না।'' তারপর তিন-চার কাপ চা তৈরি করে তাঁর সামনেই একে একে নিজে সব চা শেষ করলেন। ভদ্রলোকটি তো অবাক! ঘটনাটি যখন তিনি আমাকে বললেন, আমি খুবই লজ্জিত হলাম। তিনি বললেন, ''মহারাজ কি পাগল?'' আমি উত্তর দিলাম, ''যা বোঝেন!''

* * *

মহারাজ একদিন আমায় বললেন, ''তুমি ত্রিবেণীতে ঐ-সময় কেন স্নান করতে যাও? ওখানে তো তখন মেয়েরা স্নান করে।''

মাঘ মাস। প্রয়াগে গঙ্গাস্নান মহাপুণ্য। মহারাজকে লুকিয়ে রোজ প্রত্যূষে গঙ্গায় যাই এবং তিনি ওঠবার আগেই ফিরি, কিন্তু এব্যাপার অধিক দিন তাঁর অজ্ঞাত রইল না। তাঁর প্রখর দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত—কিছুই লুকোবার জো নেই। একদিন বলে ফেললেন, ''তুমি বড়ই শয়তান আছ। মনে করেছ, আমি বুঝি জানি না?''

আমি ঃ আপনি কী করে জানলেন মহারাজ? আপনি ওঠবার আগেই তো আমি ফিরি।

মহারাজ ঃ হাম সব জানে।

অনেক দূর থেকে মহারাজের এক শিষ্য এলাহাবাদে এসেছেন। তিনি ত্রিবেণীতে স্নান করতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু মহারাজ তাঁকে কিছুতেই ত্রিবেণীতে স্নান করতে দিলেন না।

* * *

আমি একটা থলিতে মুরগির ডিম রাখতাম। কাজে যাওয়ার আগে স্টোভে ভাত রান্নার সময় একটা ডিম সিদ্ধ করে নিতাম। মহারাজ একদিন ঐ থলি

দেখিয়ে বললেন, "ওতে কী আছে?" যখন বললাম মুরগির ডিম, তখন বললেন, "ওসব স্বামীজীই কেবল সহ্য করতে পারতেন। যে কটা ডিম আছে তা শেষ করে আর এনো না।" তাঁর প্রখর দৃষ্টি এড়ানো অসাধ্য ছিল।

* * *

মহারাজের 'fountain pen'-গুলি টেবিলেই সাজানো থাকত। ক্বচিৎ কখনো কোনো একটা ব্যবহার করতেন। 'wrist watch'-গুলিও তথৈবচ। সেগুলির band ছিল না। তিনি হাতে একটা ময়লা canvas-এর টুকরো জড়িয়ে তার ওপর ছেঁড়া কাপড়ের একটা পাড় দিয়ে ঘড়ি বাঁধতেন এবং বালকের মতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতেন কেমন হয়েছে। ঐসময়ে বলতেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে তো!"

একদিন অনঙ্গ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকে কত ভক্তি করে আপনাকে বহুমূল্য বস্তু ও আসবাবপত্র প্রভৃতি দেয়—যেমন, অতিদামি moleskin-এর চাদর, easy chair, fountain pen, wrist watch—আপনি সেগুলি ব্যবহার করেন না কেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "ওগুলি ব্যবহার করতে থাকলে ওর চেয়ে দামি ভোগ্যপদার্থ ব্যবহারে মন ধাবিত হবে।"

* * *

বৃদ্ধ অধ্যাপক শীল একদিন তিন-চার জনের খাওয়ার উপযুক্ত বেশ বড় বড় আকারের ত্রিশ-বত্রিশখানা ডালপুরি আনলেন। তখন রাতের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছে। মহারাজ বললেন, "আশ্রমে যে-খাবার তৈরি হয়েছে, তোমরা তা-ই খাও। আমি বুড়ো মানুষ, যদি মরে যাই সেজন্য ঐ ডালপুরিগুলো আজই খাই; তোমরা সকালে খেয়ো।" সকালে আমাদের ডালপুরি পাঠাতে বিলম্ব করছেন দেখে মহারাজের কাছে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, "মনে করেছ তোমাদের ডালপুরি দেব? সে কী আর আছে! রাতে উঠে দেখি খিদে পেয়েছে, তখন যা ছিল খেয়ে ফেললুম!" আমি অবাক! অতগুলো ডালপুরি নিজেই সব খেয়ে ফেললেন! ছেলেছোকরাদের জন্য কিছুই রাখেননি।

একদিন আমি ও গিরিশ মহারাজ কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছি। আমরা প্ল্যান করলাম, মহারাজকে প্রণাম করে কিছু খাবার আদায় করব। তারপর তাঁকে প্রণাম করেই বললাম, "মহারাজ, আমরা চললাম।" তিনি বললেন, "কেন ভাই, এসেই চলে যাবে?" আমরা বললাম, "যাব না তো কী করব? আপনি তো কিছুই খাওয়াবেন না। যা কেপ্পন (কৃপণ) আপনি! লোকে আপনাকে ভয়ানক কেপ্পন বলে।" তখন তিনি বললেন, "কেন ভাই, কী খাবে তোমরা?" আমরা

বললাম, "ডালপুরি।" অমনি বেণীর ওপর হুকুম হলো, "বেণী, ডালপুরি বানাও।" ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খাবার তৈরি হয়ে এল। একসঙ্গে বসে ভরপেট খেলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম করে ফিরবার সময় তিনি আমাদের বললেন, "কী ভাই, আমাকে আর কেপ্পন বলবে না তো? আর যে যা-ই বলুক, তোমরা কিন্তু বোলো না।"

মহারাজকে যা-ইচ্ছা বলা বা জিজ্ঞাসা করা যেত। এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদার।

* * *

একবার তাঁর কাছে দশ টাকা জমা রেখেছিলাম। তা তিনি তিনটে খাতায় আমার নাম লিখে রেখে জমা করলেন। আবার যখন আমাকে তা ফেরত দিলেন, তিনটে খাতায় 'ফেরত পাইলাম' বলে আমার নাম সই করিয়ে নিলেন।

আমি বললাম, "মহারাজ, এটা আবার কী ব্যাপার? সামান্য দশ টাকার জন্য এত দরকার কী?"

তিনি বললেন, "টাকা তো টাকা! বাপকে বিশ্বাস নেই। ওর যা কৃত্য তা করতেই হবে।"

কাশী সেবাশ্রম থেকে আমার খরচ বাবদ টাকা দেওয়া হতো। এক মাস বাকি পড়ায় বা কম দেওয়ায় মহারাজ রেগে খাপ্পা হয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করলেন।

Naini Glass Works গরিব রোগীদের free-তে ওষুধ দেওয়ার জন্য শিশি দিত, কিন্তু তা কখনো গরিবদের বিনামূল্যে দেওয়া হতো না। একদিন প্রতিবাদ করায় মহারাজ বললেন, "আমি তো আর দেবতার (ব্রহ্মচারী পঞ্চাননকে মহারাজ 'দেবতা' নামে ডাকতেন, যিনি ডিসপেনসারি দেখতেন) মতো 1st dose-এর দাম নিই না।"

মহারাজ নানা স্থান থেকে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ আনাতেন, অবশ্য বিনা পয়সায়। কিন্তু ব্যবহার হতো না, কেবলই জমে যেত। অনেক ওষুধ জমা সত্ত্বেও পুনরায় তিনি আনাতেন। অযথা কেন ওষুধ চেয়ে আনতেন—তা দুর্বোধ্য! একবার জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ভাই, আমি আর ব্যবহার করব না, তোমরা পরে এসে কোরো।"

* * *

বেণীর সঙ্গে নিত্যই পয়সা নিয়ে খুব বচসা হতো। তিনি খুব বকাবকি করতেন। বেণী প্রায় রোজই বকুনি খায় দেখে একদিন তার প্রতি আমার সহানুভূতি হলো। আমি বললাম, ''বেণী, এই সামান্য টাকায় কেন এখানে পড়ে আছিস? তার ওপর এই বকাবকি!'' সে জবাব দিল, ''আরে মহারাজ, অ্যায়সা মহাত্মা হামকো কাঁহা মিলেগা?''

(এই বেণী তার গুরুর অন্তর্ধানের পরে বিজ্ঞানেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করে ধ্যান-ভজনে জীবন অতিবাহিত করে সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছে।)

[উৎস ঃ স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (রামগতি মহারাজ) কাশীতে কথাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজের এই স্মৃতিকথাগুলি অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্তকে বলেন এবং তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন। স্বামী চেতনানন্দ ঐ ডায়েরি থেকে সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মূল্যবান স্মৃতিকথাগুলি সংগ্রহ করেছেন।]

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পুণ্যস্মৃতি তর্পণে

স্বামী অপূর্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহচ্ছায়ায় সংসারবিরাগী যে ভিক্ষুসঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল এবং কাশীপুর বাগানে তার জন্য যে বিরাট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছিল, তার সন্ধান ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ খুব সামান্যই পেয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েক জন সন্ন্যাসী 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' বিরজা হোমানলে কেন যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, তার নিগূঢ় অর্থ আজও আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন, "বাউলের দল এল—নাচলে, গাইলে আবার চলে গেল—কেউ তাদের চিনতে পারলে না।" বাউলের দল এসেছিলেন; তাঁদের নৃত্য-গীতের মাধুর্যে ও নবীনত্বে জগৎকে চমকিত করে চলে গেলেন, কেউ তাঁদের বুঝতে পারেনি—জানতে পারেনি। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে চলে গেলেন স্বামী যোগানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের যোগৈশ্বর্যের ভাবঘনমূর্তি শ্রীগুরুপদে লীন হলেন। স্বামীজী অতি দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, "যোগেন চলে গেল—এবার কড়ি খসতে শুরু হলো।" ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী নিজেই মহাপ্রস্থান করলেন। পরে পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, সুবোধানন্দ, শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ—সকলেই চলে গেলেন স্বধামে। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমে ক্রমে তাঁর আধ্যাত্মিক বিভূতি সব নিজের ভিতরে আকর্ষণ করে নিলেন—এ-গতি রোধ করে কার সাধ্য! এই যে এত সিদ্ধ মহাপুরুষের একত্র সমাবেশ, এর কি কোনো অর্থ নেই? জগতের আদর্শবাদের ভাণ্ডারে এঁরা যে অক্ষয় রত্নরাজি আহরণ করে গেলেন, তার সন্ধান কি মানুষ পাবে না?

গত ১২ বৈশাখ (২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ খ্রিঃ), সোমবার শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ নশ্বরদেহ ছেড়ে সমাধিযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হয়েছেন। তাঁর অদর্শনে সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও অসংখ্য ভক্ত-নরনারী আজ শোকসাগরে নিমগ্ন। তাঁর আশ্রিত অগণন সন্তান আজ নিজেদের পিতৃহারা মনে করছেন এবং এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার পথে নিজেদের একান্ত অসহায় ও দিশাহারা মনে করছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আজ স্থূলদেহে নেই—কেবল আছে

তাঁর পুণ্যস্মৃতি। সেই সৌম্যদর্শন যোগিরাজ আজ আমাদের ধ্যানের বিষয়। এখন তিনি শ্রীগুরুসন্নিধানে সূক্ষ্মদেহে চিরকাল বিরাজিত থেকে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। এ সংসারমরুর দুর্গম ও বন্ধুর পথে তাঁর পূত-আশিস ও অভয়বাণী আমাদের একমাত্র পাথেয়। এইসময় শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের একটি কথাই বিশেষ করে মনে হচ্ছে। জনৈক ভক্তকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন, ‘‘দেখো, আমরা তো আর এ-জগতের মানুষ নই! আমরা হলুম ঠাকুরের লোক। ছিলুম ঠাকুরের ভেতর, এখন তাঁর যুগধর্ম-প্রবর্তনের জন্য তিনি তাঁর ভেতর থেকে আমাদের প্রকাশ করেছেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনো আমরা তাঁতেই লীন হয়ে আছি। আবার (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ-খোলটা নষ্ট হয়ে গেলে ঠাকুরেই গিয়ে মিশব। তিনিই চিরসত্য—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ‘তজ্জলান্’। আমাদের সঙ্গে তোমাদের যে-সম্বন্ধ তা-ও ঠাকুরকে নিয়েই। তাঁর স্মরণ করলেই আমাদেরও স্মরণ করা হলো, আমাদের আর বাবা পৃথক অস্তিত্ব কিছুই নেই, বুঝলে? ঠাকুরকে ধরবার চেষ্টা করো, তাঁকে ধরতে পারলেই আমাদের সকলকেই ধরা হলো।’’ আজ এই সন্ধিক্ষণে মহাপুরুষজীর এই মহতী বাণী স্মরণ করবার সময় এসেছে—তাঁর সেই পুণ্যকথা হৃদয়ঙ্গম করবার সময় এসেছে। তাঁর ক্ষেত্রে যা সত্য, শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সম্বন্ধেও তা-ই সত্য। মহাপুরুষজী যে-আলোকের ছটা ছিলেন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও সেই আলোক থেকেই উদ্ভূত। তিনি আজ সেই দিব্যধামে জ্যোতির্ময় দেহে শ্রীশ্রীপ্রভুসমীপে বিরাজ করছেন এবং ভক্তদের হৃদয়স্থ হয়ে আরো কাছে রয়েছেন, তাঁর মঙ্গলাশিস সকলের জীবনকে আরো মধুময় করে তুলবে। শুধু চাই আন্তরিকতা ও প্রাণের আবেগ।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে গমন করেন। বেলুড় মঠে একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁর ঐ-দর্শনের কথা আংশিকভাবে বলেছিলেন, ‘‘তখন আমার বয়স পনেরো-ষোলো বছর হবে, আমি তখন কলকাতায় কলেজে পড়ি, সেইসময়ই একদিন ঠাকুরকে দর্শন করতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই। বিকেলবেলায় গেছি—দেখি, ঠাকুরের ঘরে অনেক লোক বসে আছেন। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ঘরের এককোণে গিয়ে বসি। তিনি তাঁর ছোট খাটটিতে বসে সকলের সঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁকে দেখে তেমন বিশেষ একটা কিছুই মনে হয়নি। দেখতে সাধারণ মানুষের মতোই, তবে তাঁর মুখের হাসি ছিল অপূর্ব—অমন হাসি কারো কখনো দেখিনি। তিনি যখন হাসতেন, তখন তাঁর সারা মুখে,

এমনকী সর্বাঙ্গে যেন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। আর সেই হাসি সকলের মন-প্রাণ থেকে শোক-তাপ যেন চিরতরে মুছে দিত। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল অতি মধুর! এত মধুর, যেন ইচ্ছা হতো বসে কেবল তাঁর কথাই শুনি, কানে যেন মধুবর্ষণ করত। আর তাঁর চোখ-দুটোও খুব উজ্জ্বল ছিল, যখন তাকাতেন তখন মনে হতো যেন ভেতরের সব দেখতে পাচ্ছেন। আমার তো তা-ই মনে হয়েছিল। সে-দিন আর কে কে যে তাঁর ঘরে ছিলেন এবং কী-সব যে কথা হচ্ছিল, তার কিছুই আমার মনে নেই। তবে এখন মনে হচ্ছে যেন রাখাল মহারাজকে সে-দিন ঠাকুরের কাছে দেখেছি। তাঁর ঘরে একটা অপূর্ব শান্তি বিরাজমান ছিল এবং যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলকেই দেখে মনে হচ্ছিল যে, তাঁরা ঠাকুরের কথাবার্তায় খুব আনন্দ পাচ্ছেন। আমি ঘরের এককোণে বসে সব দেখছি-শুনছি, এদিকে আমার ভেতরেও খুব আনন্দ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ বসে আছি, কথাবার্তাও অনেক হচ্ছিল, আমার কিন্তু সেদিকে তেমন খেয়াল ছিল না, আমি একমনে তাঁকেই দেখছিলাম। তিনিও আমায় কোনো কথা জিজ্ঞেস করেননি, আর আমিও কোনো কথা বলিনি। ক্রমে ক্রমে অনেকেই উঠে এদিক-সেদিক চলে গেলেন—পরে দেখি যে ঘর একেবারে শূন্য, কেবল আমিই এককোণে বসে আছি, আর ঠাকুর তাঁর ছোট খাটটিতে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমিও ফিরে যাব বলে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি—এমনসময় হঠাৎ ঠাকুর আমায় বললেন, 'তুই কুস্তি লড়তে পারিস? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? দেখি, লড় তো একহাত!' এই বলে ঠাকুর মেঝের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। আমার শরীর খুবই বলিষ্ঠ ছিল—পালোয়ানের মতো চেহারা। আমি তো তাঁর কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আর ভাবতে লাগলাম—ভাল রে ভাল, এ আবার কেমন সাধু দেখতে এলাম, সাধু কুস্তি লড়তে চায়। যাহোক, আমি তাঁকে বললাম, 'হ্যাঁ, কুস্তি লড়তে জানি।' এদিকে ঠাকুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পালোয়ানদের মতো তাল ঠুকতে শুরু করে দিয়েছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন এবং ক্রমে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার দু-হাত ধরে জোরে ঠেলতে লাগলেন। তা তিনি আমার সঙ্গে পারবেন কেন? আমিও তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলুম। ঠাকুর তখনো হাসছেন এবং আমায় জোরে ধরে আছেন। আমিও তাঁকে চেপে ধরে আছি; কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, ঠাকুরের হাতের ভেতর দিয়ে কী যেন একটা শিরশির করে আমার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আমার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হতে লাগল, আর সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেল। খানিক পরে ঠাকুর আমায় ছেড়ে দিয়ে খুব হাসতে লাগলেন আর বললেন, 'কেমন,

হারিয়েছিস তো?' এই বলে ঠাকুর নিজের খাটটিতে গিয়ে বসলেন; আমি কী যে জবাব দেব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এদিকে ভেতরে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ হচ্ছিল আর কেবলই মনে হচ্ছিল যে, তিনি গায়ের জোরে আমার সঙ্গে পারলেন না বটে, কিন্তু কী যেন একটা শক্তিতে আমায় একেবারে কাবু করে ফেলেছেন। এভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল, পরে ঠাকুর উঠে এসে আস্তে আস্তে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'মাঝে মাঝে এখানে আসিস। এক দিন এলে কী হয়?'...ইত্যাদি। তারপর আমায় একটু প্রসাদ খেতে দিলেন। সেদিনকার মতো বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি যেন আমায় কেমন করে দিয়েছিলেন—আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, তিনি আমার দেহের সব বল যেন হরণ করে নিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা শক্তি আমার ভেতরে চালিয়ে দিয়েছেন।

"তারপর আরো কয়েক বার ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলাম, রাতেও দু-এক দিন তাঁর কাছে ছিলাম, তাঁর কী যে এক অদ্ভুত মোহিনীশক্তি ছিল, তা বলে বোঝাবার নয়। যে একবার তাঁকে দেখেছে, সেই যেন তাঁর প্রতি চিরকালের জন্য আকৃষ্ট হয়ে গেছে। একদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গিয়ে রাত্রিযাপনের কথা বলি, তিনিও আনন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু রাতে তাঁর ওখানে খাওয়াদাওয়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। মা-কালীর মন্দিরে রাতে মায়ের যা ভোগ হতো, সেই প্রসাদই কিছু তাঁর জন্য আসত। তা থেকে তিনিও একটু খেতেন আর যাঁরা তাঁর কাছে রাতে থাকতেন, তাঁদেরও সেই প্রসাদ একটু একটু খেয়ে রাত কাটাতে হতো। ঠাকুরের খাওয়া তো খুবই সামান্য ছিল—যেন পাখির আহার। তিনি দু-একখানি লুচি বা সামান্য একটু মিষ্টি খেতেন, তাতেই তাঁর হয়ে যেত। আমি তো এদিকে প্রসাদের বরাদ্দ দেখে ভেতরে ভেতরে খুবই চটছি আর ভাবছি, এ-রাতটা উপোসেই কাটাতে হবে। আমি তখন young man (যুবক), শরীরও বেশ বলিষ্ঠ আর হজমও হতো খুব, আমার ঐ সামান্য প্রসাদে কেন হবে! ঠাকুর যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে নহবত থেকে কিছু রুটি-তরকারি আমার জন্য আনিয়ে দিলেন। তাতেও কিছুই হলো না। তা-ই খেয়েই তাঁর ঘরের মেঝেতে শুয়ে রইলাম। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি যে, ঠাকুর উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন, কখনো বা উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছেন। কখনো বা বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে সামনের বারান্দায় যাচ্ছেন, আবার কখনো বা হাততালি দিয়ে দেবদেবীর নাম করছেন। ঠাকুরকে দিনের বেলায় দেখেছি একরকম—পাঁচ জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, হাসিতামাশা

করছেন, আর রাতে ঐরকম দেখে আমি তো ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট। চুপ করে শুয়ে শুয়ে ঠাকুরের ঐসব কাণ্ডকারখানা দেখছি। সেই রাতে আর ঘুম হলো না। সারারাত ঐভাবেই কেটে গেল। ঠাকুর তো কখনো গান করছেন—কখনো যেন কারো সঙ্গে কথা বলছেন—আরো কত কী করছেন। এভাবে ভোর হয়ে গেল, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ঠাকুরও এদিকে ঠিক সহজ মানুষের মতো হয়ে গেলেন। সকালে নানা কথাবার্তা হলো—তখন তাঁকে দেখে আর মনেই হয়নি যে এই মানুষই রাতে অমন করছিলেন, তাঁর সবই অদ্ভুত। বাইরে দেখতে সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু বাবা ও যেন একেবারে কাঁচাখেকো দেবতা! স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সকলকে যেন একেবারে জ্যান্ত গ্রাস করে ফেলেছিলেন!"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরে আস্তে আস্তে বললেন, "খুব ভাগ্য আমাদের যে, তাঁর কাছে এসে পড়েছিলাম। তিনিই কৃপা করে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"

পরে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহারাজ, আপনি এখনো ঠাকুরকে দেখতে পান?" এই প্রশ্ন শুনে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন, তাঁর যেন আর বাক্যস্ফূর্তি হয় না, পরে আস্তে আস্তে বললেন, "তা দরকার হলেই কৃপা করে দর্শন দেন।" তাঁর কথায় এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল যে, এবিষয়ে কেউ আর কোনো কথা উত্থাপন করতে সাহস করলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কথা প্রায়ই বলতেন, "জহুরি না হলে জহর চিনতে পারে না।" ঠাকুরের ছেলেদের মধ্যে এক-একজন যে কী উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিসম্পন্ন, তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সে অনেকদিনের কথা, তখন ঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ স্থূলদেহে বর্তমান। তিনি যখন বেলুড় মঠে আসতেন—তাঁর আগমনে মঠের সর্বত্র যেন একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গের ঢেউ খেলে যেত। কি সাধু, কি ভক্ত সকলেই সেই আনন্দ সম্ভোগ করে আত্মহারা হয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীমহারাজের মঠে অবস্থানকালে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও প্রায়ই মঠে এসে বাস করতেন। কিন্তু তিনি লোকজনের সঙ্গে, এমনকী মঠের সাধুদের সঙ্গেও বড় একটা মেলামেশা করতেন না—আত্মারাম পুরুষ আত্মানন্দেই বিভোর হয়ে থাকতেন। কখনো কখনো মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে সেই আত্মানন্দের ভাব বিনিময় করতেন এবং পরস্পরের মধ্যে সেই আনন্দ পরিবেশন ও সম্ভোগ করতেন। সেসময় মাঝে মাঝে এমনও হতো যে—মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ, অখণ্ডানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ এবং বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রমুখ ছ-সাত জন গুরুভাইয়ের মিলন একই সময়ে মঠে হতো। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! সর্বত্রই যেন আনন্দের হাট বসে যেত।

অনেক ভক্তও সেই আনন্দের মিলনমেলায় যোগদান করে নিজেদের জীবন ধন্য করবার জন্য মঠে সমবেত হতেন। কিন্তু বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের দর্শনলাভ অনেক ভক্তের ভাগ্যেই ঘটে উঠত না। অনেকে আবার তাঁকে চিনতেনই না, কারণ তিনি বেশিরভাগ সময় এলাহাবাদেই নির্জনে থাকতেন। মহারাজ বিশেষ করে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দর্শন করতে কোনো কোনো ভক্তকে পাঠাতেন। আর বলতেন, "হরিপ্রসন্ন মহারাজ (পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূর্বনাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মহারাজ প্রমুখ সেজন্য তাঁকে ঐ নামেই ডাকতেন) এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছ? যাও, যাও, ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে এসো। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, বস্তু লাভ করে বসে আছেন। ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর। আত্মস্থ হয়ে আন্ডিল হয়ে বসে আছেন, ওঁকে চেনা বড় মুশকিল। উনি বড় একটা ধরা দিতে চান না।" মহারাজ নিজে জহুরি ছিলেন, তাই তিনি জহর চিনে তার ঠিক ঠিক কদর করতেন।

শ্রুতিতে আছে, 'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ-ব্রহ্মৈব ভবতি' ইত্যাদি—অর্থাৎ যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন। আর শাস্ত্রে এ-ও রয়েছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থিতিই জগতে প্রভূত কল্যাণের কারণ। পুত্রৈষণাদি তাঁদের কিছুই থাকে না। যতদিন তাঁরা এ-মরজগতে বর্তমান থাকেন, কেবলমাত্র লোককল্যাণচিকীর্ষাকে আশ্রয় করেই শরীরধারণ করেন এবং তাঁরা বাহ্যত কোনো লোককল্যাণকর কার্য করুন আর না-ই করুন, তাঁদের স্থিতিমাত্রেই জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার পরে, লোককল্যাণসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এ-দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্বামীজীকে সমাধি থেকে টেনে এনে ঠাকুর বলেছিলেন, "এখন ঐসব চাবি দেওয়া রইল। জগতের হিতের জন্য এখন তোকে কাজ করতে হবে। আবার যখন মায়ের কাজ শেষ হবে তখন তিনিই চাবিকাঠি খুলে দেবেন, বুঝলি?" ঠাকুর তাঁর প্রত্যেক পার্ষদকেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত করে, পরে জগতের হিতসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট কর্মান্তে স্বধামে নিয়ে গিয়েছেন। পারত্রিক কল্যাণসাধন করেই তাঁরা ক্ষান্ত হতেন না, ঐহিক মঙ্গলসাধনের জন্যও তাঁরা সদা ব্যগ্র থাকতেন—তা-ই ছিল ঠাকুরের নির্দেশ। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে লোকহিতকর কার্যে লিপ্ত ছিলেন। সেখানে তিনি সাধারণত লোকজনের সঙ্গ যতটা সম্ভব পরিহার করে নির্জনে আত্মানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। কোনো কোনো ভগবৎপিপাসু, যাঁরা তাঁর পূত সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা

পরম ভক্তিভাজন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই অনিত্য সংসারে শ্রীভগবানই যে একমাত্র সারবস্তু—এ-ভাব হৃদয়ে সম্যকরূপে ধারণা করে জীবন ধন্য করেছেন। তখনও তাঁর কাছে দীক্ষারূপ কৃপা পাওয়ার সৌভাগ্য কারো ভাগ্যে ঘটেনি, কারণ তিনি দীক্ষাদি দিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজের লীলা সম্বরণের পর থেকে তাঁর সেই ভাব ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকে। তখন থেকে দীক্ষাপ্রার্থী কেউ উপস্থিত হলে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি ঠাকুর ও মা ছাড়া আর কিছুই জানিনে। আমার দীক্ষা আর কিছুই নয়—আমি কেবল তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর ঠাকুরের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেলে, তোমরা নিজেরাই যা যা দরকার, তাঁদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে।" ক্রমে ক্রমে তাঁর ভিতর এই ভাব এতই পরিস্ফুট হলো যে, কেউই তাঁর কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে ফিরে যেত না। জাতিবর্ণনির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তিনি কৃপাবারিসিঞ্চনে নবজীবন দান করতেন। নিজ দৈহিক অসুস্থতা বা অস্বচ্ছন্দতার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে আধ্যাত্মিক রত্নপেটিকার অমূল্য রত্নরাজি অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আপামর সাধারণে বিতরণ করতে লাগলেন। ভারতে ও ভারতের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তিনি অকাতরে সকলকে ধর্মোপদেশদানে ধন্য করেছিলেন। তাঁর ভিতর এমনই এক ঐশী-প্রেরণা এসেছিল যে, দীক্ষাদি-ব্যাপারে তাঁর এই অদ্ভুত ভাবান্তর সকলকেই স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি এলাহাবাদ থেকে কয়েক দিনের জন্য বেলুড় মঠে এসেছিলেন। মঠে নিত্য বহু নর-নারী তাঁর কাছে উপস্থিত হতো এবং তাঁর পদপ্রান্তে বসে ধর্মোপদেশ লাভ করে কৃতকৃতার্থ হতো। সেসময় একদিন বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মঠের দ্বিতলের এক প্রকোষ্ঠে বসে আছেন—সবেমাত্র অনেকের দীক্ষাদি শেষ হয়েছে, তিনি একাকী আপনমনে উত্তরাস্য হয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট; সামনের দরজা খোলা। মঠের জনৈক সন্ন্যাসী তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর চরণপ্রান্তে উপবেশন করে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনার শরীর কেমন?" বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন যেন একটু আনমনা, প্রশ্ন শুনে নিজেকে যেন সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, "আর দাদা শরীর, এখনো আছে এই পর্যন্ত! এই দেখছ তো লোকজনের ভিড়ভাড়? কত লোককেই ঠাকুর নিয়ে আসছেন! এইভাবেই চলবে এখন, যতদিন ঠাকুর এই শরীর রাখেন।" এই বলে চুপ হয়ে গেলেন। তখন সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনি যে এমন হাতখুলে দীক্ষাদি দেবেন, তা তো কখনও ভাবিনি। আপনার

এ-ভাবান্তর দেখে আমরা তো অবাক হয়ে গেছি! এ-ভাবান্তর কেমন করে হলো মহারাজ? আপনি তো আগে ভক্তদের কাছেই আসতে দিতেন না, অথচ এখন তো আপনি কাউকে ফেরাচ্ছেন না! সকলেই আপনার কৃপা পাচ্ছে। মহাপুরুষজী শেষদিকটায় যেমন করতেন, ঠিক তেমন ভাব আপনার ভেতরেও এসেছে।"

একথা শুনে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর চোখ বুজেই বলতে লাগলেন, "মহাপুরুষ মহারাজকে তো দেখেছ! শেষ-জীবনে তিনি যেন করুণার অবতার হয়ে গিয়েছিলেন। অমন দয়া, প্রেম, ভালবাসা ও কৃপার ভাব আর কারো দেখিনি। তাঁকে দেখে আমার যেন চোখ খুলে গেছে। তিনি জীবোদ্ধারের জন্য তিল তিল করে নিজের দেহপাত করে গেলেন, শেষদিন পর্যন্ত কেউ তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি, যেন স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর শরীর আশ্রয় করে জীবোদ্ধার করে গেলেন। মহাপুরুষজীর সেই ভাবটিই আমার ভেতরে ঢুকে গেছে, তাঁর দেহত্যাগের পর আমার কেবলই তাঁর দয়ার কথা মনে হতো, আহা কী দয়া জীবের প্রতি! আজ তিনি বেঁচে থাকলে আরো কত লোককে কৃপা করতেন! আমার কেবলই তা-ই মনে হচ্ছে। এখন ঠাকুর যেন আমার ঘাড় ধরে মহাপুরুষজীর সেই অসমাপ্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। ঠাকুরের যেমন আদেশ হবে, তা-ই তো করতে হবে। আমাদের আর কী আছে! ঠাকুর-মা যেমন করাচ্ছেন তেমনই করছি।'

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর যুগ-প্রবর্তনের সহায়করূপে যাঁদের সঙ্গে করে এনেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই কোনো-না-কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত করেছিলেন এবং সেই সেই কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে ক্রমে নিজের কাছে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছেন। সেজন্যই আমরা দেখতে পাই, মাত্র ঊনচল্লিশ বছর বয়সে স্বামীজী এই ধরাধাম ত্যাগ করলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে মনে হয়, আহা স্বামীজী আর কিছুকাল যদি বেঁচে থাকতেন তবে জগতের কত কল্যাণই না হতো, তিনি আরো কত কাজই না করতেন! সাধারণ মানবের ক্ষেত্রে বয়সের মাপকাঠিতে কাজের তুলনা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দেবাদিষ্ট পুরুষদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁরা জগতে আসেন বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এবং সেই কাজটুকু শেষ হলেই চলে যান স্বধামে এবং 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবস্থান করেন। বিগত ১৪ জানুয়ারি বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বহস্তে 'ঠাকুর আত্মারাম'কে নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ঠাকুরের মর্মরমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে এসে বলেছিলেন, "এবার আমার কাজ শেষ হলো। স্বামীজী

আমার ওপর যে-কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, সে-দায়িত্ব আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল। স্বামীজীর নির্দেশানুসারে আমি ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা তৈরি করেছিলাম। স্বামীজীও তা-ই দেখে খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'পেসন (স্বামীজী আদর করে তাঁকে পেসন বলে ডাকতেন), এই মন্দির আমি দেখে যেতে পারব না, ততদিন আমার শরীর থাকবে না—তবে এ-মন্দির যে হবে, তা নিশ্চয়। মন্দির হলে, তখন আমি সূক্ষ্মদেহে আকাশ থেকে দেখব। আর তোকেই এই মন্দিরের কাজ করতে হবে।' আজ স্বামীজীর ইচ্ছায় এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, স্বামীজীও সূক্ষ্মদেহে এই মন্দির দেখে খুব আনন্দিত হয়েছেন। আমারও কাজ শেষ হলো।" তিনি অতি গম্ভীর ও শান্তভাবে এই কথাগুলো বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে বোধ হয় কেউই ভাবতে পারেননি যে, বাস্তবিকই তাঁর এই কথাগুলোর পশ্চাতে এক কঠোর সত্য নিহিত ছিল এবং তিনি এত শীঘ্রই শ্রীগুরুপদে মিলিত হবেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন তিনি অকাতরে বহু লোককে কৃপা করেছিলেন। তাঁর কৃপার ভাণ্ডার সকলের জন্য সদা উন্মুক্ত ছিল। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরাই সেই কৃপা লাভ করে নিজ নিজ জীবন ধন্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জ্যোতির্ময় আধ্যাত্মিক আলোকবর্তিকার দ্বারা যে কটি জীবনদীপ প্রজ্বলন করেছিলেন, কালবশে ক্রমে ক্রমে প্রায় সব দীপগুলিই লোকলোচনের অন্তরালে চলে গেল। আজ সহস্র সহস্র নরনারী তাঁদের অদর্শনে নিজ নিজ জীবনবর্ত্ম ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনে করছেন। এই অকূল ভবসাগরে নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনতরি আজ যেন একেবারে কর্ণধারবিহীন। জীবনের ধ্রুবতারা যেন কোনো এক কালোমেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয় বটে, কিন্তু এই নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকারের পিছনে রয়েছে আমাদের একমাত্র আশাস্থল শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অলৌকিক আদর্শ। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে শ্রীশ্রীঠাকুর যে-আধ্যাত্মিক হোমানল 'জগদ্ধিতায়' প্রজ্বলন করেছিলেন এবং যে হোমানলে তিনি স্বামীজী প্রমুখ কয়েকটি অনাঘ্রাত জীবন আহুতি দিয়েছিলেন, সেই হোমানল সপ্তজিহ্বা বিস্তার করে আজ সমগ্রজগৎ আলোকিত করেছে, সেই হোমানল আজও নির্বাপিত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণচরণে উৎসর্গীকৃতজীবন শত শত সন্ন্যাসী ও ভক্তের হৃদয়কন্দরে আজও তা দাউদাউ করে জ্বলছে এবং জ্বলবে আরো শত শত বছর ধরে। তাই তো দূরদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "এই যে আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে এসেছে, এ অবাধে চলবে এখনো সাত-আটশো বছর, এর অপ্রতিহত গতি রোধ করে কার সাধ্য!" এখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্ঘ-শরীরে

বর্তমান থেকে শত শত বছর জগতের কল্যাণসাধন করবেন। নব নব জীবন আহুতি দিয়ে সেই আধ্যাত্মিক হোমানল জগতের হিতের জন্য জ্বালিয়ে রাখবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। এই শুভক্ষণে প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ভক্ত-নরনারীর কর্তব্য—নিজ নিজ হৃদয়দেউলে শ্রীভগবানের পূজাপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা এবং ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পবিত্রতার অর্ঘ্য নিত্যই পরম দেবতার চরণে অর্পণ করা।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪০তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অনুধ্যানে

স্বামী অপূর্বানন্দ

গীতামুখে হৃষীকেশ বলেছেন—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।" শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে অচিরে পরমশক্তি অর্থাৎ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যেক মোক্ষকামীকেই শ্রদ্ধাবান হতে হবে। এই শ্রদ্ধারূপ নৌকায় চড়ে সংযমের হাল ধরে বসে থাকলে, এ জীবননদীর খরস্রোত, উত্তাল তরঙ্গ ও শত ঝঞ্ঝাবাত অকুতোভয়ে অতিক্রম করে সাধক অচিরে পরপারে পৌঁছে যাবে—যেখানে চিরশান্তি ও আনন্দনিলয়—সেই অমৃতধাম। শাস্ত্রে এই শ্রদ্ধা 'গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ'-রূপে কীর্তিত হয়েছে। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসই হলো চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতিতে উৎকর্ষলাভ করতে অন্য পন্থা থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে এগোবার একমাত্র পথ হলো গুরু ও বেদান্তবাক্যে অচল-অটল বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে উৎসর্গীকৃতজীবন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনে এই শ্রদ্ধার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। শ্রীগুরুদেবের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনই ছিল যেন তাঁর জীবনের চরম ব্রত। অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবক হরিপ্রসন্নের হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরের ঋষি সাধনার যে-বীজ বপন করেছিলেন, সেই বীজ ক্রমে পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়ে ফলভারে নত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়েছিল এবং উত্তরকালে শত শত নর-নারী সেই মহীরুহের অমৃতফল আস্বাদন করে জীবন ধন্য করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কথা বলতেন, ''ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনিই এসে জোটে।'' তাই আমরা দেখতে পাই, সর্বভাবঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে নানা ভাবের সাধকের আগমন। তাই তো সিদ্ধপীঠ দক্ষিণেশ্বরে নানা দেশ থেকে বিশ্বদেবতার পূজারি ভক্তিনম্রচিত্তে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে এসে হাজির হতেন। কারো আগমন ব্যর্থ হতো না। সকল পথের পথিকই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিজ নিজ পথের সন্ধান পেয়ে আপ্তকাম হয়ে যেতেন; আর পেতেন এমন ইঙ্গিত ও প্রেরণা, যাতে নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে যেত। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—সকল ভাবের ভাবুকই নিজ নিজ ধর্মজীবনে এক নতুন আলোক পেতেন এবং সেই

'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর সংস্পর্শে এসে অমৃতের আস্বাদ সম্ভোগ করে কৃতার্থ হয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কারো ভাব নষ্ট করতেন না এবং 'যাকে যেমন তাকে তেমন' ভাবে শিক্ষা দিতেন। সাধকগণ তাঁর কাছে আসামাত্রই ঠাকুর তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসহায়ে কে কোন্ ঘরের লোক, তা অনায়াসে বুঝতে পারতেন এবং তদনুসারে প্রত্যেককে নিজ নিজ সাধনরাজ্যে অগ্রসর হতে সাহায্য করতেন। যেসকল বালকভক্ত উত্তরকালে তাঁর যুগধর্ম-প্রবর্তনের সহায়ক হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল যেন আরো বিচিত্র রকমের এবং তাঁদের শিক্ষার ধারাও ছিল স্বতন্ত্র। প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে চিরপরিচিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করতেন, তাঁদের সকল ভার যেন চিরতরে নিজের ওপর টেনে নিতেন এবং সুনিপুণ ভাস্করের ন্যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে অদ্ভুত ধৈর্য সহকারে নিজ যোগবিভূতিসহায়ে সেই বালকভক্তগণের আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ আজ সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের অপূর্ব সম্মিলন সেই রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ আজ মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কী অদ্ভুত টানই না ছিল ঠাকুরের তাঁর বালকভক্তদের প্রতি! নরেন্দ্র অনেক দিন ঠাকুরের কাছে আসেনি, ঠাকুর নিজে গিয়ে হাজির নরেন্দ্রের খোঁজ নিতে—ইত্যাদি আরো কত ঘটনাই না লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ঠাকুর আমাদের জন্য কতই না ভাবতেন! তাঁর কাছে অনেক দিন না গেলে তিনি কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠাতেন এবং খোঁজখবর নিতেন। শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে ঠাকুরের খবর নিয়ে আমার কাছে আসতেন। একবার ঐভাবে তিনি ডেকে পাঠালে, তাঁকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে যাই। গিয়ে দেখি, সে-দিন তাঁর কাছে লোকজন বড় একটা কেউ নেই। আমি তাঁর ঘরে যেতেই তিনি যেন একটু অনুযোগের সুরে বললেন, 'কিরে, কেমন আছিস? আজকাল যে আসা-যাওয়া একেবারে কমিয়ে দিয়েছিস! ডেকে পাঠালেও আসিস না!' আমি বললুম, 'সবসময় আসতে ইচ্ছা হয় না, তাই আসি না।' তাতে ঠাকুর একটু হেসে বললেন, 'তা বেশ। আচ্ছা, একটু-আধটু ধ্যানট্যান করিস তো?' আমি বললুম, 'ধ্যান করবার তো চেষ্টা করি, কিন্তু ধ্যান হয় কোথায়! ধ্যান তো মশাই মোটেই হয় না।' ঠাকুর তাতে যেন একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলিস কিরে! ধ্যান হয় না? কেন হবে না? নিশ্চয় হবে।' তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি

তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি, দেখি তিনি আর কী বলেন; দেখতে দেখতে তাঁর মুখ-চোখের ভাব একেবারে পালটে গেল। তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা, যা তো এখন পঞ্চবটীতে, ওখানে গিয়ে ধ্যান কর।' এই বলেই আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা, আয় তো একবার এ-দিকে।' আমি তাঁর কথামতো এগিয়ে আসতেই তিনি আমায় জিভ দেখাতে বললেন এবং জিভে আঙুল দিয়ে কী যেন দাগ কেটে দিলেন। তারপর বললেন, 'যা এবার পঞ্চবটীতে।' আমিও তাঁর কথামতো পঞ্চবটীর দিকে আস্তে আস্তে চলে গেলুম। এদিকে ঠাকুর আমায় ছুঁয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে লাগল। পা যেন আর চলে না, এমনই অবস্থা। কোনোরকমে তো পঞ্চবটীতে গিয়ে বসলুম। তারপর আমার আর কোনো হুঁশ ছিল না, যেন একটা নেশার ঘোরে অনেক সময় কেটে গেল। যখন বাহ্যজ্ঞান হলো, তখন দেখি ঠাকুর পাশে বসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন। খানিক পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে ধ্যান হলো?' আমি বললুম, 'হাঁ, আজ তো ধ্যান হয়েছে।' তখন ঠাকুর বললেন, 'এখন রোজই হবে দেখবি। কিছু দর্শন-টর্শন হলো?'...ইত্যাদি। সে-দিন ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল, তারপর তিনি সঙ্গে করে তাঁর ঘরে নিয়ে এসে খুব আদর করে খেতে দিয়েছিলেন। তাঁর ঘরে তখন তিনি ও আমি, আর কেউই ছিল না, সাধনভজন সম্বন্ধে তিনি অনেক গুহ্যকথা বলেছিলেন। আমি তো তাঁর কথাবার্তা শুনে আর আদর পেয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, আহা, তিনি আমার জন্য কত ভাবেন! আমার ধারণাই ছিল না, তিনি ওখানে বসে বসে আমার জন্য এত ভাবনা করেন—তাঁর কৃপার তুলনা নেই। ঠাকুর কথায় কথায় সে-দিন বলেছিলেন, 'দেখ, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনে, খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। সোনার মেয়েমানুষ হলেও সেদিকে ফিরে তাকাবিনি। তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক, তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে, কাকে-ঠোকরানো ফল মায়ের পূজায় লাগে না রে! তাই বলছি, খুব সাবধানে থাকবি।'"

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উপদেশ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, বুঝি বা ঐ মাহেন্দ্রক্ষণেই সেই 'আশ্চর্যো বক্তা' ঠাকুরের কাছে হরিপ্রসন্নের জীবনের পূর্ণাভিষেক চিরতরে হয়ে গেল এবং সেইমুহূর্ত থেকেই 'কুশলী' শিষ্য শ্রীগুরুপদে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার অতলজলে ডুব দিলেন; যেপর্যন্ত না শ্রেষ্ঠ 'রত্নধন'

লাভ হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত এই ডুবুরির সন্ধান পেয়েছিল খুব অল্প লোকই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অমোঘ স্পর্শ ও উপদেশ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনে কীভাবে রূপায়িত হয়েছিল, তা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাবার চেষ্টা করব।

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপস্যার পর ঠাকুর যখন সর্বধর্মে ও সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যখন তিনি সমাধির নেশায় আপনভোলা, তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ হলো, "ওরে, তুই এখন ভাবমুখে থাক।" তাই মায়ের শিশু, মায়ের নির্দেশমতো ভাবমুখে থেকে লোককল্যাণে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কে তাঁর ভাব বুঝবে! যে-আধ্যাত্মিক সম্পদ তিনি আহরণ করেছিলেন, তার গ্রাহক কোথায়! তাই তিনি মাকে ধরে বসলেন, "মা, বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলে বলে মুখ একেবারে জ্বলে গেল! আর যে পারিনে মা। তুই তোর শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের এনে দে, যারা এখানকার ভাব বুঝবে।" অনেকসময় তিনি প্রাণের আবেগে কুঠির ওপর থেকে আরতির সময় চিৎকার করে ডাকতেন, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস আয়!" তাঁর আকুল আহ্বানে ক্রমে ক্রমে ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হতে লাগলেন, ঠাকুরও তাঁর সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে—যাঁর যেমন ভাব তদ্রূপ প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেককে সেই রত্নরাজি অকাতরে বিতরণ করতে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে লাগলেন। ঠাকুরের শিক্ষার ধারাই ছিল এক স্বতন্ত্র প্রকারের, ভালবাসাই ছিল তার শ্রেষ্ঠ উপাদান। তিনি ভালবেসে সকলকে আপনার থেকেও আপনার করে নিতেন। উত্তরকালে বাবুরাম মহারাজ তাঁর মাকে বলেছিলেন, "ঠাকুর আমাকে যেমন ভালবাসেন, তুমি কি তেমন ভালবাসতে পার?" তাতে বাবুরাম মহারাজের মা খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন, "বলিস কিরে! মায়ের চাইতেও কি কেউ বেশি ভালবাসতে পারে?"

কিন্তু ঠাকুরের স্বর্গীয় ভালবাসা, মা-বাপ ও অন্যান্য আপনজনের পুঞ্জীকৃত ভালবাসাকেও ম্লান করে দিত, তাই ঠাকুরের বালকভক্তগণ তাঁদের মায়ের কোল ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঠাকুরের কোলে। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, মান-যশাদির সব আকর্ষণকে পদদলিত করে তাঁরা ঠাকুরের চরণে নিজেদের চিরতরে অশুল্কদাসরূপে বিকিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরও স্বর্গের নন্দনকানন থেকে যে কয়েকটি অফুটন্ত ফুল আহরণ করে এনেছিলেন, স্বর্গের পবিত্র সৌরভে মর্তধামকে আমোদিত করবেন বলে—সেইসব অস্ফুটকোরক তাঁর প্রেমবারি পরিসিঞ্চনে এবং তাঁর স্নেহশিশিরসম্পাতে ফুটে উঠেছিল অপূর্ব শোভাধারণ করে। আর ঠাকুর সেইসব মধুভরা-ফুলের হার নিবেদন করেছিলেন মায়ের চরণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে যাঁদের ত্যাগের আদর্শ ও সেবার বাণী প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাঁদের শিক্ষা গোড়া থেকেই ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। ঠাকুর তাঁদের প্রথম আগমনের পর থেকেই কামিনীকাঞ্চনত্যাগ-রূপ আদর্শে সর্বদা অনুপ্রাণিত করতেন—যাতে তাঁরা উত্তরকালে তাঁর গৈরিক পতাকাবহনের সামর্থ্য লাভ করতে পারেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। শ্রীগুরুদেবনির্দিষ্ট কাম-কাঞ্চনত্যাগের আদর্শ তাঁর প্রাণে কী গভীর রেখাপাত করেছিল, তা তাঁর একদিনের কথাপ্রসঙ্গে বেশ ফুটে উঠেছিল। আমরা ক্রমে সেই কথারই অবতারণা করব।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের অকস্মাৎ দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধিনায়কত্বের গুরুভার পড়েছিল শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের ওপর। তখন থেকেই তিনি মঠ ও মিশনের নানা কার্যব্যপদেশে প্রয়োজনানুসারে প্রায়ই বেলুড় মঠে আগমন করতেন। বিশেষ করে, শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন মন্দির নির্মাণের কার্য তত্ত্বাবধান করবার জন্যও তাঁকে ঘনঘন মঠে আসতে হতো। তাঁর শুভাগমনে সমগ্র মঠ আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠত, আর মঠে নিত্যই বহু তীর্থযাত্রীর ভিড় লেগে থাকত। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের গরমের সময় এমনিধারা তিনি একবার মঠে এসে কয়েক দিন বাস করছেন। রোজই বহু ভক্তের দীক্ষাদি হচ্ছিল। সকাল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত সর্বক্ষণই ভক্তগণ তাঁর কৃপা ও উপদেশ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। আর তিনিও নিজ শরীরের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রেখে অকাতরে সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সদা তৎপর থাকতেন। একদিন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা হবে, তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে একটু বিশ্রাম করছেন। সকালে অনেক দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও দীক্ষাপ্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই তিনি পরিতৃপ্ত করেছেন, তাই শ্রান্ত ও অবসন্ন দেহে একটু শুয়ে আছেন। ঘরের সামনের দরজা বন্ধ। একজন সেবক পাখার মৃদু সঞ্চালনে বাতাস করছিলেন এবং মঠের আর দু-জন সন্ন্যাসী তাঁর পদসেবায় রত। প্রাণের ইচ্ছা যে, এই সুযোগে তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করবেন। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পূর্বাস্য হয়ে শুয়ে আছেন, চক্ষু মুদ্রিত কিন্তু তাঁর মন যে কোন্ ভাবরাজ্যে বিচরণ করছে তা কে জানে! মুখমণ্ডলে এক দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠেছে। কথাবার্তা খুবই সামান্য বলছেন, তা-ও সাধারণ ভাবের। নিকটস্থ সন্ন্যাসীদের লক্ষ্য করে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, “দেখো, সন্ন্যাসজীবন বড় কঠোর জীবন। বিশেষ করে যাঁরা ঠাকুরের সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, তাঁদের জীবন সর্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। কায়মনোবাক্যে

কামিনীকাঞ্চনত্যাগ—সন্ন্যাসীদের একমাত্র আদর্শ। নইলে কেবল বিরজাহোম করে, গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হলে হবে না। আত্মজ্ঞান লাভ করা দাদা চারটিখানি কথা! কামিনীকাঞ্চনে এতটুকুও আসক্তি থাকলে তা হওয়ার জো নেই। যত ধ্যানই কর, যত জপই কর, কী কাজকর্মই কর বা খুব পাণ্ডিত্যই অর্জন কর, কিছুতেই কিছু হবে না, যদি না ঐ আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পার। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'সন্ন্যাসী এমনকী স্ত্রীলোকের পট পর্যন্ত দেখবে না', আর কাঞ্চন কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করতে হবে। কামিনী আর কাঞ্চন এ-দুয়ের মধ্যে এমন নিকট-সম্বন্ধ যে একটি জুটলেই অপরটি ঠিক এসে জুটবে, কেউ রুখতে পারবে না। তা বলে যে স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করতে হবে, অবজ্ঞার চোখে দেখতে হবে, তা নয়; বরং তাঁদের খুব বেশি সম্মানের চোখে দেখবে—মন্দিরে যে মা আছেন, ঠিক তেমনি। তাঁরা মায়ের জাত, তাঁদের দূর থেকে প্রণাম করবে। তোমরা যে সন্ন্যাসী, তাই তো তোমাদের জীবনাদর্শ এরূপ। কদাপি তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না।"

জনৈক সন্ন্যাসী ঃ মহারাজ, আমাদের যেমন পাঁচ রকমের কাজকর্মের মধ্যে থাকতে হয়, তাতে মেয়েদের সঙ্গে একেবারে না মিশে তো পারা যায় না। অনেকসময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়। যখন কোনো সেবাকাজে আমরা যাই বা হাসপাতালে কাজকর্ম করি, তখন তো মহারাজ, শতচেষ্টা করলেও মেয়েদের সঙ্গে একেবারে না মিশে পারা যায় না।

মহারাজ ঃ তা সত্যি বটে, কাজকর্মের ভেতর থেকে মেয়েদের একেবারে বাদ দেওয়া বড়ই মুশকিল। তবে কী জান, কাজ তো ঠাকুরেরই, আর ঐ যে সন্ন্যাসীর পক্ষে উপদেশ—তা-ও ঠাকুরের। এ-দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে। যখন নেহাত দরকার হয়, তখন একটু-আধটু কথাবার্তা বলতে হবেই, তা-ও খুব সাবধানে—সেরকম মেলামেশা আর কতক্ষণ? কিন্তু তার অতিরিক্ত যেন না হয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা কাজকর্ম বন্ধ করে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে বসে থাক। কাজকর্ম করবে চিত্তশুদ্ধির উপায়-জ্ঞানে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখতে হবে। অনেকসময় বিপদ এত অতর্কিতভাবে এসে পড়ে যে, তখন আর সামলাবার সময় থাকে না। আমার কিন্তু এক-একবার এ-ও মনে হয় যে, স্বামীজী এসব কাজকর্মের প্রবর্তন করে মহা অনর্থের সূচনা করেছেন—এতে জগতের লোকের খুব উপকার হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা এসব কাজকর্ম করছে, তাদের জীবন খুবই বিপৎসঙ্কুল করে দিয়েছেন। তবে এ-ও খুবই সত্যি যে, বসে বসে পশ্চিমে-সাধুদের মতো

ভাঁড়েমি করে আর পাঁচ রকম গল্পগাছা করে সময় নষ্ট করার থেকে এসব সেবাদি কাজকর্মে মনকে লিপ্ত রাখা সহস্রগুণে শ্রেয়। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক সাধনভজন করতে পারে, সর্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে পারে, তাদের এসব কাজকর্মের কোনো দরকারই নেই। একদিন স্বামীজীর সঙ্গে আমার এবিষয় নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছিল।

এপর্যন্ত বলে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্বামীজীর ঘরের দিকে তাকালেন। তিনি যে-ঘরে শুয়েছিলেন, সে-ঘরের ও স্বামীজীর ঘরের মাঝের দরজাটা বন্ধ ছিল। তবু তিনি স্বামীজীর ঘরের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন তাঁর দৃষ্টি মাঝের দেওয়াল ও বন্ধ দরজা ভেদ করে স্বামীজীর ঘরের ভিতরে গিয়ে পৌঁছাল। পরে তিনি বলতে লাগলেন, "একদিন স্বামীজী তাঁর ঘরে বসেছিলেন। তখন মাঝের এই দরজাটা খোলা থাকত। আমরা এ-দিক দিয়েও স্বামীজীর ঘরে যাতায়াত করতুম। আমার কিছুদিন যাবৎ মনে হচ্ছিল যে, স্বামীজী তো দেশ-বিদেশে ঘুরে কতশত বক্তৃতাদি দিয়ে এলেন, তাঁকে সব রকমের লোকজনের সঙ্গেই মেলামেশা করতে হতো, মেয়েদের সঙ্গেও। তখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর মেম-শিষ্যারাও ছিলেন, তাই আমার মনে হতো যে, স্বামীজী যা করে এলেন—এ কি ঠিকঠিক ঠাকুরের ভাবানুযায়ী? তিনি কেন এতসব মেয়েদের সঙ্গে মিশলেন? তাই একদিন স্বামীজীকে নিরিবিলিতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'আচ্ছা আপনি তো পাশ্চাত্যদেশে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গেও মেলামেশা করেছেন? কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা তো অন্যরকম ছিল; তিনি তো বলতেন যে, মেয়েমানুষের পট পর্যন্ত সন্ন্যাসী দেখবে না। আমাকেও তিনি বলেছিলেন যে, খবরদার, কখনও মেয়েদের সঙ্গে মিশবিনি, হাজার ভক্তিমতী হলেও না। তাই আমার প্রায়ই মনে হচ্ছিল যে, আপনি কেন এমনধারা করলেন।'

"আমার কথা শুনে স্বামীজী হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার তো তখন খুব ভয় হতে লাগল যে, কী বলতে কী বলে ফেললুম! তাঁর মুখ-চোখ একেবারে লাল হয়ে উঠল। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখ পেসন, ঠাকুরকে তুই যতটুকু বুঝেছিস, ঠাকুর কী ততটুকুই? আর তুই ঠাকুরকে কতটুকুই বা বুঝেছিস! জানিস, ঠাকুর আমার স্ত্রী-পুরুষের ভেদ মেরে দিয়েছেন। আত্মাতে আবার স্ত্রী-পুরুষ কিরে? তাছাড়া ঠাকুর এসেছেন সারা দুনিয়ার জন্য। তিনি কি বেছে বেছে কেবল পুরুষদের উদ্ধার করতেই এসেছেন? তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই। তোরা নিজ নিজ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মেপে ঠাকুরকে এত ছোট করতে চাস? তাঁর কৃপা এ-দুনিয়ার সব নর-নারী তো পাবেই,

তাঁর কৃপার প্রভাব অন্যলোকেও গিয়ে পৌঁছুবে। তিনি তোকে যা বলেছেন, তা তো আর মিথ্যা নয়! সে-ও সত্যি। তিনি তোকে যেভাবে উপদেশ দিয়েছেন, তুই সেভাবেই চলবি, কিন্তু আমাকে বলেছেন অন্যরকম। বলেছেন কিরে, দেখিয়ে দিয়েছেন। আমায় তিনি নিজে হাত ধরে যা-ই করাচ্ছেন, তা-ই আমি করছি।'

"এই কথা বলতে বলতে স্বামীজী যেন একটু শান্তভাব ধারণ করলেন। আমি তো স্বামীজীর ঐ মূর্তি দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে পড়েছিলুম। আমার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না, তা-ই দেখে স্বামীজীর যেন একটু দয়া হলো। তিনি একটু হাসিমুখে বললেন, 'মেয়েদের ভেতর সেই আত্মশক্তি না জাগলে কী কখনো কোনো জাত জাগে, না কোনো জাত উঠতে পারে? আমি তো সারা দুনিয়াটা ঘুরে দেখলুম। সব দেশেই মেয়েদের প্রায় একই অবস্থা, বিশেষ করে আমাদের এ পোড়া দেশে। তাই তো এ-জাতের এত অধঃপতন। মেয়েরা জাগলেই দেখবি যে সমগ্র জাতটা আবার জেগে উঠেছে। তাই তো মা এসেছেন। মায়ের আসার পর থেকেই সব দেশের মেয়েদের ভেতর জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। আরো কত হবে দেখবি।'

"স্বামীজী আরো কী-সব বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একজন এসে পড়াতে স্বামীজী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর ঘর থেকে চলে এলুম। স্বামীজী এমন জোরের সঙ্গে সব বলছিলেন যে, তাঁর কথার ওপর আর কথা বলতেও সাহস হয়নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে, ঠাকুর আমায় যেমন বলেছেন আমি তেমনই করে যাব। স্বামীজীর কথা স্বতন্ত্র, তিনি হলেন ঠাকুরের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। বাস্তবিকই তো, ঠাকুরকে স্বামীজী যেমন বুঝেছেন তেমনটি আর কে বুঝতে পারবে! তাঁকে দিয়েই ঠাকুর তাঁর সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন। স্বামীজী একজনই হন। আমরা তো আর স্বামীজী হতে পারব না! তবে এ-ও দেখেছি যে, স্বামীজী তাঁর মেম-শিষ্যাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন বটে, কিন্তু নতুন সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি কখনো তাঁদের কাছে যেতে দিতেন না। কোনো জিনিসপত্র পাঠাতে হলেও, হয় তিনি নিজে যেতেন বা বড়দের মধ্যে কাউকে পাঠাতেন। এমনকী, তাঁর গুরুভাইদের মধ্যেও সকলকে তাঁদের কাছে পাঠাতেন না।"

এসব কথা বলতে বলতে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন-প্রাণ যেন ক্রমেই স্বামীজীর ভাবে ভরপুর হয়ে গেল। এখন খালি স্বামীজীর কথাই চলতে লাগল। তিনি আবার বললেন, "আমি স্বামীজীকে যেমন ভালবাসতুম, তেমন ভয়ও করতুম। যখন দেখতুম যে স্বামীজীর মেজাজ একটু অন্য রকমের, তখন পাশ

কাটিয়ে চলে যেতুম। স্বামীজী হয়তো ডাকতেন—'পেসন পেসন, শোন, এদিকে আয়।' আমি দূর থেকেই বলতুম, 'এখন মশাই কাজে খুব ব্যস্ত আছি, পরে আসব।' এই বলে সরে পড়তুম।"

খানিকক্ষণ চুপ করে চোখ বুজে থাকার পর আবার বললেন, "স্বামীজী এখনও তাঁর ঐ-ঘরে আছেন। আমি তো তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পা টিপে টিপে চলি, যাতে তাঁর কোনোরকম অসুবিধা না হয়। আর তাঁর ঘরের দিকে বড় একটা তাকাইনে, পাছে চোখাচোখি হয়ে যায়।"

একথা শুনে জনৈক সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনি এখনো স্বামীজীকে দেখতে পান?"

মহারাজ ঃ তিনি রয়েছেন আর দেখতে পাব না? তিনি ঐ সামনের বারান্দায় বেড়ান, ছাদে পায়চারি করেন, নিজের ঘরে গান করেন, আরো কত কী করেন। আমি আগে আগে যখন মঠে আসতুম, বেশিরভাগ সময়ই ঐ ছোট ঘরটিতে থাকতুম। আমি তো পারতপক্ষে বারান্দার দিকের দরজাই খুলতুম না। স্বামীজী প্রায়ই ঐ বারান্দায় বেড়াতেন। তিনি এক-একসময় এক-এক ভাবে থাকতেন। একবারের ঘটনা বেশ মনে আছে। তখন স্বামীজী স্থূলশরীরে আছেন। একদিন তিনি ভাবের ঘোরে সারারাত ঐ বারান্দায় গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছিলেন। গানটির এক লাইনই সারারাত গেয়েছিলেন—মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। বেশিরভাগ সময়ই 'মা ত্বং হি তারা' এই গাইতেন। স্বামীজীর যখন এমনিধারা ভাব হতো, তখন কেউই তাঁর কাছে যেতে সাহস করতেন না। স্বামীজী ঐ এক লাইন গান গাইছেন আর পায়চারি করছেন। এক-এক বার গান গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল, আওয়াজ যেন আর বেরোয় না, আর পা-ও যেন চলে না। ভোর পর্যন্ত ঐভাবে কাটিয়েছিলেন।

"স্বামীজী বাইরে এত জ্ঞান, কর্ম—এসব প্রচার করতেন, কিন্তু ভেতরে ছিল পুরোপুরি ভক্তির ভাব। তাঁর ভেতরটা খুবই কোমল ছিল। বাইরে সিংহবিক্রম, কিন্তু প্রাণ ছিল মায়ের চাইতেও কোমল। আর গুরুভাইদের প্রতি কী ভালবাসাই না তাঁর ছিল, বিশেষ করে মহারাজকে তিনি খুবই ভালবাসতেন, আর মান্যও করতেন। ঠিক 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'—এই ভাব। তা বলে কারো একটু দোষ বা ত্রুটি দেখলে তা সইতে পারতেন না। যে-মহারাজকে এত ভালবাসতেন, সেই মহারাজকেও একবার এমন গালমন্দ করলেন যে, মহারাজ তো কেঁদে আকুল। অবশ্য সে-ব্যাপারে দোষ ছিল পুরোপুরি আমারই। মহারাজ আমায় বাঁচাতে

গিয়ে নিজের ওপর দোষটা টেনে নিয়েছিলেন। তখন গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাটের কাজ হচ্ছে। স্বামীজী আমায় বলেছিলেন, 'পেসন, সামনে একটা ঘাট হওয়া খুব দরকার এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার ধারে পোস্তাও খানিকটা বাঁধাতে হবে। তুই একটা প্ল্যান করে আমায় একটা estimate (খরচের আন্দাজ) দিবি তো। কত কী খরচা পড়ে দেখব।' আমি তো একটা প্ল্যান করলুম এবং কত খরচ পড়বে তারও একটা হিসাব দিলুম। estimate-টা ভয়ে ভয়ে ধরে, স্বামীজীকে প্ল্যান দেখিয়ে বললুম, এই হাজার তিনেক টাকা হলেই সব হয়ে যাবে। স্বামীজী তাতে ভারি খুশি। মহারাজকে ডেকে বললেন, 'কী বলো রাজা, এই সামনেটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে বেশ হবে। পেসন তো বলছে যে তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বলো তো কাজ শুরু হতে পারে।' মহারাজও বললেন যে, তিন হাজার টাকায় যদি হয়, তো এ টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। সেই অনুসারে কাজ তো আরম্ভ হলো, আমিই কাজকর্ম দেখাশোনা করছি—হিসাবপত্র সব মহারাজই রাখতেন আর টাকাপয়সা সংগ্রহের চেষ্টা তিনিই করতেন। কাজ যত এগুচ্ছে, স্বামীজীরও খুব আনন্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে তিনি হিসাবপত্র দেখেন এবং টাকাপয়সা আছে কি না খোঁজখবর করেন। এদিকে কাজ যত এগুতে লাগল ততই স্পষ্ট হতে লাগল যে, তিন হাজার টাকায় আর কুলোবে না; আমি তো বেগতিক দেখে তখন মহারাজকে গিয়ে বললুম, 'দেখুন, আমি তো স্বামীজীকে ভয়ে ভয়ে বলেছিলুম যে তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এ-কাজ শেষ হতে খরচ ঢের বেশি হবে, এখন কী উপায় বলুন।' মহারাজ নেহাত ভালমানুষ ছিলেন—আমার অবস্থা দেখে তাঁর খুবই দয়া হলো। তিনি বললেন, 'তার আর কী করা যাবে। কাজে যখন হাত দেওয়া হয়েছে, যে করেই হোক শেষ করতে হবে। তুমি টাকার জন্য ভেবো না, কাজ যাতে ভালভাবে হয়, তা-ই তুমি করো।' আমি তো তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে যে, কখন স্বামীজীর গালাগাল খেতে হবে। এমনসময় একদিন স্বামীজী কাজের খরচপত্রের হিসাব দেখতে চাইলেন। মহারাজ হিসাবপত্র খুবই সুন্দরভাবে রাখতেন। হিসাব দেখতে দেখতে স্বামীজী যখন দেখলেন যে—তিন হাজার টাকার বেশি খরচ হয়ে গিয়েছে, অথচ কাজ শেষ হতে তখনো ঢের বাকি, তখন তিনি মহারাজের ওপর খুব একচোট নিলেন। মহারাজ একটা কথাও বললেন না, চুপচাপ সব সয়ে গেলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁর ভারি দুঃখ হয়েছিল, স্বামীজী খাতাপত্র দেখে ঘরে চলে যেতেই তিনি আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে নিজের ঘরে গিয়ে একটু পরে স্বামীজীরও মনে

হলো যে, মহারাজকে এতটা কড়া কথা বলা ঠিক হয়নি। তাঁরও মনে তখন ভারি অনুতাপ এসেছিল। আমি তো পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিলুম আর ভাবছিলুম, আমার জন্যই মহারাজকে এতটা মনঃকষ্ট পেতে হলো। স্বামীজী হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, 'দেখ তো পেসন, রাজা কী করছে?' আমি মহারাজের ঘরের কাছে গিয়ে দেখি যে, সব দরজা-জানলা বন্ধ, আমি দু-এক বার 'মহারাজ' 'মহারাজ' বলে ডাকলুম কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামীজীকে এসে তা-ই বলাতে তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুই তো ভারি বোকা! তোকে বললুম দেখতে যে, রাজা কী করছে, আর তুই কিনা এসে বলছিস যে, তার ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ। দেখ শিগগির, রাজা কী করছে।' আমি আবার গিয়ে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুলে দেখি যে, মহারাজ নিজের বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বললুম, 'মহারাজ, আজ আপনি আমার জন্যই এত কষ্ট পেলেন।' মহারাজ তখনো কাঁদছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলে বললেন, 'দেখো তো হরিপ্রসন্ন, আমার কী দোষ বলো তো। অথচ উনি এক-এক সময় এমন কড়া কথা বলেন যে, তা আর সওয়া যায় না। আমার তো এক-একসময় মনে হয় যে, এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যাই পাহাড়ে।'

''আরো দু-এক কথার পর আমি স্বামীজীর কাছে ফিরে এসে বললুম, 'মহারাজ শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন।' ঐকথা শুনে স্বামীজী একেবারে পাগলের মতো ছুটে মহারাজের ঘরের দিকে গেলেন; আমিও পেছনে পেছনে গেলাম। দেখি যে, স্বামীজী মহারাজের ঘরে গিয়েই একেবারে মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'রাজা রাজা, আমায় ক্ষমা করো। আমি কী অন্যায়ই না করেছি! তোমায় গালাগাল করেছি, তুমি আমায় ক্ষমা করো।' মহারাজ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন, কিন্তু স্বামীজীকে অমনধারা কাঁদতে দেখে তিনি তো অবাক! তিনি কী যে করবেন, কী যে বলবেন, কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। শেষটায় বললেন, 'স্বামীজী, আপনি অমন করছেন কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছেন, তাতে হয়েছে কী? আপনি আমায় ভালবাসেন বলেই তো এসব কথা বলেছেন।'

''স্বামীজী তখনো মহারাজকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন, আর বলছেন, 'না, তুমি আমায় ক্ষমা করো। তোমায় ঠাকুর কত আদর করতেন। কখনো তিনি তোমায় একটা কড়া কথাও বলেননি। আর আমি কিনা ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করলুম, তোমার মনে কষ্ট দিলুম! আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে, কোথাও গিয়ে নির্জনে থাকব।'

"মহারাজ বললেন, 'সেকী স্বামীজী, আপনার গালাগাল তো আমাদের আশীর্বাদ। আপনি কোথায় চলে যাবেন! আপনি যে আমাদের মাথা। আপনি চলে গেলে আমরা কী নিয়ে থাকব?'

"এরকম অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর দু-জনেই শান্ত হলেন। সে-দিনের দৃশ্য জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। স্বামীজীকে এমন অধীর হয়ে কাঁদতে আমি আর কখনো দেখিনি। তাঁদের একের প্রতি অন্যের কী টান, কী ভালবাসা! স্বামীজী গুরুভাইদের সকলকে এত বেশি ভালবাসতেন—ঠিক যেন মায়ের মতো, সেজন্যই কারো এতটুকু দোষ বা ত্রুটি দেখতে পারতেন না। তিনি চাইতেন, তাঁর গুরুভাইরা সকলেই তাঁর মতো হোক। স্বামীজীর ভালবাসার তুলনা নেই!"

স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা এক স্বর্গীয় সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ বিরাট সৌধ প্রেমরূপ ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যতদিন এই ভিত্তি সুদৃঢ় থাকবে, ততদিন এই সৌধ কালের প্রবাহকে ব্যাহত করে সুমেরুবৎ অচল-অটল থাকবে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪০তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পূতসঙ্গে

স্বামী অপূর্বানন্দ

(১)

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীযুক্ত ন—বাবু প্রমুখ কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যেসকল সৎপ্রসঙ্গাদি করেছিলেন, তারই কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

মহারাজজী কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "দেখো, ভগবান সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান—তাঁর অদেয় কিছু নেই। লোকে যা চায়, তিনি যেন চাকরের মতো তাকে সব জোগাড় করে দেন। তাই তাঁর কাছে কিছু চাইতে নেই—তিনি যা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন তা-ই ভোগ করবে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। দেবতাদের কাছে চাইলে তাঁরা double-edged sword (দু-দিকে ধারবিশিষ্ট তরবারি) দেন। ঠিক ঠিক ব্যবহার করলে মঙ্গল, আর misuse (অপব্যবহার) করলে অমঙ্গল।

"মহাপুরুষের লক্ষণ—তাঁদের কথা সত্য; যা তাঁদের মুখ থেকে বেরোয়, তা নিশ্চয়ই ঘটবে। আর সাধুর চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তাঁকে দশ-ঘা মারলেও যদি তিনি তা অম্লানবদনে সহ্য করেন, তাহলে তিনি যথার্থ সাধুপুরুষ। এই দেখো না, ভৃগুমুনি কী করেছিলেন? বিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা কি না, তা পরীক্ষা করতে গিয়ে বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন, তখন বিষ্ণু নির্বিকারচিত্তে অতি ধীরভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করাতে, ভৃগুমুনি তাঁর গোলাম হয়ে গেলেন। সাধু হওয়া বড়ই কঠিন—কায়সংযম, বাক্যসংযম, মনঃসংযম চাই, ধীরস্থির ও গম্ভীর হওয়া চাই।

"দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর একখানি ইংরেজি বই দিয়ে আমায় পড়তে ও তার মানে করতে বললেন। তাতে বলেছে—সত্যকথা কইবে, কারো জিনিসে লোভ করবে না, ইন্দ্রিয়দমন করবে। ঠাকুর ঐকথা শুনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন—বালকের মতো খুশি হলেন। তাঁর ঐ খুশি-ভাব এখনো আমার মনেতে deeply impressed (গভীরভাবে অঙ্কিত) হয়ে আছে। তাঁর ঐরূপ আনন্দপ্রকাশের কারণ আমার মনে হয় এই যে, ঐ তিনটি জিনিস ঠিক ঠিক হলে মানুষের ঈশ্বরলাভ হয়ে যায়।

"কাম-ক্রোধাদির দমন না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না। virginity infringe (কুমারীত্বকে ব্যাহত) করলে মহামায়া কিছুতেই ক্ষমা করেন না। কর্তব্য

হচ্ছে—Lead a good life, lead a pure life, lead a sacrificing life and above all lead a servant's life. (সৎ-জীবন যাপন করো, পবিত্র-জীবন যাপন করো, স্বার্থহীন-জীবন যাপন করো এবং সর্বোপরি চাকর বা সেবকের মতো জীবন যাপন করো।) Do service to the needy (আতুরের সেবা করো), কিন্তু প্রতিদানের কোনো আশা রেখো না। নিজ-ধর্মে আস্থাসম্পন্ন, পরধর্মে বিদ্বেষহীন আর সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে যেকোনো অবস্থায়ই থাক না কেন, মা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তার জন্য পুরোপুরি mental training (মানসিক শিক্ষা) দরকার। ঐ শিক্ষা স্থায়িভাবে কী করে হয়, তা হিন্দুরা বেশ জানে। উপায়—ব্রহ্মচর্যপালন, নির্লোভ হওয়া আর দান পরিগ্রহ না করা। যে অন্ন-দ্বারা শরীর-মন গঠন হবে, সেই অন্নই যদি শুদ্ধ ও পবিত্র না হয়, তাহলে মানসিক উন্নতি কী করে হবে? গোড়ায় গলদ থাকলে তার ফলও সেরকমই হবে।

"দান গ্রহণ করলে বড়ই সঙ্কুচিত হতে হয়। নিজের টালই সামলাতে পারা যায় না, আবার অপরের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া! সেজন্য public money (জনসাধারণের টাকা) নেহাত যদি নিতেই হয়, তাহলে যে-উদ্দেশ্যে তা নেওয়া হয়, ঠিক ঠিক সেই জন্য ব্যয় হওয়া চাই-ই চাই। ঠাকুর বলতেন—'দেখিস, শাকের কড়ি মাছে আর মাছের কড়ি শাকে যেন খরচ না হয়।'

"মনকে ঠারেঠোরে বোঝালে, সে নিজেকে নিজেই ঠকানো হলো। lower self (নিম্নতর প্রকৃতি) যা-তা করে বোঝালে হবে কী, higher self (উচ্চতর প্রকৃতি) একদিন-না-একদিন তার account call for (জবাবদিহি) করবেই করবে, তখন answer (উত্তর) না দিতে পারলে ফলভোগ নিশ্চয়ই করতে হবে।

"আত্মোপলব্ধি করবার জন্য শরীরধারণের নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে ও ভগবানের কাজ নিষ্কামভাবে করবে।

গজধন বাজিধন আওর রতন ধন মান—
আওত যব সন্তোষ সব ধন ধুরিসমান।

"বিবাহ করলে এসব হওয়া বড় মুশকিল। বাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সন্তোষ-ধন পাওয়া যায় না। বাসনা গেলে তবে নিস্তার।

খাওয়ালি পরালি মোরে করিলি কত যতন—
আছ মাত্র জানি আমি, জানি না মা রূপ কেমন।

"এই ভাবটি আমার মনে বেশ impress (প্রভাব বিস্তার) করেছে। মা কত যত্ন করে কত রকমেই না আমাদের লালনপালন করছেন, সবই তিনি করছেন,

সবই তাঁর দেওয়া অথচ দেখা দিচ্ছেন না। সেটা মায়ের দোষ তো বলতে পারা যায় না। তিনি তো কাছেই রয়েছেন, তিনি তো প্রকাশ হয়েই আছেন, আমরাই স্ব-ইচ্ছায় তাঁকে দেখছি না। ইন্দ্রিয় আর রিপুর বশবর্তী হয়ে থাকি, আর এরা নিজেদের খেলার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। best solution (শ্রেষ্ঠ সমাধান) হচ্ছে—রাত-দিন মাকে চিন্তা করা, সর্বান্তঃকরণে তাঁর শরণাগত হওয়া আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা যে, ইন্দ্রিয়ের বশে কিছুতেই থাকব না—একেবারে দমন! অবশ্য ধীরে ধীরেও হয়, কিন্তু তাতে না জানি কত জন্ম কেটে যাবে!

"বিশ্বাস নেই! এই বিশ্বাসের জোরে অধ্যবসায় সহকারে মাকে প্রার্থনা করবে purification of thought-এর (চিন্তার শুদ্ধির) জন্য, সব ঠিক হয়ে যাবে। যার যা ভাব, ঠিক ঠিক হলে সে তা পাবেই পাবে। মনকে পবিত্র করো, আর সব হয়ে যাবে। মনে যেই purity (পবিত্রতা) আসবে, অমনি ভূমা আনন্দের আস্বাদ পাবে। সে আনন্দের তুলনা নেই। পার্থিব সুখ সেই অনন্ত জমাটবাঁধা আনন্দের পাহাড়ের কাছে একটা কণার তুল্য। যে সে-সুখ একবার পেয়েছে, সে কী আর এ জাগতিক সুখে ভোলে! যে নিজের ইন্দ্রিয়সংযম করেছে, তার হয়ে যাবে—সে নিজেই টের পাবে যে, সে ভগবানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

"...ঠাকুরের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি কারোর প্রতি কটাক্ষ করেননি। ...

"মানুষের স্থূলবিষয়ের ভোগ মরবার পরেও সূক্ষ্মভাবে থাকে। স্থূলদেহটাই কেবল যায়, আর ইন্দ্রিয়াদি-মন-বুদ্ধি সবই থাকে, তখন ভোগ আরও intense (তীব্র) হয়। সূক্ষ্মের পর কারণ অবস্থায়ও মন থাকে। তুরীয়তে illumination (জ্ঞান) হয়।

"দিনের বেলায় বই নিয়ে থাকি, রাতে যখন শান্তি বিরাজ করে তখন illumination (জ্ঞানের আলো) দেখি। কিন্তু ওরকম হলে একদিকে life shortened (আয়ু কম) হয়ে যায়—তাতে আর ভয় কী? Ignorance-এ (অজ্ঞানে) থাকার চেয়ে enlightenment (জ্ঞানালোকিত) হওয়া শতগুণে ভাল।

"আজকাল আর স্বপ্ন দেখি না; এখন দেখি যে, তিনিই স্বয়ং প্রকাশিত হয়ে আছেন। তাই চুপ করে পড়ে থাকি আর দেখি, সত্যিই তাঁকে কে প্রকাশ করতে পারে? তিনি যে স্বপ্রকাশ। সূর্য উঠলে আর কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না যে এই-ই সূর্য, কারণ তিনি যে নিজের আলোতেই প্রকাশমান।

"বেদান্তে time, space ও causation-কে (কাল, দেশ ও নিমিত্তকে) মায়া বলে। ইনিই 'মা', ইনিই 'শক্তি'। যিনি মায়াকে জানতে পেরেছেন, তিনি মায়াকে

জয় করেছেন—তিনিই শক্তিমান পুরুষ। যে এই time-এর (কালের) utility (প্রয়োজনীয়তা) বুঝে একে whole-heartedly utilise (সর্বান্তঃকরণে ব্যবহার) করবে, সেই time-কে জয় করবে। দেখো, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—He who sees inactivity in activity and activity in the midst of inactivity, sees truely. He is a seer indeed; so you have to be a soldier and yogi at the same time. (যিনি কর্মের মধ্যে নৈষ্কর্ম এবং নৈষ্কর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন, তিনিই ঠিক ঠিক দেখেন, তিনি যথার্থই তত্ত্বদ্রষ্টা। অতএব, তোমাকে একই সঙ্গে কর্মী ও যোগী হতে হবে।) এ world (দুনিয়া) কি বসে থাকবার জন্য? এখানে কুঁড়েমি করলে চলবে কেন। Real rest you will find when you are unselfishly active. (যখন তুমি নিঃস্বার্থভাবে কর্মতৎপর হবে, তখনই প্রকৃত বিশ্রাম অনুভব করবে।) বীরের মতো কাজ করে যাও। শ্রীভগবান পেছনে আছেন, তাঁকে সদাসর্বদা স্মরণ করে কাজ করবে। সত্যপথে দাঁড়াও আর তাঁকে ডাকো, তিনি মঙ্গল করবেনই করবেন।

"যে sphere-এ (অবস্থায়) আমরা আছি, তাকে একেবারে মুখের এককথায় আমরা উড়িয়ে দিতে চাই—'সব মায়া, কুছ নেহি'—অথচ মায়া কী, তা জানলাম না—বুঝলাম না। সাধু সে-ই, যিনি এই time, space ও causation-কে জেনে তার ওপরে গেছেন।

"জগতে সবই compound (যৌগিক বা মিশ্র), কেবলমাত্র ঈশ্বরই simple (অবিমিশ্র)।

"সে-দিন দেখলাম যে, আমি নিচের blue (দিঙ্‌মণ্ডল) থেকে ঐ ওপরের blue (আকাশ) পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছি। এটা স্বপ্নই বল আর যা-ই বল, আমার কিন্তু খুব আনন্দ হয়েছিল—এখনও ভাবলে আনন্দ হয়।"

* * *

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার। সন্ধ্যাবেলা এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কয়েক জন ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বললেন, "গোপ-গোপী কী সাধারণ হে? এক-একজন এক-একটা world (বিশ্ব) সৃজন করতে পারেন। এঁদের ভাব ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে first essential (প্রথম প্রয়োজন) হচ্ছে—selfless (স্বার্থশূন্য) হওয়া। passion-কে (রিপুকে) control (দমন) করতে হবে আর বিশ্বাস করতে হবে যে, The Lord is immanent everywhere. (শ্রীভগবান সব স্থানেই রয়েছেন।)

"ওহে, ভগবান যে অহরহ আমাদের অন্তর ও বাহির থেকে বলছেন—ভয় কী? ওরে তোরা আমায় ছেড়ে যাবি কোথায়? খানিক খেলতে ইচ্ছা হয়েছে, খেলে নে; তারপর হৃদয়মধ্যেই আমাকে পাবি, ডাকলেই পাবি। যেমুহূর্তে passion control (রিপু বশীভূত) হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই আমাকে পাবি—জাজ্বল্যমান আনন্দময় পুরুষরূপে ভেতরেই পাবি।

"ত্রিসন্ধ্যা মাকে ডাকতে হয়—মা বুদ্ধি দাও, যে-বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। আমাদের মা-ই law (নিয়ম) রূপে বিরাজমান। এই law-এর সঙ্গে চললে, এই law-কে মেনে চললে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, আর এর বিরুদ্ধাচরণ করলে destruction (ধ্বংস) অনিবার্য—You will be smashed to pieces. (তুমি পেষিত হয়ে টুকরো টুকরো হবে।) law একেবারে silent worker (নীরবকর্মী), মহান ও সর্বশক্তিমান। এঁকেই খ্রিস্টানরা Holy Ghost (ঈশ্বরের আত্মা) বলে, আর হিন্দুরা 'শক্তি' বলে।

"মা দশভুজা হয়ে আসেন এবং বলেন, 'ওরে ভয় কী? আমার শরণাগত হয়েছিস, তাই আমি দশভুজা হয়ে তোকে রক্ষা করছি। যমের সাধ্য কী যে তোকে ছোঁয়, তোকে অভয়দানের জন্য বরাভয়া হয়ে আছি। তোর বিঘ্ন ও বিপদ অপসারণের জন্য খড়্গ ধরেছি।' দেখো, আমার নিজের experience (অভিজ্ঞতা) এই যে, মা আমাকে কোলে করে রেখেছেন—সদা রক্ষা করছেন। এই তিপ্পান্ন বছর মা নিজের মোহিনীমূর্তি দেখাননি। এমনকী, অনেক দূরে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও চট করে বুঝিয়ে দেন, আর আমার চতুর্দিক বেষ্টন করে রাখেন, তার ভেতর অমঙ্গল আসবার সাধ্য নেই।

"সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়—মানুষ বা জীবমাত্রেরই ইচ্ছা যে, সে যেন বেঁচে থাকে; এতে এই বোঝায় যে, জীব অমর—সত্য সত্যই অমর। জীবের ভেতরে যিনি আছেন—তিনি অনাদি, অনন্ত, জন্ম-মৃত্যুরহিত। তাঁর মৃত্যু বলে কিছুই নেই। যেমন পুরানো জামা ছেড়ে ফেলা হয়, তেমন শরীর কোনোপ্রকারে অপটু হলে তিনিও সেটা ত্যাগ করে আর একটা দেহ গ্রহণ করেন।

"মানুষের greatest and only possession (সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র সম্পত্তি) হচ্ছে mind। ঈশ্বর এই mind-এর constitution (গঠন) এমনই করেছেন যে, সে তোমার আজ্ঞাপালন করবে। যদি মন constitutionally disobedient (স্বভাবতই অবাধ্য) হতো, তাহলে আমরা কোনো কাজের জন্য দায়ী হতাম না; তাহলে মানুষ free (স্বাধীন) হতো না আর best product of creation

(সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ) হতো না। তুমি full master of your mind (মনের সম্পূর্ণ প্রভু)। You can mould it in any way and in any shape you desire. (তুমি তাকে যেমন ভাবে এবং যেমন ইচ্ছা গড়তে পার।) mind যখন আমার মুঠোর ভেতর তখন pure thoughts (পবিত্র চিন্তারাজি) ভিন্ন আর তাকে অন্য কোনো খাদ্য দেওয়া যাবে না। যেমন স্থূলভাবে আমরা বেশ বুঝি যে, আমাদের শরীরধারণের জন্য ভাল পুষ্টিকর আহার চাই, অনিষ্টকর বা বিষাক্ত খাদ্য শরীর নষ্ট করবে, সেজন্য যে করেই হোক শরীরকে ভাল খাবার জোগাই, তেমনি মনকেও পবিত্র চিন্তা, সদ্‌যুক্তি ও আলোচনার দ্বারা পুষ্ট করবে—অখাদ্যরূপ কুচিন্তা বা কুসঙ্গ মনকে দেওয়া যাবে না। যে morally guilty (নৈতিক চরিত্রে দোষী), সে যথার্থই মৃত। এ-মৃত্যুর তুলনায় শরীরের মৃত্যু কিছুই নয়।

"মন যখন higher laws-এর (উচ্চতর নিয়মের) সঙ্গে vibrate করে, তখন ভ্রূ-মধ্যে ইষ্টের বা চিন্ময় দেবদেবীর দর্শন হয়। তুমিই মনের কর্তা—মনকে পবিত্র রাখো, ব্যস—তোমার responsibility ends there (দায়িত্ব শেষ), বাকি সব ভগবানের হাতে। ভগবান সব বোঝেন। তিনি তোমাকে অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবেন। তিনি কল্পতরু, তিনি সব জুগিয়ে দেন। ঠাকুরের সেই গল্পটি বেশ। একজন শুনলে যে ঈশ্বর কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যা চাইবে তা-ই পাবে। সে ধনদৌলত, স্ত্রী-পুত্র, গাড়ি-ঘোড়া নানারকম ঐশ্বর্য চায়, অমনি পায়। এমনসময় তার মনে হলো, এসময় যদি একটা বাঘ এসে আমায় খেয়ে ফেলে, তাহলে তো সব মাটি! যেই অমনধারা ভাবা, অমনি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেললে। তিনি যেন চাকরের মতো আমাদের সব জুগিয়ে দিচ্ছেন। দোষ তাঁর, না আমাদের? desires-ই (বাসনাসমূহই) সব অনিষ্টের মূল, আর কারও দোষ নয়। তাই বুদ্ধিমান লোক ঈশ্বরকে বলেন—তোমার কাজ তোমাতেই থাকুক—আমি অকর্তা, যন্ত্রস্বরূপ কাজ করছি। খুব বিশ্বাস চাই, ধৈর্য চাই, ভরসা চাই—সব হয়ে যাবে। যখন ঠাকুরকে ধরেছ, ঠিক পথই ধরেছ। তিনি জীবকে ত্রাণ করতেই এসেছিলেন। তাঁর নাম জপ করো। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকালেই সব পাপ দূর হয়ে যায়। তিনি অন্তর্যামী, সব বোঝেন। তাঁকে মনের কথা জানাবে—স্বার্থ নিয়ে তাঁর কাছে যাবে না। ভগবানের কাছে টাকাকড়ির মতো কী তুচ্ছ জিনিস চাইবে? তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে—তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য, সত্যলাভের জন্য। কেবল তাঁকে ধরে থাকবে—ভয় কিছুই নেই। মনটা ভয়ানক পাপী। যতক্ষণ না একটা heavy (গুরুতর) আঘাত পায় ততক্ষণ ঠিক ঠিক ভগবানকে ডাকে না।

"gross corporal framework (স্থূল দেহসঙ্ঘাত) চলে গেলে subtle corporal framework-এ (সূক্ষ্মশরীরে) আত্মা নিজের কর্ম অনুযায়ী আরও intensely (তীব্রভাবে) ভাল-মন্দ ফলভোগ করে। যদি কেউ by control of passions (ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা) time and space-এর (কাল ও দেশের) ওপর যায়, তখন সে ঐ departed souls (পরলোকগত আত্মাদের) ঠিকঠিকভাবে call করতে পারে, আর সাড়াও পায়; যেমন স্থূলভাবে আমরা কোনো লোককে ডাকলে তার জবাব পেয়ে থাকি, সেইরকম।"

(২)

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে জী—বাবু, হ—বাবু, ন—বাবু প্রমুখ কয়েক জন ভক্ত উপস্থিত। আজ পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজজীর শরীর খুবই ক্লান্ত। 'পঁড়েলা' মহাদেব দর্শন করতে গিয়েছিলেন; আশ্রমের পাচকটি সঙ্গে ছিল। দেবদর্শন করে পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে ফিরে এসেছেন, তাই শারীরিক ক্লান্তির দিকে মোটেই খেয়াল নেই। আনন্দে ভক্তদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গাদি করছেন। বললেন, "কাল যদিও বলেছিলাম যে পঁড়েলা মহাদেব দর্শন করতে যাব, কিন্তু ভেতরে যে খুব একটা আগ্রহ ছিল তা নয়; হয়তো যেতুম না, কিন্তু রাতে আশ্চর্য দর্শন হলো!" ...বলতে বলতে মহারাজ ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর পর্যন্ত পালটে গেল, পরে খুব ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "নিচ থেকে ওপর—ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্যোতিতে ভরে গেল—সে যে কী, তা মুখে বলা যায় না, কিন্তু ভারি আনন্দ হয়েছিল। বুঝতে পারলুম যে শিব কৃপা করেছেন। The Lord is omnipotent, Mother is omnipotent." (প্রভু সর্বশক্তিমান, মা সর্বশক্তিমতী।) একটু চুপ থেকে মহারাজ আবার আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, "তিনিই সব করছেন, তিনিই রাজা হয়েছেন, তিনিই আবার প্রজা হয়েছেন, তিনিই সাধু, তিনিই চোর। লোকে বৃথা অহঙ্কার করে যে—'আমি করছি'। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করছেন—কারো অপেক্ষা করেন না। তাঁর ইচ্ছাতে আমরা বেঁচে আছি, আর তাঁর দয়াতেই ভগবানের নাম করছি। তিনি ইচ্ছা করলে এখনই আমরা মরে যাব। এই জীবনই যখন তাঁর—তাঁর ইচ্ছাতেই যখন মরণ-বাঁচন, তখন কেন মিছে দুনিয়ার ওপর আসক্তি? আমাদের duty (কর্তব্য) হচ্ছে—তাঁর servant (চাকর) হয়ে থাকা, তাঁরই চিন্তা, তাঁরই কাজ ও তাঁরই ধ্যান-ধারণা করা। আমরা যা-কিছু করি, তা মায়ের চরণকমলে যেন অর্পণ করি। তাঁরই outward manifestation (বাহ্যিক অভিব্যক্তি) হচ্ছে time, space and causation (কাল, দেশ ও নিমিত্ত)।

তিনি বুদ্ধিরূপিণী হয়ে বলে দেন, কী করতে হবে। আমাদের তা-ই করতে হবে। ...

"ঠাকুরের যখন মা-কালীর দর্শন হলো তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, 'আমার যদি ঠিক ঠিক দর্শন হয়ে থাকে তো তিন বার এই বড় পাথরটা লাফ দিয়ে উঠুক।' যেই মনে করা আর অমনি তা-ই হওয়া! ব্যস, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল। এই ঘটনাটি আমি বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে শুনেছি।

"ঠাকুরের সম্বন্ধে আরো একটি অদ্ভুত ঘটনা শুনেছিলাম। বালিতে নীল-মহাদেব আছেন। নীলষষ্ঠীর সময় ঠাকুর হৃদয়রামকে সঙ্গে করে সেখানে শিবদর্শন করতে গেছেন। পূজাদি করে শিবের কাছে বসলেন এবং শিবের মাথায় একটি ফুল ছিল সেটি দেখতে লাগলেন। খানিক পরে বললেন, 'ওরে হৃদে, শিবের মাথা নড়ছে, দেখ এবার ফুল পড়বে, ঐ পড়ল'—যাই বলা আর অমনি শিবের মাথা থেকে ফুলটি পড়ে গেল। ঠাকুরের সবই অদ্ভুত! ঐ ফুল পড়লে তবে শিবের নীল-উৎসব শুরু হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরা এর জন্য মাসাবধিকাল খুব কঠোরভাবে থাকেন, বিশেষ করে মূল-সন্ন্যাসী যিনি। প্রবাদ আছে যে, ঐ-দিন শিবের মাথার ফুল যদি না পড়ে তাহলে মূল-সন্ন্যাসী অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দেন। যাহোক, এদিকে ফুল যেই পড়ল অমনি খুব আনন্দোৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। এই ঘটনাটি আমি একজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের কাছে আলিগড়ে শুনি। তাঁর নাম মনে নেই।

"পঁড়েলা মহাদেবের কৃপা এই দেখলাম যে, তিনি যাওয়া আর আসার সময় কোনো কষ্ট দেননি। যেইমাত্র স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছি অমনি গাড়ি পেয়েছি—যাওয়ার সময় সকাল ৯-৩০টায় আর আসার সময় বেলা ২টায়। মহাদেবের মন্দির গঙ্গার ওপারে শিবকোটির প্রায় opposite-এ (বিপরীত দিকে)। ককামান স্টেশন থেকে প্রায় তিন-চার মাইল। ককামানে পৌঁছে পাচকটি গঙ্গায় নাইতে গেল, আমিও তার সঙ্গে গেলাম। সকলে নাইছে দেখে আমিও নেয়ে ফেললাম। রক্ত-আমাশা অসুখের পরে এই প্রথম গঙ্গায় নাওয়া, প্রায় চার বছর পরে। নেয়ে চলতে আরম্ভ করলাম বালির চড়ার ওপর দিয়ে। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বেলা প্রায় ১২টা হবে, রাস্তা যেন আর ফুরোয় না। মনে হলো, ঠাকুর তুমি এখানে এত দূরে কেন? তারপর ভাবলাম, আমারই দোষ—পঁড়েলা মহাদেব তো আর আমায় আসতে বলেননি। যাহোক, গিয়ে তো পৌঁছালাম। মন্দিরের চারিদিকে মাটি বা পাথরের টুকরোর ঢিপি। বেশি ভিড় হলে, মন্দিরে ঢুকতে পায় না বলে লোকে মাটির পাত্র করে জল মহাদেবের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়। মন্দিরের

চারদিকে চারটে দরজা, ভেতরের মেঝে ১৫ ফিট স্কোয়ার (চৌকো)। খুব জল ও কাদা হয়ে আছে। আমি জল, ফুল, ফল চড়িয়ে মহাদেবকে স্পর্শ করে বাইরে এসে সাড়ে তিন বার প্রদক্ষিণ করে কাছেই হনুমানজীর মন্দির দেখতে গেলাম। তারপর গেলাম পার্বতীর মন্দিরে। মনে পড়ল, আমার রাশনাম পার্বতীচরণ, তা পার্বতীর চরণ দর্শন করে আসি। দর্শন করে অন্য রাস্তায় ফিরলাম। একস্থানে বেশ গানবাজনা হচ্ছে, দোকানপাটও বসেছে। মিঠাইয়ের দোকানে আধ সের করে এক-একটা প্যাঁড়া আট আনায় বিক্রি হচ্ছিল। বড্ড ধুলো হয়েছিল, তাই ঐ মিষ্টি খেতে আর ইচ্ছা হলো না। এক পয়সা দিয়ে একটি রক্ষা (রাখি) কিনে নিলাম। এক পয়সায় যদি শিবের রক্ষা অর্থাৎ আশ্রয় পাওয়া যায়, তো সেটা ছাড়ি কেন—নিয়ে এলাম।"

পরে মহারাজ ব্যাধের উপাখ্যান বললেন—যা থেকে শিবরাত্রির প্রচলন হয়েছে। আর বললেন, "বিশেষ বিশেষ পর্বের significance (তাৎপর্য) এই যে, ঐ ঐ দিনে কোনো মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। যিনি যতটা শক্তিলাভ করেছেন, ততটা পরিমাণে ঐ-শক্তির বিকাশ ঐ-দিনে হতে থাকবে। আর এক explanation (ব্যাখ্যা) এই যে, সূর্য এবং পৃথিবীর motion-এর (গতির) দরুন তিন রকম current (শক্তিপ্রবাহ) produced (উৎপাদিত) হচ্ছে—physical, mental ও spiritual (ভৌতিক, মানস এবং আধ্যাত্মিক)। physical current-এর দ্বারা wind (বায়ু) ও season (ঋতু) প্রভৃতি হয়। mental current-এ দিন-রাত হয়েছে আর spiritual current সূক্ষ্ম বলে ধরা যায় না, তবুও সেটা work (কাজ) করে। physical sub-ordinate to mental (ভৌতিক মানসের অধীন) আর mental to spiritual (মানস আধ্যাত্মিকের বশবর্তী)। ঐ spiritual current-এর দ্বারা কোনোপ্রকারে influenced (প্রভাবিত) হয়ে ব্যাধ অনুভব করল যে—প্রাণিহত্যা করা খারাপ, সে আর প্রাণিহত্যা-দ্বারা জীবনযাপন করবে না; ওসব ছেড়েছুড়ে ভগবানের ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করবে। ঐ particular (বিশেষ) তিথিতে spiritual influence (আধ্যাত্মিক প্রভাব) কিছু বেশিভাবে ছিল, তাই লোকেরা সেই মুহূর্তের importance (গুরুত্ব) দিয়ে watchful (সতর্ক) হয়ে রইল যাতে তারাও spiritual current (আধ্যাত্মিক প্রবাহ) ধরতে পারে। এই theory (মত) কতদূর ঠিক, তা জানি না; আমার মনে হলো তাই বললুম।"

অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজজী বলেছিলেন, "বিশ্বনাথ আমাকে কাশীতে দর্শন দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে কাশীতে সেবাশ্রমের ওয়ার্ড তৈরি করতে যাচ্ছি। বামনদাসবাবুই idea (ভাব) দিয়েছিলেন যে,

একটানা ব্লক করবেন না; তাঁরই পরামর্শ অনুসারে separate wards (আলাদা আলাদা বাড়ি) তৈরি হয়েছে। কাশী স্টেশন থেকে একটা এক্কা করে সেবাশ্রমের দিকে চলেছি, এমনসময় একটা বাঁকের কাছে এক্কা উলটে গেল। আমি পড়ে গেলাম। আমার পা চাকার ভেতর, আর তার ওপর ভারি বাক্সটা পড়ায় খুব আঘাত লেগেছিল। কোনোপ্রকারে তো আবার এক্কা করে আশ্রমে পৌঁছালাম। ডাক্তাররা যা করবার তা করলেন। রাতে খুব জ্বর হলো—জ্বরে ছটফট করছি আর ভাবছি—'হা বিশ্বনাথ! ঠাকুরের কাজের জন্য তোমার রাজত্বে এলাম—নিঃস্বার্থ কাজ, তাও এমন হলো? কাজের যে বিশেষ ক্ষতি হবে।' এই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত তখন ১টা-২টা হবে, দেখছি, জটাজূটধারী বিশ্বনাথ মৃদু হাসতে হাসতে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন বললুম, 'আমাকে কি এখন নিতে এসেছেন? এখন আমি যাব না, ঠাকুরের অনেক কাজ আছে, তা-ই আগে করতে হবে।' ওকথা কে শোনে—তিনি মৃদু হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন ও আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন; শরীর বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব যন্ত্রণাও দূর হয়ে গেল। বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে চলে গেলেন। সে যে কী মধুর হাসি আর কী দিব্য জ্যোতির্ময় চেহারা! আশ্চর্য এই যে, সকালে উঠে দেখি জ্বর নেই, ঘা সব শুকিয়ে এসেছে। এখনো সেই প্রশান্ত-হাসিমুখে-দাঁড়ানো বিশ্বনাথকে দেখতে পাই—তাঁর সঙ্গে কথা বলি আর কত আনন্দ হয়!

"ত্রিবেণীতে স্নান করতে দেবতা ও সাধু-মহাপুরুষরা সূক্ষ্মদেহে আসেন। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও দুপুর-রাত্রি—এই চারটি সময় বেশ প্রশস্ত। তাঁরা না এলে সে-স্থান আর তীর্থ বলে পরিগণিত হতো না। ত্রিবেণী-মায়ী আমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, এ তো তোমাদের কতবার বলেছি। ত্রিবেণীতে ডুব দিয়ে উঠেছি, আর অমনি মায়ের বালিকামূর্তি তিনটি বেণীসহ দেখলাম। পরে রাখাল মহারাজ শুনে বলেছিলেন যে, সত্যই দেবী দর্শন দিয়েছিলেন। দর্শনাদি সত্য কি না জানবার উপায় হলো, সত্যকার দর্শন পেলে সে-ভাব স্থায়ী হবে, আর তাতে আনন্দ ও জ্ঞান হবে। এখনো মায়ের সেই বালিকামূর্তি-দর্শনের কথা ভাবলে এক অনির্বচনীয় দিব্য আনন্দে মন-প্রাণ ভরে যায়।

"নক্ষত্রলোক থেকে জীব পৃথিবীতে আসে, শুদ্ধ আত্মারা সব দেখতে পান। ঠাকুর দেখেছিলেন যে, স্বামীজী সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছিলেন।

"মানুষ মরবার সময় মৃত্যুযন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে যায়। সেসময়ে এক বার ভগবানের নাম করতে পারলে আর কিছুই ভাবতে হয় না, ভগবান তার সব ভার

নিয়ে নেন। সাধারণত মানুষ মরে পিতৃলোকে যায়। মানুষের প্রাণবায়ু যেই দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে messenger-রা (দেবদূতগণ) সূক্ষ্মশরীর যেখানে নিয়ে যাওয়ার সেখানে নিয়ে যান। সেখানে সব আপনার লোকেরা আছে, অমনি তারা আহ্বান করে নেয়। সেখানে সকলেই খুব আনন্দে থাকে এবং কর্মফলানুযায়ী অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে বীজ হয়ে আসে ও suitable (উপযুক্ত) গর্ভে গিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যদি suitable (উপযুক্ত) স্থান না হলো তো শরীর ছেড়ে দেয়। নক্ষত্রাদির influence-এও (প্রভাবেও) আয়ুক্ষয় হয়।

"স্থূলদেহে বদ্ধ থাকার দরুন মনের power (শক্তি) কম হয়ে যায়। যখন শরীর ছেড়ে যায়, তখন মনের wonderful power (অদ্ভুত শক্তি) হয়। অনেক কিছু দেখতে-শুনতে পায় এবং দ্রুতগতিতে নিজ অভীষ্টলোকে দূতদের সঙ্গে চলে যায়।"

* * *

২২ মে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে স—বাবু, চা—বাবু, ন—বাবু প্রমুখ অনেক ভক্ত পরিবৃত হয়ে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বসে আছেন। সন্ধ্যা হয় হয়। অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণচ্ছটা ধরণির বুকে সবেমাত্র মিলিয়ে গিয়েছে—শান্ত-গম্ভীর মুহূর্ত। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে অন্তরের নির্মল জ্ঞানদীপ্তি যেন ফুটে বেরোচ্ছে। স্বভাবধীর তিনি যেন আজ আরো একটু বেশি ভাবস্থ। জনৈক ভক্তকর্তৃক প্রাণায়াম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে মহারাজ ধীরে ধীরে বললেন, "প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মনঃসংযম করা। বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে lower plane (নিম্নতর ভূমি) থেকে higher plane-এ (উচ্চতর ভূমিতে) তোলার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, মনকে সর্বক্ষণ watch (লক্ষ) করা। প্রাণায়াম করতে হলে উপযুক্ত গুরু চাই, আহারাদির নিয়ম চাই, মনকে পবিত্র করা চাই। artificially (কৃত্রিম উপায়ে) বায়ুকে control (রোধ) করে central channel কিংবা throughout the body channel-এ চালানো বড় কঠিন কাজ; খুব সাবধানে করতে হয়। তা না হলে হিতে বিপরীত হয়—হয়তো বা মাথা বিগড়ে গেল। আমি কিছুদিন প্রাণায়াম করেছিলাম—যেন মুহূর্তের মধ্যে এক ঘণ্টা কেটে যেত; ইচ্ছা করলে দু-তিন ঘণ্টা একটানা বসতে পারতাম—তার বেশি করলে শরীর টনটন করত। আমার মনে হয়, প্রাণায়ামে যে-কাজ হয়, মনঃসংযমেও সেই কাজ হয়। মন শান্তভাব ধারণ করে, আর উচ্চভূমিতেও বিচরণ করে। অথচ এ খুব safe (নিরাপদ) উপায়—slow but sure (ধীর অথচ নিশ্চিত)।"

হ—বাবু ঃ mental training (মনঃসংযম) কীরকম মহারাজ?

মহারাজ ঃ মনের দ্বারাই মনকে trained (বশীভূত) করা। higher mind (মনের উচ্চতর বৃত্তি) দ্বারা lower mind-কে (নিম্নতর বৃত্তিকে) সংযত করতে হয়। মনে কোনো বাসনার উদয় হলে তখনই তা কাজে পরিণত না করে সঙ্গে সঙ্গে বিচার-দ্বারা ঐ বাসনাকে দমন করে দিতে হয় অথবা কোনো বিষয়ের দিকে মন ছুটে চলেছে, তখনই সেই বিপথগামী মনকে সেদিক থেকে ফিরিয়ে এনে কোনো সৎ-বিষয়ে বা সৎ-বস্তুতে লাগাতে হয়। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ ধৈর্য ধরে এভাবে মনকে সংযত করতে করতে মনের শক্তি বাড়ে, আর মন পবিত্র হয়।

"আমি আজ as usual (যথারীতি) দুপুরে শুয়ে আছি, দেখছি—শরীর থেকে মন আলাদা হয়ে গিয়ে ভারি আনন্দ উপভোগ করছে, আর যেন বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে identified (একীভূত) করে ফেলেছে। খুব পবিত্র মন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে। মন শুদ্ধ হলে দেখতে পায়, একদিকে জড়শরীর আরেক দিকে spirit—আত্মা। সেই কারণে মনকে বলে চিজ্জড়গ্রন্থি।

"মন্ত্র আর কী? mental training (মনের শোধন)। ঠাকুর বলতেন, 'মন তোর।' বলে যে, দীক্ষা না হলে দেহ অপবিত্র থাকে—খুব খাঁটি কথা, খুব ঠিক কথা। তবে সাধারণত লোকে যেভাবে মনে করে, ঠিক সেভাবে নয়। সিদ্ধমন্ত্রের কত শক্তি! মনকে lower plane (নিম্নতর স্তর) থেকে higher plane-এ (উচ্চতর স্তরে) তোলে—পবিত্র করে দেয়, আর এই জীবন-মরণের যাতায়াত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। সচরাচর মন নিচু plane-এই (স্তরেই) থাকে, আর ভাল-মন্দ সংস্কার অনুযায়ী এই পৃথিবীতে যাতায়াত করে, তাই বলে—মন্ত্র নিয়ে মনের শোধন না করলে মন অপবিত্র থাকে। পবিত্র মন হলে মানুষ বেশ আনন্দে থাকে, আর চমৎকার সব দর্শনাদি হয়।"

অতঃপর একটি ভক্ত স্বপ্নে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানিকে দর্শন ও তাঁর শুভাশীর্বাদ লাভের কথা বিবৃত করায় মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, এই স্বপ্নটি চমৎকার। এতে বোধ হচ্ছে, তোমার মন gross (স্থূলবিষয়) থেকে একটু আলাদা হতে শিখেছে। যা স্বপ্নে হয়েছে সেটি জেগে জেগেও হয়, তবে তখন physical-টা (দেহভাবটা) বড় প্রবল থাকে বলে সাধারণত হয় না। gross-এর (স্থূলবিষয়ের) প্রাবল্য যত কমে আসবে, ততই ঐসব দর্শনাদি জাগ্রদবস্থায়ও দেখবে, আবার যেগুলো ভেতরে ভেতরে দেখতে পাবে সেগুলো বাইরেও projected (প্রকাশিত) হতে পারে। শিব, দুর্গা ইত্যাদি জাগ্রদবস্থায়ও দেখতে পাওয়া যায়।"

কয়েক জন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর প্রভৃতি স্থানাদি সম্প্রতি দর্শন করে এসেছেন। তাঁদের নিকট মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদির বিবরণ শুনে মহারাজ খুবই আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "শরৎ মহারাজ একটা কীর্তি রেখে যাচ্ছেন। স্বামীজীর ও মায়ের মন্দিরের জোগাড়যন্ত্র সব উনিই তো করেছেন। খুব অদ্ভুত কর্মী।"

হ—বাবু ঃ এখন শরৎ মহারাজ নাকি বলছেন যে, retired (অবসরপ্রাপ্ত) ভাবে থাকবেন। জয়রামবাটীতে মাকে প্রতিষ্ঠা করার সময় যেন ভাবস্থ ছিলেন। প্রতিষ্ঠাদির পরে বোধ হলো, যেন একটা মস্ত ভার তাঁর মাথা থেকে নেমে গেল।

মহারাজ ঃ হ্যাঁ, মায়ের কাজে খুব উৎসাহ। উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ী' করতে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাছাড়া এতবড় মঠ-মিশনের কাজ কতদিন ধরে চালাচ্ছেন।

অন্য একসময়ে 'জন্ম-মৃত্যু' সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ বলেছিলেন, "কারুর মৃত্যু হলো বলেই এ বোঝায় না যে, তার একটা ভয়ানক অবস্থা হলো। আমাদের বিবেচনায় মৃত্যুটা সবসময়েই একটা মহা অনিষ্টকর ব্যাপার, কিন্তু তা না-ও হতে পারে। কেউ হয়তো মৃত্যুর পরে কর্মফলানুযায়ী ভাল জন্ম নিয়ে ভাল কাজে লেগে গেল। আর যদি এই মৃত্যু বাস্তবিকই এমন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহলে আমরা বুদ্ধিমান হয়ে এমন উপায় কেন অবলম্বন করি না, যাতে এই জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যেতে পারি? তা তো করব না—নিজেকে এই matter-এর (জড় পদার্থের) সঙ্গে identify (তাদাত্ম্যবোধ) করে ছোট করে রাখব, আর বলব বেশ আছি। গাধাকে আমরা বলে থাকি গাধা, কিন্তু আমরা যে কত বড় গাধা—গাধার গাধা তা কে বলবে! তাদের তো বুদ্ধি নেই, আমাদের বুদ্ধি থেকেও কী অবস্থা! এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বৃথা চলে যাচ্ছে!"

* * *

১৪ ডিসেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার। এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বসে আছেন। অনেক ভক্ত সমাগত। পরদিন মহারাজ পাঞ্জাব মেলে বেলুড় মঠে রওনা হবেন, সব বন্দোবস্ত প্রায় ঠিক। মহারাজ বলছেন, "আমি আগে থেকে সব প্ল্যান ভেবে ঠিক করি, তবে যাওয়ার সময়ে অবস্থা বুঝে কতক প্ল্যান modify (অদলবদল) করি। হয়তো সকাল ৯টা থেকেই তৈরি হয়ে বসে থাকব। হ্যাঁ হে, ঐরকমই আমার অভ্যাস।" পরে কথাপ্রসঙ্গে fourth dimension সম্বন্ধে বললেন, "ও মনের অতীত জিনিস,

ওকে কী এ মন দিয়ে জানা যায়? লোকে বলে ঈশ্বরকে স্মরণ করো। বোঝে না যে তিনি মনের অতীত—তাঁকে কী করে স্মরণ করা যায়? Part cannot comprehend the whole, the finite cannot comprehend the infinite. (অংশ পূর্ণের ধারণা করতে পারে না, সসীম অসীমকে ধরতে পারে না।) finite mind (সসীম মন) বোঝে যে, তার যতটুকু গণ্ডি সে-গণ্ডির বাইরে ঈশ্বর—যতটা তার গণ্ডির ভেতর ততটা বোঝা যায় এবং ঈশ্বরের বিষয় ততটুকু জেনেই মন তৃপ্ত হয়।"

ভক্তগণ স্তব্ধ হয়ে মহারাজের উপদেশ শুনছিলেন। তিনি একটু তামাশা করে বললেন, "তোমরা সকলেই চুপ করে রইলে, এতে কী আর কথা চলে? চুপের উত্তর চুপ।"

ন—বাবু ঃ কথার উত্তরে যদি কথা হয়, তাহলে তো মহারাজ মহা গোলমাল হবে।

মহারাজ ঃ হ্যাঁ, তা-ই তো জগতে চলেছে—কেবল কথার কাটাকাটি আর গোলমাল।

আকাশে নক্ষত্র উঠেছে—তাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "ওরা আমার বন্ধু—কেমন ঝিকমিক করছে। নক্ষত্রমণ্ডল দেখলে ধ্যান হয়, ধ্যানের জন্য চেষ্টা করতে হয় না।"

মহারাজ জনৈক ভক্তকে একটা গল্প বলতে বললেন, কিন্তু সে-ভক্ত মহারাজকেই গল্প বলতে অনুরোধ করায় তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "শেষকালে আমি ঠাকুমা হলাম নাকি?"

হ—বাবু ঃ আমরা আপনার কথার মূল্য কী বুঝব মহারাজ? আমাদের কাছে তো সব গল্পই বটে।

মহারাজ ঃ হ্যাঁ হে, সবই গল্প—বাস্তবিকই গল্প। জগৎটাকে যদি গল্প বলে মনে করে নেওয়া যেত, তাহলে কত আনন্দ! আর যেই এটাকে real (বাস্তব) মনে করলে, অমনি কষ্ট। একজন গ্রিক দার্শনিক ছেলেদের বলতেন, 'World is a dream.' (জগৎটা একটা স্বপ্ন।) তাঁর ঐ মত ছিল। তখন দার্শনিকরা ছেলেদের সঙ্গে মিশতেন, কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে এই বালকরাই পরে মানুষ হবে; এদের ভাল আদর্শে গড়ে তুলতে পারলে দেশের ও দশের কাজ হবে। ছেলেরা চিরকালই দুষ্টু; তারা একদিন দড়ি এনে সেই দার্শনিকের পায়ে আচ্ছা করে বেঁধে হিড়হিড় করে রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল। দার্শনিকের শরীর ক্ষতবিক্ষত—

তখন ছেলেরা জিজ্ঞাসা করছে, 'Well, is this world a dream?' (আচ্ছা, এ জগৎ-টা কি স্বপ্ন?) দার্শনিক বললেন, 'Yes, this world is a dream, but a very painful dream.' (হ্যাঁ, এই জগৎ-টা একটা স্বপ্ন, তবে খুব কষ্টদায়ক স্বপ্ন।) ছেলেদের ধারণা ছিল—স্বপ্ন মাত্রই সুখস্বপ্ন; তা নয়, স্বপ্ন সুখের আবার দুঃখেরও হয়।

জনৈক ভক্ত সেই দার্শনিকের উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করায় মহারাজ বললেন, "তুমিও যেমন! একজন কেউ গল্পটা বানিয়েও তো লিখে থাকতে পারে। যেমন কেউ কেউ বলে—রামায়ণ কি সত্য? কোনো বুদ্ধিমান লোক লিখেছিলেন আর সকলে সত্য বলে মেনে চলেছে। কিন্তু এ-বিশ্বাসেরও ফল আছে, যদি রামচন্দ্রের সহিষ্ণুতা, বল, বীর্য, ত্যাগ, সত্যানুরাগ ইত্যাদি সদ্‌গুণ আমাদের চরিত্রে ফলাতে পারি। আমরা নিজের নিজের sphere-এ (ক্ষেত্রে) যদি রামচন্দ্র হতে পারি, তবেই ঐ বিশ্বাসের যথার্থ সার্থকতা।

"ঠাকুর একদিন স্বামীজীকে বলেছিলেন, 'দেখ, একটা অমৃতের সরোবর, আর তুই যেন ঐ সরোবরের জল খেতে গেছিস। এখন তুই কিনারায় বসে জল খাবি, না তাতে ডুব মেরে জল খাবি?' স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে জল খাব, ডুব মেরে খেতে গেলে হয়তো ডুবে মরে যাব।' তা শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'সে কিরে? এ যে অমৃতের সরোবর, এতে ডুবলে যে অমর হয়ে যায়।' বাস্তবিকই, সেই অমৃতের সরোবরে ডুব দিতে হবে। God is the fountain of life. (ভগবানই জীবনের উৎসস্বরূপ।) যাঁরা বড় হয়েছেন, ভগবানলাভ করেছেন, সকলেই ঐ fountain-এ (উৎসে) merge করেছেন। merge না করতে পারলে বড় হওয়া যায় না। মহম্মদের জীবনীতে আছে—তাঁর স্ত্রী আছেন, সকলেই আছেন। তিনি ঐসকলে আসক্ত না হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছেন, ঈশ্বরের উপাসনা করছেন। গভীর রাতে উঠে ধ্যান করবে। আমাদের পাঁচটা জিনিসে ভুলিয়ে রেখেছে, সেজন্য রাতে ডাকা। এমনভাবে তাঁকে ডাকতে হবে যেন call (আহ্বান) এসেছে—আর সাক্ষাৎকার হচ্ছে। আমাদের না এদিক, না ওদিক—ষাঁড়ের গোবর হয়ে থাকা ভাল নয়!

"ঠাকুর স্বামীজীকে কত ভালবাসতেন, অথচ এক-একসময় স্বামীজী প্রমুখ সামনে বসে আছেন, ঠাকুর কিন্তু ঈশ্বরের ভাবে এমনই তন্ময় হয়েছেন—মন এত উঁচুতে আছে যে, সকলকে mist-এর (কুয়াশার) মতো দেখছেন—বলছেন, 'তোরা কে?'"

(৩)

১৪ জানুয়ারি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। মুঠিগঞ্জ এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ন—বাবু, রাজা—বাবু, হ—বাবু প্রমুখ কয়েক জন ভক্তসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বসে আছেন এবং নানাপ্রকার প্রসঙ্গাদি করছেন। এমনসময় মৃ—বাবু একটি ছেলেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। ছেলেটি আই.সি.এস. পরীক্ষা দিতে এলাহাবাদে এসেছে। নানা কথাবার্তার পরে ছেলেটি যাতে পরীক্ষায় সফলকাম হয় সেজন্য মহারাজের শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা করলে মহারাজ বললেন, "আমি তো সকলকেই আশীর্বাদ করি কিন্তু আমার আশীর্বাদের জোর থাকলে আমার কী আর এমন অবস্থা হতো, কত লোকজন এসে পড়ত!"—এই বলে খুব হাসতে লাগলেন। ছেলেটি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, শেষটায় মহারাজ তাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। ছেলেটি বললে যে, আই.সি.এস. হতে পারলে দেশে যাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, সেজন্য সে খুবই চেষ্টা করবে। আশীর্বাদ নিয়ে মৃ—বাবু ও ছেলেটি চলে যাওয়ার পরে মহারাজ বললেন, "service (চাকরি) অত্যন্ত খারাপ জিনিস। কেউ যেন dependant (অপরের অধীন) হয়ে না থাকে। এমন সোনার দেশ, হায় হায়! তার আজ কী অবস্থা! চাকরি করে করেই সব ম'লো। আর সকলেই তো education education (শিক্ষা শিক্ষা) করে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু আজকাল যে ধারাতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে কাজের কাজ কী হয়? বরং তাতে mind অত্যন্ত enslaved (দাসভাবাপন্ন) হয়ে যায়। তাছাড়া যাঁরা genius (প্রতিভাবান), তাঁরা কী এই education-এর জন্য অপেক্ষা করেন? তাঁরা এসব শিক্ষার কোনো তোয়াক্কাই করেন না। দেখো না, আকবর illiterate (নিরক্ষর) ছিলেন, রণজিৎ সিং-ও তা-ই, শিবাজীরও ঐ অবস্থা। আমাদের ঠাকুরকেই দেখো না, তিনি তেমন কিছু লেখাপড়া জানতেন না। যদি কোনো ছেলে লেখাপড়া শিখেছে শুনতেন, অমনি গম্ভীর হয়ে যেতেন। পরীক্ষায় পাস করাকে বলতেন—পাস নয়তো যেন পাশ। আর যদি শুনতেন যে, কোনো ছেলে লেখাপড়া করেনি, তাহলে যেন আশ্বস্ত হয়ে বলতেন, এর মনে এখনো বাজে জিনিসের ছাপ পড়েনি—ভগবদ্বিষয় নিলেও নিতে পারে। ঠিকই তো, আজকালকার পড়াশোনায় আছেটা কী? কতকগুলি বই মুখস্থ করা ছাড়া, আর কিছু তো নয়? তাতে অবশ্য বুদ্ধি কিছুটা মার্জিত হয়, কিন্তু সেই মার্জিত বুদ্ধিকে ভালর দিকে লাগায় তবে তো? ঠাকুরের কাছে আমাদের বইপড়া-শিক্ষা অতি নিচু শিক্ষা বোধ হতো। অদ্ভুত এক লোক জন্মেছিলেন। ধন্য এই দেশ যে এমন মানুষকে বুকে ধারণ করেছে। আর আমি

personally-ও (ব্যক্তিগতভাবেও) খুবই fortunate (সৌভাগ্যবান) যে, তাঁর দর্শন লাভ করেছি।

"তাঁকে দেখলেই বোধ হতো, যেন ভেতরকার পবিত্র ভাবসমূহের living embodiment (জীবন্ত প্রতিমূর্তি)। লোকে বলতে পারে যে তাঁর follower (চেলা) বলে আমি বলছি, কিন্তু সত্যি বলছি—এমনটি আর দেখলুম না; কী childlike simplicity (বালকের ন্যায় সরলতা), কী ত্যাগ, কী পবিত্রতা! সদাসর্বদাই ভাবস্থ—nerve current-এর (স্নায়ুপ্রবাহের) গতি সদাই ওপর দিকে।

"অসুখের সময় দেখেছি, একজন হয়তো বললেন—মশাই, এই ওষুধটা ব্যবহার করুন, আপনার অসুখ সেরে যাবে—অমনি রামলালদাকে ডেকে বললেন, 'ইনি ঐ ওষুধটা ব্যবহার করতে বলছেন, করে দিস তো, সেরে যাবে।' বালকের মতো বিশ্বাস করতেও যেমন, আবার অবিশ্বাস করতেও তেমন। ওষুধ তৈরি করা হলো, কিন্তু ব্যবহার করেও অসুখ সারল না, অমনি লোকটির সঙ্গে দেখা হলে বললেন, 'কইগো, তোমার ওষুধে তো অসুখ সারল না? তোমার কথা আর বিশ্বাস করছিনে।' তাঁর সঙ্গে সেজন্য কথা কওয়া মুশকিল—বড় সাবধানে কথা কইতে হতো। তাঁকে আমরা কে-ই বা কতটুকু বুঝতে পেরেছি। তাঁকে দেখলে মনে হতো, যেন তিনি জগতের লোকদের দেখে অবাক হয়ে ভাবছেন—এরা কী ভুল নিয়েই না পড়ে আছে! তিনি যেন আশ্চর্য বোধ করতেন—এমনও হয় যে, লোকে শ্রীভগবানকে ছেড়ে—সেই অনন্ত সুখ ছেড়ে থাকতে পারে!"

রাত হওয়ায় মহারাজ সমবেত ভক্তদের উঠতে বললেন। ভক্তেরা সকলে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা ভাল থাকো, সুখে থাকো।" পরে আবার নিজেই বলছেন, "আমার 'ভাল থাকো, সুখে থাকো' বলার অর্থ, আর ঠাকুরের 'ভাল থাকো, সুখে থাকো' বলার অর্থের ঢের তফাত। তাঁর 'ভাল থাকো' কথায় বুঝবে যে সদ্‌বুদ্ধি হোক, ঈশ্বরে মন হোক, ভক্তি-বিশ্বাস লাভ হোক, ঈশ্বরদর্শন হোক ইত্যাদি।" ন—বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, শরীর ভাল হোক ও গাড়ি-ঘোড়া হোক—এই বলে কি আপনি আমাদের আশীর্বাদ করেন?"

মহারাজ ঃ হ্যাঁ, তা-ই করি।

ন—বাবু ঃ আমাদের তো তা বিশ্বাস হয় না।

মহারাজ ঃ তুমি তো বড় পণ্ডিত দেখছি!

একথা বলেই বালকের ন্যায় হাসতে লাগলেন।

অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলেছিলেন, "'পরমহংস' কথার অর্থ the sun of illumination—knowledge; the divine mind। ঠিক ঠিক পরমহংসও যা ভগবানও তা।

"ঠাকুরের মুখে কেবলমাত্র একই কথা শোনা যেত—জ্ঞান হোক, ভক্তি হোক। টাকাকড়ি হোক, সিদ্ধাই হোক ইত্যাদি বলতে কখনো কেউ শোনেনি। এসব তিনি অতি হেয় জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন, 'কোনো লোক এলে বোধ হতো, যেন কাচের বাক্স এসেছে—তার ভেতরের সব পরিষ্কার দেখতে পেতাম।' এরকম দেখা তাঁর পক্ষে কিছুই নয়—খুবই সম্ভব। দেখো না, মানুষের কার্যকলাপের centre (কেন্দ্র) হচ্ছে mind, অন্য সব ইন্দ্রিয় তো servant class (ভৃত্যস্থানীয়); দেখাশোনা, বোঝা ইত্যাদি সব মনের দ্বারাই হয়। যার মন যত পরিষ্কার, সে তত ভাল বোঝে। যার মন যত শুদ্ধ, সে তত ঠিক ঠিক বুঝতে পারে—দেখতে পাওয়া যায়। এমনকী, লোকের মুখ দেখেও মনের ভেতরকার ভাব অনেকটা ধরা যায়। যার মন যত শুদ্ধ হবে, তার ইন্দ্রিয়গুলি তত ভাল receiver (গ্রাহক) হবে। wireless message (বেতার বার্তা) একস্থানে পাঠানো হলো, ঐ message (বার্তা) atmosphere-এর (বায়ুমণ্ডলের) চারিদিকে vibrate করছে। যেখানে receiver (গ্রাহক) আছে, সেখানে ঐ স্পন্দন ধরতে পারছে; তেমনি একটি মনের দ্বারা কোনো চিন্তা হলো, অমনি একটা স্পন্দন সৃষ্ট হলো—যেমন যেমন গ্রাহক হবে, তেমন তেমন সেটা ধরতে ও বুঝতে পারবে।

"মহাপুরুষদের বাক্যে খুব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করবে। তাঁরা super conscious ও conscious state-এর (অতি চেতন এবং চেতন অবস্থার) junction (মিলনভূমি) থেকে বলেন যে, জীবের কল্যাণের জন্য হাজার হাজার জন্ম নিতেও প্রস্তুত আছেন। ঐ ভূমির ওপরে গেলে এসব ভাব আর থাকে না।

"স্বামী বিবেকানন্দকে—তখন তিনি সবেমাত্র সংসার ছেড়েছেন—একদিন একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'মহাশয়ের কি জ্ঞান লাভ হয়েছে?' তদুত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন, 'না।' 'তবে কেন ঘর ছেড়েছেন?'—প্রশ্ন করায় স্বামীজী জবাব দিয়েছিলেন, 'কারণ, এটা বেশ বুঝেছি যে, সংসার কাকবিষ্ঠার তুল্য, গ্রহণ করলেই মৃত্যু—তাই ছেড়েছি।'"

হ—বাবু ঃ মহারাজ, কোনো ভাল বা উচ্চ অবলম্বন না পেলে কি মানুষ একটা lower (নিম্নতর) অবলম্বন—যা নিয়ে সে আছে—তা ছাড়তে পারে?

মহারাজজী ঃ হ্যাঁ, খুব পারে—সংস্কারের প্রভাবে। তার ছেড়ে দিতে ভাল লাগে, তাই ছেড়ে দেয়। ignorance-এই (অজ্ঞানেই) মানুষের অনেক বুদ্ধি খাটাবার দরকার, তখনই অনেক যুক্তি-তর্ক ও দার্শনিক বিচার বেরোয়। knowledge (জ্ঞান) হলে অত-শত দরকার নেই। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'সংসার খারাপ—বন্ধনের কারণ—ত্যাগ করো।' যেটা ভাল নয় বুঝেছি, তা করব না—ব্যস, হয়ে গেল। এতে আর বিচার কী?

(৪)

২৩ মে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাবেলায় পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সি—বাবু, নরসিবাবু, যা—বাবু, ন—বাবু, কা—বাবু প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে বসে আছেন। বেশ গরম পড়েছে, সেজন্য মহারাজ বাইরে বসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে যিশুখ্রিস্টের মৃতকে বাঁচানোর সম্বন্ধে বললেন, "দেখো, আজ দুপুরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, বাইবেলে যিশুর raising of the dead (মৃতকে বাঁচানো)-রূপ অলৌকিক ক্ষমতার কথা আছে। ব্যাপারটি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ আমাদের সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যানে রয়েছে। যিশু মৃতকে বাঁচানোর জন্য কী process adopt (উপায় অবলম্বন) করতেন তার details (বিস্তৃত বিবরণ) বাইবেলে নেই। যিশু মৃতব্যক্তির কাছে গিয়ে বলতেন, get up (ওঠো), অমনি মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হয়ে যেত, আর মৃতব্যক্তি বেঁচে উঠত। পরে এর esoteric meaning (গূঢ় অর্থ) দেওয়া হয়েছে যে, যিশু নিজের সূক্ষ্মশরীর দিয়ে মৃতের সূক্ষ্মশরীরকে ধরতেন এবং তার farther (দূরতর) গতি রোধ করে তাকে ফেরত নিয়ে এসে, যে-দেহ ছেড়ে গিয়েছিল তাতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। সাবিত্রী-উপাখ্যানে কেমন details-এ (বিস্তৃতভাবে) মৃতকে বাঁচানোর process (উপায়) পাওয়া যায়। একমাত্র purity and chastity-র (পবিত্রতা ও সতীত্বের) কত জোর দেখেছ—মৃতকে বাঁচিয়ে দিলে!"

ন—বাবু ঃ মহারাজ, যিশুখ্রিস্ট যেমন নিজের ঐ শক্তির বিষয়ে conscious (সচেতন) ছিলেন, আর যাকে ইচ্ছা বাঁচাতে পারতেন, সাবিত্রীও কি তা-ই পারতেন?

মহারাজ ঃ হ্যাঁ, তিনি যে নিজের স্বামীকে বাঁচাতে পারবেন, সেবিষয়ে খুবই conscious ছিলেন—তবে অন্যকে বাঁচাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল কি না বলতে পারিনে। যিশুখ্রিস্ট যেসব যৌগিক ক্রিয়া অবলম্বন করে মৃতকে বাঁচাতেন, সেসব

ভারতবর্ষে এসে শিখেছিলেন। যে কয়েক বছর তিনি অজ্ঞাতভাবে কাটিয়েছিলেন, সে-সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

"সাবিত্রীর গল্প থেকে আর একটা কথা ভাবছিলাম—ওটা যেন মন্ত্র দেওয়ার ব্যাপার! সত্যবানের পুনর্জীবন লাভ করা কিনা মন্ত্রের দ্বারা মৃত শরীরকে সঞ্জীবিত করা। সাবিত্রীকে presiding deity of the Sun (সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) অর্থাৎ গায়ত্রী দেবী বলে।

"মন্ত্রের দ্বারা এ শরীরকে জাগানো উচিত। আহা! দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম দিনে দিনে তো ক্ষয় হয়ে আসছে, ভগবানকে দিনে অন্তত তিন বার স্মরণ করা দরকার। তাঁর কাছে এই দুর্লভ শরীরের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত—যে-কাজেই থাকি না কেন। হে ঠাকুর, তোমার দাস আমি—এটি মনে রাখা দরকার।

"মানুষের দু-বার ব্রহ্মজ্ঞান হয়—প্রথমে জন্মাবার সময়। তখন জীব ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে ভগবানকে ভুলবে না। যেই সে ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি মহামায়া তাকে ঘিরে ফেলেন, আর সে সব ভুলে যায়। এই শরীরটা microcosm (ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড)। যা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তা এই শরীরে আছে। সাধারণত মন নিম্নস্তরে থাকে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ যে এ-শরীরেই আছে, তার খোঁজ নেই।

"সত্য আর পবিত্রতা অবলম্বন করলে মানুষ এই শরীরেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের এবং বাইরের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের relation (সম্বন্ধ) সব বুঝতে পারে। এ-বিশ্বজগৎ, সূর্য-চন্দ্র, রাত্রি-দিন সবই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আমার এই প্রার্থনা—হে ঠাকুর, সত্যে যেন প্রতিষ্ঠিত হই। সত্য আর কী—ব্রহ্মই সত্য, যিনি সৎস্বরূপ তিনিই সত্য। যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা সত্যকে লাভ করেছেন তাঁদের অবিদিত কিছুই থাকে না। ঠাকুরের কাছে একটি লোক দেখা করতে গিয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কবে আসবে?' সে লোকটি বললে, 'পরশু বেলা তিনটে নাগাদ আবার আসব।' যে-দিন ঐ লোকটির আসবার কথা, সে-দিন ঠিক ঐ-সময় ঠাকুর খুব ব্যস্ত হয়ে ক্রমাগত ঘর-বার করতে লাগলেন। তারপর যখন দেখলেন, সে লোকটি এল না, তখন তক্তপোশের ওপর বসে পড়লেন, আর বললেন, 'যা আর এল না—শালার কথার ঠিক নেই।' দু-তিন দিন পরে লোকটি বেলা তিনটের সময় এসে উপস্থিত। ঠাকুর তাকে দেখে বললেন, 'কই, সে-দিন যে বলে গেলে আসব, তা এলে না তো? বউ কি আসতে দেয়নি? কাছার কাপড় টেনে ধরে ছিল?' ঠাকুরের

ঐকথা শুনে লোকটি তো একেবারে অবাক! বাস্তবিক ঘটনা ঐরূপই হয়েছিল। লোকটির যে-দিন আসবার কথা ছিল, সে-দিন বেরোচ্ছে, এমনসময় বউ এসে কাছার কাপড় ধরে বললে, 'আজ আর কোথাও যেতে দেব না—আর একদিন যেয়ো।' যেরূপ হাবভাব করে বউ বলেছিল, ঠিক সেরকম অনুকরণ করে ঠাকুর দেখিয়েছিলেন—যেন সেই ছবি তৎক্ষণাৎ তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

"সত্য ভয়ানক জিনিস। মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে বসাও মহামুশকিল। মনের ব্যাপার তাঁরা সব টের পান—কে কীরকম লোক, মুখ-চোখে সব দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের কাছে একটুও লুকোবার জো নেই।

"সত্যই কলির তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে আর সব হয়ে যায়। ঠাকুরের সত্যে কী ভয়ানক আঁট ছিল!

"যদি অন্যায় করে স্বীকার করে বল যে আর করব না, তাহলে দোষ কেটে যায়। তবে দু-কানকাটার মতো নয়—তারা অন্যায় করার পর তা বলে বেড়িয়ে বাহাদুরি দেখাতে চায়। নিজ অপরাধ কি স্বীকার করা যায়? এ ভারি শক্ত কাজ। মন শুদ্ধ, পবিত্র না হলে মানুষ তা পারে না। সত্যকে ধরে থাকলে মন পবিত্র হয়ে যায়—তার জ্ঞান হয়ে যায়।"

ডাক্তারবাবু ঃ আজ্ঞা, সত্য অবলম্বন করলে মানুষ পবিত্র হয়ে যায়, সেবিষয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। একটা চোর এক মহাপুরুষের কাছে মন্ত্র নিতে গেল। মহাপুরুষ তাকে খুব আদরযত্ন করে বললেন, 'আজ রাতে গিয়ে নিজের মনকে বেশ করে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমার কথা রাখতে পারবে কি না। যদি আমার কথা রাখতে পার তাহলেই মন্ত্র দেব।'

মহারাজ ঃ দেখুন, এখানে আমি একটা কথা বলি। গুরু প্রথমেই সত্যবদ্ধ করিয়ে নিয়ে বললেন—'আমার কথা ঠিক ঠিক প্রতিপালন করতে পারবে তো?' আচ্ছা, এরপর কী হলো বলুন।

ডাক্তারবাবু ঃ চোরটি ভাবলে, গুরুদেব মন্ত্র দেবেন আর আমি সেটা জপ করব, এ আর এমন বড় কথা কী? যখন চুরি করার তখন চুরি করব। এই ভেবে সে তার পরদিন গিয়ে বলল, 'ঠাকুর, আমি ঠিক করেছি যে মন্ত্র নেব, আর আপনি যা বলবেন তা শুনব।' গুরুদেব বললেন, 'বেশ কথা! আমি তোমায় মন্ত্র দেব—তুমি কিছুতেই মিছে কথা বোলো না—যাও, আজ এই পর্যন্ত।' চোরটা তখন চলে গেল। দিনের বেলায় কাজকর্ম করে রাতে শুয়েছে, কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না—ক্রমাগত ভাবছে, কখন চুরি করতে যাবে। শেষে রাত যখন

অনেক হয়েছে, তখন ভাবলে—'যাই এবার চুরি করে আসি। এখন আর কারো সঙ্গে দেখা হবে না।' এই ভেবে সে বেরল, কিন্তু পথে একটা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হে, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?' তখন সে কী আর বলে—এদিকে গুরুদেবের আদেশ—মিছে বলতে পারবে না—কাজেই বললে, 'বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' এই বলে সে বাড়ি ফিরে গেল। এরকম সে যতবার রাতে চুরি করতে বেরল, ততবারই ঐরকমভাবে তাকে ফিরে আসতে হলো। সে গুরুদেবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মিছে কথা বলবে না—আর তো উপায় নেই। ফলে সে কিছুদিনের মধ্যেই এক সত্যকে আশ্রয় করে তার সেই দৃঢ়সংস্কারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

মহারাজ সব শুনে বললেন, "আহা! বেঁচে গেল। দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম! ঠাকুর 'চৈতন্য হোক—চৈতন্য হোক—সকলের চৈতন্য হোক'—একথা প্রায়ই বলতেন।"

ডাক্তারবাবু ঃ মহারাজ, পরমহংসদেব কি মন্ত্র দিতেন?

মহারাজ ঃ তিনি তিনটি কথায় বড় বিরক্ত হতেন—গুরু, কর্তা আর বাবা। সাধারণে মন্ত্র দেওয়া বলতে যা বোঝে, তিনি সেরকমভাবে কাউকে মন্ত্র দিতেন না। কিন্তু তিনি এসেছিলেন জীবের কল্যাণের জন্য—জীবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। তিনি বহু লোককে কৃপা করেছেন—কথাবার্তার ভেতর দিয়ে, সামান্য স্পর্শমাত্রে বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইষ্টদর্শন করিয়ে দিতেন—ঈশ্বর-উপলব্ধি করিয়ে দিতেন। মন্ত্র দেওয়ার আড়ম্বর তাঁর কিছুই ছিল না।

(৫)

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে আছেন; আনন্দময় মূর্তি। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বললেন, "আজ তিন-চার দিন হলো, বেশ একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম; যেন বেড়াতে বেড়াতে একটি শিবালয়ের সামনে এসেছি। দেখি যে, দরজার কাছে ঠাকুর ফুলের সাজি ও অন্যান্য পূজোপকরণ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তো ঠাকুরকে দেখে অবাক! আর তখন এ-ও মনে হলো, অনেক দিন পরে আমায় দেখে ঠাকুর কি চিনতে পারবেন? এগিয়ে কাছে যেতেই ঠাকুর হাসিমুখে সস্নেহে বললেন, 'তুই যে এখানে?' তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে খুব আশীর্বাদ করলেন। তারপরই ঘুম ভেঙে গেল।

"আমার যখন বয়স আঠারো-উনিশ বছর তখন আমি college boy (কলেজের

ছাত্র)। একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার?' ঠাকুর বললেন, 'ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আবার তারও পার।' আমি বললাম, 'ঈশ্বর যদি সাকার হন তাহলে এই যে তক্তপোশ রয়েছে, এটিও কি ঈশ্বর?' ঠাকুর তখন খুব জোরের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, এই তক্তপোশ ঈশ্বর, এই ঘটি ঈশ্বর, এই বাটি ঈশ্বর, এই দেয়াল ঈশ্বর—যা-কিছু দেখছিস সবই ঈশ্বর। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি এমনভাবে কথাগুলি বলছিলেন যে, আমি তখন যেন mesmerized (সম্মোহিত) হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভেতরে যেন illumination (জ্ঞানালোক) দেখা দিল, ব্রহ্মজ্যোতি! আমি মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বললাম, 'ঈশ্বর যদি সবই, তবে খাওয়ার সময় একে ছোঁব না, ওকে ছোঁব না—এসব বিচার কেন হয়?' তখন ঠাকুর বললেন, 'দেখ, এই ঠাকুরবাড়িতে সাধুরা প্রসাদ খেয়ে যাবার পরে একটা বেশ্যা এসে সকলকার পাতে যা খাবার পড়ে থাকে চটপট করে সেসব এঁটো খেয়ে যায়। সে তো খাবার সম্বন্ধে কোনো বিচারই করে না, তাহলে ঐ বেশ্যার তো ব্রহ্মজ্ঞান খুব হয়েছে বলতে হবে?' আমি তখন বললাম, 'না মশাই, তার যে চরিত্র ভাল নয়, তার ব্রহ্মজ্ঞান হবে কী করে?' ঠাকুর তখন বললেন, 'তাহলে কেবলমাত্র খাবারের বিচারের ওপরই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ নির্ভর করে না, তা ছাড়া অন্য কিছুও চাই।' আমি তো বোকার মতো বসে রইলাম, কী যে বলব কিছুই খুঁজে পেলাম না। অতবড় personality-র (ব্যক্তিত্বের) কাছে আবার ভয়ও করত। যা ইচ্ছা তা-ই করে দিতে পারতেন। সব ক্ষমতাই তাঁর ছিল।"

ন—বাবু বললেন, "ঠাকুরের ছবি দেখলে তাঁর personality খুব বেশি বলে বোধ হয় না, বরং স্বামীজীর ছবি দেখে মনে হয় যে, তাঁর একটা বিশেষ personality আছে।"

মহারাজ বললেন, "ঠাকুর একজন wonderful (অদ্ভুত) লোক! তাঁর ঐ যে ছবি দেখছ, ওটি ষট্‌চক্র-ভেদের মূর্তি। তিনি সব চক্রগুলো ভেদ করে আনন্দেতে ডুবে আছেন। সাধারণ লোক তাঁর ঐ ছবি দেখে কী বুঝবে? আমি ঐ ছবিতে নানা জিনিস দেখতে পাই, আমি তাই বলি। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ প্রমুখ বেশি কিছু বলতেন না—চেপে যেতেন। একবার বহু বছর আগে বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারের দোতলার বারান্দায় বসে ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরকম নানা কথা বলছি, শরৎ মহারাজ ঐ-দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি ঐসব শুনে বললেন, 'তুমি কী-সব বলছ?' আমি তখন চুপ হয়ে গেলাম। পরে যখন শরৎ মহারাজের

লীলাপ্রসঙ্গ পড়ি, তখন দেখলাম যে তিনি আরো কতসব গুহ্য ব্যাপার লিখেছেন। তাই পড়ে ভাবতাম যে, আমি তো আমি—উনি আমার বাবা! ঠাকুর একজন wonderful লোক! জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমনটি আর পাওয়া যায় না। তাঁকে দেখেছি তাই বলছি। তাঁর সর্বশরীরে spiritual current (আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহ) ঠিক বিদ্যুতের মতো সদাই খেলত। লোকদের মাত্র brain centre-এ (মস্তিষ্ককেন্দ্রে) একটু-আধটু ঐ শক্তির current (প্রবাহ) খেলে, আর অমনি কেউ একটা বড় chemist (রাসায়নিক), কি physicist (পদার্থবিজ্ঞানী), কি statesman (রাজনীতিক) হয়ে যাচ্ছেন। আর ঠাকুরের শরীরের সব centre-এ ঐ শক্তি electric current-এর (তড়িৎ প্রবাহের) মতো খেলছে। কী অসীম শক্তির আধার!

"একবার ঠাকুর আমাকে নিজের ফটো দেখিয়ে বললেন, 'দেখ, এর ভেতর আমি আছি—একে ধ্যান করবি।' আমিও স্বীকার করলাম যে ধ্যান করব। এই ছবিতে সব আছে—তোমরাও ধীরে ধীরে দেখবে। ঠাকুর সব দেখাবেন, সব বোঝাবেন। তিনি সব ঠিক করে নেবেন। তাঁর সন্তানদের যা করণীয় তিনি সব করিয়ে নেবেন।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৫তম বর্ষ—১০ম, ১১শ, ১২শ সংখ্যা; ৪৬তম বর্ষ—৭ম, ৮ম, ১০ম, ১২শ সংখ্যা; ৪৭তম বর্ষ—৭ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী অপূর্বানন্দ

৯ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। ন—বাবুর মা পশুপতিনাথ দর্শনে যাওয়ার সময় পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাকে পশুপতিনাথ থেকে মাঝারি রুদ্রাক্ষের মালা, পশুপতিনাথের ছবি ও সেখানকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আনতে বলেছিলেন। সেসব জিনিস এবং নিজের জন্য আনা আর একছড়া মালা নিয়ে ন—বাবু পূজ্যপাদ মহারাজজীর কাছে দিয়ে তাঁকে মালাছড়া শোধন করে দেওয়ার প্রার্থনা জানান। মহারাজজী মালা শোধন করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে ন—বাবুর হাতে দিয়ে বললেন, ''আমি তো ঠাকুরের ও মায়ের নাম জপ করে মালা শোধন করে থাকি। ঠাকুরের ও মায়ের নাম জপ করলেও তাতে স্বামীজী, রাখাল মহারাজ প্রমুখ সকলেই আছেন।'' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ''নবগোপাল ঘোষ মহাশয় 'রামকৃষ্ণ' নাম খুব জোরের সঙ্গে ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে বলতেন, আমার খুবই ভাল লাগত। নীরদ মহারাজের মা-ও ঠাকুরগতপ্রাণ ছিলেন।'' পরে বললেন, ''মায়ের নিজের একটি বিশেষ বড় গুণ ছিল—তিনি স্ত্রীলোক থেকে এবং তাঁদেরকে কুভাবে দেখার হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন—এটি আমি নিজের জীবনে বেশ অনুভব করেছি। তাঁর নামেতে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বুদ্ধি, ধনদৌলত সব আসে। চণ্ডীতে আছে—তিনি স্বর্গ-মুক্তি প্রদায়িনী, সব দিতে পারেন। তিনি প্রসন্না হলেই সব হলো—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে', তিনিই প্রসন্না হয়ে মানুষের মুক্তির জন্য বর প্রদান করেন। ঠাকুরের নামের চাইতে আমি মায়ের নামে বেশি জোর পাই। একবার বলরামবাবুর বাড়িতে স্বামীজী আছেন, শ্রীশ্রীমাও আছেন। সকলে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে, আমি স্বামীজীর কাছে বসে আছি। তিনি মাকে প্রণাম করতে যেতে বললেন। আমি তো গিয়ে মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। স্বামীজী যে আমার পেছন পেছন এসেছিলেন, আমি তা টের পাইনি। আমাকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করতে দেখে তিনি বললেন, 'মাকে কী এভাবে প্রণাম করতে হয়?' বলেই নিজে সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ তা-ই করলুম। মা তো আমার—মায়ের কাছে আমি তো সদাই নত। মাকে আমরা কতটুকুই বা বুঝেছি! যা বুঝেছিলেন একমাত্র স্বামীজী।

"তুমি যখন বেশ free (স্বচ্ছন্দ) বোধ করবে, তখন রাতে একলা মায়ের ও ঠাকুরের নাম জপ করবে। তারপর মালা উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখবে—বেশি নাড়াচাড়া যেন কেউ না করতে পারে। যখন ইচ্ছা জপ করতে পার, বেড়াবার সময়ও জপ করতে পার, তবে গভীর রাতে একলা নিশ্চিন্ত মনে জপ করলে ভাল হয়। বেলুড় মঠে তিন-চার দিন নিরিবিলিতে বাস করলে আর একান্ত মনে জপ করলে super-natural (অতীন্দ্রিয়) অনুভূতি হয়; ও বড় জাগ্রত স্থান। বর্ষার সময় স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়, এই যা। মহাপুরুষ মহারাজ খুব সাবধানে থাকেন। তাঁর শরীর পাঁচ মাস খারাপ হয়—জুন থেকে নভেম্বরের আগে পর্যন্ত। তাঁর এখন বেশ প্রেমভাব—ভালবাসা খুব। সর্বদাই সকলের ভাল হোক, মঙ্গল হোক—এই চিন্তা করেন।"

* * *

২৩ এপ্রিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।

স্বামী গ— আজ কাশী থেকে ব্রহ্মচারী শ—র সঙ্গে এলাহাবাদ মঠে এসে পৌঁছেছেন। স্বামী গ— এলাহাবাদ মঠে প্রথম এসেছিলেন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "বিবেকানন্দ স্বামী ও রাখাল মহারাজ এ দু-জনের মধ্যে কে বড়?" এ প্রশ্নের জবাব কী দেবেন তা ভেবে স্বামী গ— খুবই ফাঁপরে পড়েছিলেন। সেপ্রসঙ্গে মহারাজজী বললেন, "কেন, ওঁরা পরস্পরের complementary (পরিপূরক)। Each is great in his own sphere. (প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড়।) স্বামীজীর ideas consolidate (ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত) করতেন রাখাল মহারাজ। স্বামীজী যেসব উচ্চ আদর্শ প্রচার করেছেন, সেসব রাখাল মহারাজ কাজে পরিণত করে গেছেন। আমি রাখাল মহারাজের protection-এ থাকতাম বলে স্বামীজীর বকুনি খেতে হয়নি। একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলেছিলেন যে, আমাদের downfall-এর (অবনতির) জন্য ঋষিমুনিরাই দায়ী...ইত্যাদি। আমি মনে করেছিলাম যে স্বামীজী ঋষিমুনিদের নিন্দা করছেন, তাই তার প্রতিবাদ করে বললাম, 'আপনি ঋষিমুনিদের নিন্দা করছেন, আপনি কি তাঁদের চাইতেও বড়? আপনি তাঁদের তুলনায় নগণ্য।' এই কথা বলতেই দেখলাম, স্বামীজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি অমনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি তাঁর ভাব দেখে ভয়ে অস্থির। রাখাল মহারাজ সেখানেই বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বললেন, 'পেসন বলে যে আমি কিছুই বুঝি না, আমি নগণ্য।' রাখাল মহারাজ তাতে উত্তর করলেন,

'পেসনের কথা আবার ধর্তব্যের মধ্যে আনে? ও তো ছেলেমানুষ, ও কী বোঝে? ও কী বলতে কী বলেছে।' রাখাল মহারাজ ঐকথা বলতেই স্বামীজী একেবারে বালকের মতো অমনি ঠান্ডা হয়ে গেলেন।

"রাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকেই স্বামীজীর ঝক্কি বেশি সামলাতে হতো, বেশি বকুনিও খেতে হতো। কিন্তু তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কী গভীর ভালবাসাই না ছিল! এখন তো সেরকম বকুনি মঠে আর নেই।

"স্বামীজী মহারাজ একদিন বেড়াতে বেড়াতে আমায় বললেন, 'এই জায়গায় ঠাকুরের মন্দির হবে।' যেখানে এখন ঠাকুরের মন্দির হয়েছে, ঠিক সেই জায়গাতেই দেখিয়েছিলেন। তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমি দেখব তো?' তখন আমি বললাম, 'হ্যাঁ, মহারাজ, আপনি দেখে যাবেন।' তাতে তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওপর থেকে দেখব।'

"স্বামীজীকে একবার আমেরিকায় মিশনারিরা মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্রপূর্বক নিমন্ত্রণ করে সরবত খেতে দিয়েছিল। তারা জেনেছিল, স্বামীজী সরবত খেতে ভালবাসেন। স্বামীজী তাদের কু-অভিসন্ধির কথা কিছুই জানতেন না। সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে সরবত খেতে যাবেন—আর অমনি দেখলেন যে, ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সরবত খেতে বারণ করছেন। তিনি সরবত আর খেলেন না। অমনি করে সেবার রক্ষা পান।"

স্বামী গ— বললেন, "শুনেছি, বাংলার প্রসিদ্ধ লেখক কে— বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ণিয়ায় থাকেন—আগে যখন কমিশারেটে কাজ করতেন, তখন একবার তাঁকে চীনে Boxer rising-এ (বক্সার বিদ্রোহে) যেতে হয়েছিল। সেখানে একরাতে একলা ঘোড়ায় চড়ে বিশেষ জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলে মহাবিপন্ন বোধ করেন। এদিকে ভীষণ ভয় যে, পাছে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে প্রাণ যায়। এরূপ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করবার জন্য খুব কাতরভাবে ঠাকুরকে ডাকতে থাকেন। তখন হঠাৎ-ই দেখেন যে, একজন ব্রাহ্মণ—দাড়ি ও পৈতা আছে, আদুড় গা—তাঁর কাছে এসে বাংলাতে কথা বললেন। তাঁর বিপদের কথা সব শোনার পর তাঁকে অভয় দিয়ে পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেন। খানিক পরে নিজেকে বিপন্মুক্ত দেখে কে—বাবুর মনে হলো, এখানে বাঙালি ব্রাহ্মণ কোথা থেকে এলেন! তখন তিনি বুঝলেন যে, ঠাকুরই তাঁর প্রার্থনা শুনে তাঁকে রক্ষা করেছেন।"

মহারাজজী ধীরভাবে সব শুনে বললেন, "মহাপুরুষদের সব ব্যাপারই

অলৌকিক। স্বামীজী মহারাজও অনেকসময় অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার করতেন। একবার আমি বেলুড় মঠে গঙ্গার পাকা ঘাট তৈরির কাজ তদারক করছি, আর স্বামীজী মহারাজ মঠে ওপরের বারান্দায় বসে সরবত খাচ্ছেন। খুব রোদ, আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল। এমনসময় স্বামীজীর একজন সেবক এসে একটা গ্লাস দিয়ে বললে, 'স্বামীজী আপনার জন্য সরবত পাঠিয়েছেন।' আমি তো ভারি খুশি, কিন্তু চেয়ে দেখি যে গ্লাসের তলায় দু-চার ফোঁটা মাত্র সরবত পড়ে আছে। তা-ই দেখে মনে খুব কষ্ট হলো—এমন সময় স্বামীজী আমার সঙ্গে তামাশা করছেন! যাহোক তিনি যখন পাঠিয়েছেন তখন তাঁর প্রসাদজ্ঞানে ঐ দু-চার ফোঁটা সরবতই মুখে ঢেলে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! ঐ দু-চার ফোঁটা সরবতেই আমার সারা শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল এবং মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করলাম।

''ঘাটের কাজ বন্ধ করে যখন ফিরেছি, তখন স্বামীজী মহারাজ আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি পেসন, সরবত খেয়েছিলে?' আমি বললাম, 'সরবত তো নামমাত্র ছিল, কিন্তু তাতেই আমার বেশ তৃপ্তি হয়েছিল।' স্বামীজী শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন।''

অন্য একদিন কথাপ্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত মহারাজজীকে world-এর evolution (জগতের বিবর্তন) সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কী বলছে—তা বুঝিয়ে দিতে বলায় তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের শাস্ত্রে সবই আছে। প্রাচীন আর্য ঋষিরা ধ্যানবলে সবকিছু উপলব্ধি করে গেছেন। গায়ত্রী-মন্ত্রেও evolution-এর বিষয় জানা যায়। ঠাকুরের ভাব কিন্তু এই যে, অতসব জেনে কী হবে? আগে মাকে জানো। সব ছেড়ে-ছুড়ে তাঁকে ডাকো, আন্তরিকভাবে ডাকো, দরকার হলে তিনিই সব জানিয়ে দেবেন। আর মাকে জানলেই তো সব জানা হয়ে গেল। কেশববাবুকে বলেছিলেন, 'এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলে, জাহাজে উঠলে, সমুদ্র দেখলে, আর মাকে—যিনি এইসব ধারণ করে রয়েছেন—তাঁকে দেখতে পেলে না?' এ বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই মা ধারণ করে আছেন। তিনি তোমাদেরও রক্ষা করছেন, তাঁকে ডাক আর না-ই ডাক। তবে ডাকলে আরও আনন্দ পাবে, সেই আনন্দময়ীর আনন্দে বিভোর হবে। দেখো—চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পর্বত, নদ-নদী, বৃক্ষলতা সকলেই কেমন contemplative mood-এ (ধ্যানস্থ ভাবে) আছে, সকলেই যেন মাকে ডাকছে, তাঁর ধ্যান করছে। কেবল মানুষ—ভগবানের সৃষ্ট সকল প্রাণী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ—সে-ই বিষয়ে মত্ত, মাকে ডাকে না। মাকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে পারলে যে কী আনন্দ, তার খোঁজ রাখে না। সেই

আনন্দজ্যোতি তো চারিদিকে রয়েছে—সর্বত্র রয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না!

"তোমরা তো বুড়িকে অর্থাৎ ঠাকুরকে ধরেই রয়েছ, কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে, সেই জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুবে যেতে হবে।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৮তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

মাদ্রাজ মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শুভাগমন করেন। অতঃপর তিনি ত্রিবান্দ্রাম, কন্যাকুমারী, মাদুরা, রামেশ্বর, কাঞ্চি, উটকামন্ড, বাঙ্গালোর ও মহীশূর পরিভ্রমণ করিয়া ১০ জানুয়ারি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পুনরায় উপস্থিত হন। এই স্থান হইতে এলাহাবাদ প্রত্যাগমনের দিন সমাগত ভক্তগণকে তিনি যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন উহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

''ঈশ্বরদর্শনই মনুষ্যজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য। কারণ, এটিই কেবল আমাদেরকে প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তি দান করতে পারে। জীবনে সুখ, ধন, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ও মানসম্ভ্রম লাভ করবার জন্য মানুষ লালায়িত হয়, কিন্তু পরিশেষে দেখতে পায় যে, সেগুলির পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার ফল বিপরীতই হয়ে থাকে। শুধু যে আমরা উদ্দিষ্ট বিষয় লাভ করতে অকৃতকার্য হই তা-ই নয়, বরং মানসিক চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পায় এবং আমরা আগের থেকে অধিকতর অসুখী হয়ে পড়ি। ধনসম্পত্তিতে আমাদের অহং-এর পুষ্টিসাধন হয়। এই অহং অপেক্ষা বড় বাধা ধর্মপথে আর কিছুই নেই।

''বাস্তবিক, অবিদ্যাপ্রসূত এই অহঙ্কারই আমাদের দৃষ্টিকে (ঈশ্বরদর্শনের দৃষ্টি) ঢেকে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মহিমা সর্বত্রই বিরাজিত। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, কারণ আমরা এই অবিদ্যার আবরণ দূর করতে চাই না। কেউ কেউ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঈশ্বরকে কেন দেখতে পাওয়া যায় না?' তিনি নিজ মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা কি এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছ? না, কিছুতেই না। কেন? কারণ, এই কাপড়খানি মাঝে আছে; যদিও আমি তোমাদের সম্মুখেই আছি। তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে যে অবিদ্যার আবরণ আছে, তা সরিয়ে ফেলো, দেখবে—তিনি স্বপ্রকাশ হয়েই আছেন।'

''তাঁকে সর্বদা মনে রাখাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমরা যেন তাঁকে স্মরণে রাখি। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করলে আমাদের অন্তর্দেশ এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে স্মরণ

করলে বহির্দেশ পবিত্র হয়। মৃত্যুকালে তাঁকে মনে রাখাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়। তখন জীবিতাবস্থায় যাদেরকে আপনার বলে মনে হতো, তারা সকলেই ছেড়ে চলে যায়। আমরা প্রায় দেখি যে, মনে পবিত্র শুভচিন্তার অভাববশত মানুষ মৃত্যুশয্যায় ভয়ানক ভীত হয়, অনেকে বীভৎস ও ভীষণ আকারের যমদূত দেখে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু, ঈশ্বরের নামের প্রভাব এসকল ভয়কে দূর করে তো দেয়ই, অধিকন্তু আমাদেরকে চিরকালের জন্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে।''

এইসময় শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, মৃত্যুভয়ের পারে যাওয়ার জন্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের পূজা করতেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "তা যেভাবে ইচ্ছা হয় বা ভাল লাগে, সেভাবেই আপনি তা গ্রহণ করতে পারেন—মৃত্যুভয়কে দূর করবার জন্য বা আরো উত্তমভাবে গ্রহণ করলে—পরম সত্য উপলব্ধি করবার জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখতে গেলে, তিনি যেসকল সাধনা করেছিলেন, সেসকল তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ, জীবনের আরম্ভ থেকেই তাঁর পূর্ণ অবস্থা ছিল। তাঁর মতো মহান আত্মা এ-জগতে এসে যে-চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেন, তা কেবল আমাদেরকেই শিক্ষাদানের জন্য।''

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, ''প্রথম দর্শনে ঠাকুরের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা হয়েছিল?''

মহারাজ বলিলেন, ''তাঁকে শিশুর মতো বোধ হয়েছিল, বালকের চেয়েও সরল ও পবিত্র। তিনি 'আনন্দময়ী মা' ব্যতীত আর কিছুই জানতেন না বা চিন্তা করতেন না। তাঁর সঙ্গে থাকলে বোধ হতো, যেন মনের সমস্ত ময়লা ধুয়ে গেছে।

''বাস্তবিক, সৎসঙ্গ মনকে বিশুদ্ধ করে দেয়। কথিত আছে যে, কোনো একসময় মহর্ষি দুর্বাসা নরকদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে পাপাত্মারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যন্ত্রণা ভোগ করছিল। ঋষি সেখানে যাওয়ামাত্রই ঐসকল পাপাত্মার যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেল এবং তারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করতে লাগল। তখন বোধ হলো, যেন নরক স্বর্গে পরিণত হয়েছে। ঋষির পবিত্রতার এত শক্তি ছিল যে, ঐসকল পীড়িত পাপাত্মার পাপ ক্ষয় হয়ে গেল ও তারা নরক থেকে মুক্তিলাভ করল।

''আমাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক জিনিসের তিনটি ভাব বা আকৃতি আছে, যথা—নাম, রূপ ও সারভাগ (মূল সত্তা)। যতক্ষণ না আমরা নাম-রূপের

পারে যাব, ততক্ষণ আমরা সত্যের অন্তস্তলে বা মূলসত্তায় পৌঁছাব না। যখন আমরা সকল পদার্থের সার আত্মাতে পৌঁছাব, তখনই আমরা যথার্থ শান্তি লাভ করব।"

এইসময় একজন বলিলেন, "কিন্তু স্বামীজী, আমাদের বিশ্বাসের অভাব। আমাদের বিচার-বুদ্ধি যেন সর্বদাই বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করে। সেসম্বন্ধে আপনি কী বলেন।"

উত্তরে মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "এগুলি কথার কথা হিসাবে বলতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক জগতে এমন কোনো মানুষই নেই যার বিশ্বাস আদৌ নেই। বিশ্বাস ব্যতীত আপনি একটি নিঃশ্বাসও নিতে পারেন না।"

সেই ব্যক্তি বলিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, আপনি বলছিলেন যে—ভগবানকে স্মরণ করবার ফলে শান্তি ও আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু শান্তি কী করে হবে? দেশে কাজ-কর্মের অভাবের জন্য এবং রাজনৈতিক কারণে লোকের দুঃখ ও বিরোধই দেখছি।"

মহারাজ ঃ আপনারা এই বহির্জগতের বিষয়কে এত প্রাধান্য দেন কেন? এ তো চিরকালই বর্তমান থাকবে। যদি আপনাদের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং আন্দোলন সফল হয়, তা হলেই কি সকল গোল থেমে যাবে? নিশ্চয়ই না। বহির্জগতের আন্দোলন থেকে আমাদের মনে চাঞ্চল্যের উৎপত্তি হয় না, পরন্তু জাগতিক বিষয়সমূহের প্রতি আমাদের অনুরক্তি এবং ঐগুলি পাওয়ার জন্য আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। যদি ভগবান স্বয়ং আমাদের সম্মুখে এসে আমাদেরকে শান্তি প্রদান করতে চান, তবুও আমরা তা স্বীকার করতে বিমুখ হব। কারণ, তিনি আমাদের মনকে সাংসারিক বিষয় থেকে তুলে নেন, আর এ-প্রকার ত্যাগস্বীকার করতে আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই প্রস্তুত আছেন। আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত শান্তিরত্ন অপেক্ষা সাংসারিক বিষয়-সম্পত্তিই বেশি ভালবাসি। আপনারা রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয় বলছিলেন—আপনারা এই সংগ্রামের মধ্যে স্থিত মহাত্মা গান্ধিকে লক্ষ করুন। আপনারা কি বলতে চান যে, এই বাহ্যিক সঙ্ঘাতের ভেতরে থেকে তিনি নিজমনে শান্তি পোষণ বা ঈশ্বরকে স্মরণ করেন না? সংগ্রামের ভেতরেও শান্তি পোষণ করুন। সংসারে এটাই একমাত্র উপায়। গান্ধিজীর জীবনের এই ভাবটি বিশেষ করে বোঝা উচিত।

ভক্ত ঃ গান্ধিজীর কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষ কি তাঁর মতো হতে পারে?

মহারাজ ঃ কেন হতে পারবে না? তিনিও মানুষ, আপনারাও মানুষ। আপনারাই বা কেন তাঁর মতো হতে পারবেন না? যদি সত্য সত্যই দেশের দুঃখ-কষ্টের জন্য আপনাদের হৃদয়ে অশান্তি আসত, তাহলে আপনারাও মানসিক শান্তির সন্ধানে গান্ধিজীর সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তখন দেখতেন যে, এজন্য কত স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। সত্য এই যে, শান্তি লাভ করতে হলে স্বার্থত্যাগ চাই। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জীবনেই বলুন বা রাজনৈতিক জীবনেই বলুন, স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত না থাকলে সফলতা আসে না। বাস্তবিক, এই জগৎ স্বার্থত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ এইবার কথাবার্তা শেষ করিতে চাহিলেন, কারণ দুই-এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে কলকাতা অভিমুখে রওনা হইতে হইবে। গাত্রোত্থান করিবার পূর্বে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করিবার জন্য সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

তিনি বলিলেন, ''যখন কোনো সাধুর সঙ্গে কারো সাক্ষাৎ হয়, তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'দর্শন সাফা হ্যায়?' অর্থাৎ দর্শন পরিষ্কার আছে কি না? মর্ম এই যে, সকলই নির্ভর করে—কী দৃষ্টিতে লোকে জগৎকে দেখছে। এই সংসারের বহুত্বের পশ্চাতে ঈশ্বরের পবিত্র সত্তাকে দেখা উচিত। এটিই সত্য বা প্রকৃত দর্শন। লোকে মন্দিরে ঈশ্বর দর্শন করতে যায়, সে তো তাঁর বাহ্যিক রূপ মাত্র। এই মেঝেতে যে মাদুর পড়ে আছে, তার পশ্চাতেও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা উচিত। কারণ, সকল নাম-রূপের পারে সেই বিভু পরম শান্তিময় আত্মা স্বর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করছেন। আপনাদের সকলের এই সত্য দর্শন হোক এবং আপনারা শান্তিলাভ করুন—শ্রীভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।''

পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া বেলুড় মঠ হইয়া এলাহাবাদে প্রত্যাগমন করেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৩তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ভক্ত নরেনবাবু পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মহারাজ, আপনি ঠাকুরের প্রতি কী করে আকৃষ্ট হলেন, বলুন।'' উত্তরে তিনি বলিতে লাগিলেন, ''তখন আমি বেলঘরেতে থাকি, স্কুলে পড়ি, বেলা ৪টা হবে, সারদাদের বাড়িতে খেলা করছি, পরনে কেবলমাত্র ধুতি। এক সঙ্গী এসে বললে, 'ওরে তোরা পরমহংস দেখতে যাবি?' আমরা 'নুনকোট' খেলছিলাম। আমরা বললুম, 'কোথায় রে?' সে বললে, 'এই দেওয়ানদের (গোবিন্দ দেওয়ান) বাড়িতে।' পরমহংস কীরকম তা তখন বিশেষ কিছু জানতাম না। গেরুয়াকে একটু ভয় করতাম, কিন্তু তখনি সকলে মিলে পরমহংসকে দেখতে চললাম। গিয়ে দেখি, ঠাকুর সাদা কাপড় পরা (সবাই সাদা কাপড় পরা), দাঁড়িয়ে আছেন। এক অদ্ভুত দৃশ্য! মুখের ভাব যেন কীরকম! ফুটি যেমন ফেটে যায়, এ যেন সেরকম। মুখ বিকৃত বলা চলে না। শরীরের সব শক্তি যেন ওপর দিকে উঠে গেছে। মুখে ভাব আর ধরছে না—দাঁত সব বেরিয়ে পড়েছে, চোখ যেন কী দেখছে আর বিভোর হয়ে গেছে। বাইরের হুঁশ নেই। একজন (পরে জানলুম, বাবুরাম মহারাজ) দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ধরে আছেন, পাছে পড়ে যান। আরেক জন (পরে জানলুম, স্বামী বিবেকানন্দ) গাইছিলেন। আমার পাশে রাজেন সরকার (আমাদেরই একজন খেলুড়ে) বসেছিল। তাকে আমি বললুম, 'দেখ ভাই, লোকটি যেন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছেন, বাইরের দিকে দৃষ্টি নেই, যেন কাকে দেখে আনন্দে ডুবে আছেন।' যখন আমরা গিয়েছি, তখন 'জয় দয়াময়, জয় দয়াময়' এই গানটি হচ্ছিল। তারপর রামপ্রসাদী গান 'সে কী এমনি মেয়ের মেয়ে' হচ্ছিল। ঠাকুর রামপ্রসাদী গানটি গাইছিলেন, গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐরূপ ভাব দেখে মনে হলো, তিনি যেন মা-কালীকে দেখতে পাচ্ছেন, আর আনন্দে মেতে আছেন। রাজেন আমার কথায় 'হ্যাঁ, বেশ বেশ' বলে সায় দিল মাত্র; সে যে কী বুঝেছিল, তা সে-ই জানে। আরেক জন লোককে ঐসময় ভাবস্থ দেখেছিলাম। পরে জানলুম, উনি নিত্যগোপাল। তাঁর মুখ, চোখ, বুক রাঙা হয়ে উঠেছিল। তিনি ঠাকুরের কাছেই ছিলেন। কিছু পরে ঠাকুর বসলেন। আর নিত্যগোপালের সঙ্গে ভাবে কথা

বলতে লাগলেন। কথার ভেতর কেবল 'ফিট্ ফিট্' শোনা যাচ্ছিল। যখন লোকে ভাবপূর্ণ হয়, তখন কথা বলতে পারে না। ঠাকুর যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন যেন মা-কালীর ভাব। এখন শ্রীকৃষ্ণের ভাব। নিত্যগোপালের শ্রীকৃষ্ণের ভাব ছিল বলেই ঠাকুর বোধ হয় ঐভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন; তিনিও ঐরকমভাবে কথা বলছিলেন। ঐসময় আরেকটি ব্যাপার যা দেখেছিলাম, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। দেখেছিলাম, ঠাকুরের spinal cord (মেরুদণ্ড) নিচে থেকে মাথা পর্যন্ত একটা মোটা দড়ির মতো ফুলে উঠেছে, আর মাথার দিকে যে শক্তি উঠেছে, তা যেন সাপের মতো ফণা বিস্তার করে রয়েছে, আনন্দে হেলছে-দুলছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল! গানের পর ঠাকুর, স্বামীজী, বাবুরাম মহারাজ প্রমুখকে গোবিন্দবাবু ওপরে নিয়ে গেলেন। আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। আমার মা দেরির (সামান্যই দেরি) কারণ জিজ্ঞেস করায় বললুম, সারদাদের ওখানে খেলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে।

"এই তো প্রথম দেখা। এরপর দু-তিন বছর কেটে গেল, তখন St. Xavier's College-এ 2nd year-এ পড়ি। শরৎ মহারাজ (পরে স্বামী সারদানন্দ), বরদা পাল আমাদের সঙ্গে পড়ে, বেশ ছেলে। একদিন কথা উঠল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসকে দেখতে যেতে হবে। তারপর একদিন নৌকা করে আমরা তিন জনে ঠাকুরের ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর তখন ভারি ব্যস্ত। গাড়ি এসেছে, কলকাতায় মণি মল্লিকের বাড়ি (সিঁদুরিয়াপটি) যাবেন। বললেন, 'ওরে রামলাল (ঠাকুরের ভাইপো), গাড়ি এসেছে, চল। সেখানে সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ওরে গাড়োয়ান, গাড়ি হাঁকা।' এরূপ দু-চারটে কথার পর আমাদের বললেন, 'তোমরা মণি মল্লিকের বাড়িতে আজ যেয়ো, সেখানে খুব আনন্দ হবে। বললেই হবে, পরমহংসদেবকে দেখতে এসেছি।' আমরাও প্রণামান্তে নৌকাযোগে কলকাতায় গেলাম। মনে আছে, সে-দিন মণিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল আর মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছিলাম। ঠাকুরের ওখানে গিয়ে দেরি হয়েছে শুনে মা বলেছিলেন, 'সেই পাগলার ওখানে গিয়েছিলি, যে সাড়ে তিনশো ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছে?' সত্যিই মাথা খারাপ বটে, এখনও মাথা খারাপ আছে, আর মায়ের বকুনিকে কী বকুনি বলে ধরা যায়।

"এরকম চার-পাঁচ বার আমি ঠাকুরকে দর্শন করতে দক্ষিণেশ্বরে যাই। দু-এক বার রাতেও সেখানে ছিলাম। একবার যখন ছিলাম, তখন গিরিশবাবু ও তাঁর সঙ্গীরা আসেন। ঐসময় কোনো একদিন, ঠাকুর যখন মহাপুরুষ মহারাজকে কৃপা করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মহাপুরুষ মহারাজ

সেকথা এখনও মনে রেখেছেন। ঠাকুর প্রথম সাক্ষাতে তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার হবে।'"

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর কীরকমভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, "পরীক্ষা আর কী, ঐ একরকম করেছিলেন। ঠাকুর পরীক্ষা করতেন, একেবারে উলঙ্গ করে। আমাকেও তা-ই করেছিলেন। আমারই বা তখন তাতে কী আসে যায়—ছেলেমানুষ। পরীক্ষার পর, তিনি আমাকে তাঁর পা টিপতে বলেছিলেন। আমি খুব জোরে তাঁর পা টিপেছিলাম, তাতে ঠাকুর আস্তে টিপতে বলেছিলেন। আমার মনে আছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোর ভেতর দেখছি, একটু দেশলাই-এর মতো জ্বলছে।' তখন আর কী বুঝি! এখন বুঝেছি, তিনি মানুষের ভেতরটা কাচের আলমারির ভেতরের জিনিসের মতো সব দেখতে পেতেন।

"আমি যে-রাতে দক্ষিণেশ্বরে শেষবার থাকি, সেই রাতে ঠাকুরের গলায় ব্যথা আরম্ভ হয়। সকালে তিনি রামলালকে বললেন, 'ওরে রামলাল, গলাটা ব্যথা করছে।' কাছে একটি ছেলে ছিল, সে বললে, 'তেজবল ঘষে রস লাগালে ব্যথা সেরে যাবে।' অমনি তাতেই ঠাকুরের বিশ্বাস হলো। রামলালকে বললেন, 'ওরে এই ছেলেটি বলছে, তেজবল ঘষে রস লাগালে ব্যথা সেরে যাবে। দেখ তো, লাগিয়ে দে তো।' রামলাল ঠাকুরের স্বভাব ভালই জানতেন, বললেন, 'আচ্ছা দিচ্ছি।'

"এই আমার ঠাকুরকে শেষ দেখা। তারপর আমি বাঁকিপুর চলে আসি। যে বাড়িতে আমি ছিলাম, সে বাড়িতে এখন আশ্রম হয়েছে। আমি বাঁকিপুরেই ঠাকুরের দেহত্যাগের সংবাদ 'বসুমতী'তে পড়ি। তার আগের দিন আমি দেখি যে, ঠাকুর আমার সামনে স্ব-শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ভাবলুম—ঠাকুর কেন এখানে, কেন তাঁকে এভাবে দেখলুম? এর পরদিনই বসুমতীতে তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ পড়ি। স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) দেহত্যাগের সময়ও আমি vision দেখি। তখন আমি এলাহাবাদে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবের (গুড্স্শেড রোডের ওপর) ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান করছি। দেখলুম, ঠাকুরের কোলে স্বামীজী বসে আছেন। দেখে ভাবলুম, এ আবার কী? তারপর বেলুড় থেকে তার (telegram) পাই—স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন।"

পরে বলিতে লাগিলেন, "আমার মনে একটা প্রশ্ন ওঠে—'দেহ ছেড়ে গেলে কোথায় যাব?' মহাপুরুষ মহারাজ এসম্বন্ধে বলেন, 'আমরা রামকৃষ্ণলোকে চলে

যাব। ঠাকুর থাকবেন, আমরাও সেখানে থাকব।' আমি বলি, কোনো লোকে যাচ্ছি না। external কোনো world-এ যাচ্ছি না। ঠাকুরকে সদাসর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো। মন যখন সদাসর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় ডুবে থাকবে, যখন মুহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে না, তখন যেখানেই থাকি না কেন, সেই রামকৃষ্ণলোকেই থাকা হলো। যে যত pure (পবিত্র) হবে, ঠাকুর তার কাছে ততই প্রকাশিত হবেন। আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রেখে শরীর ছাড়তে পারি। আমি বলি, মুক্ত সে-ই, যে ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করেছে। বদ্ধ সে-ই, যে ঐগুলির দাস।''

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী সত্যাত্মানন্দ

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদ হইতে পাটনায় শ্রীযুক্ত মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার দিন মহাদেববাবুর ভাই বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা-কালীর মূর্তি ঐরূপ কেন?" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "এ মূর্তির তিনরকম ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ কালীমূর্তির esoteric meaning (গূঢ় অর্থ) হচ্ছে—যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন, ষট্‌চক্র ভেদ করে সুষুম্না পথে গমন করেন, সেইসময়কার কুণ্ডলিনীশক্তির রূপ হচ্ছেন কালীমূর্তি। আর কালীমূর্তির exoteric meaning (বাহ্য অর্থ) হচ্ছে—যখন দেবী কালিকা দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদের বধ করছেন, তখনকার যে-ভাবের মূর্তি—সেই হচ্ছেন কালীমূর্তি। আবার, কালীমূর্তির ordinary meaning (সাধারণ অর্থ) হচ্ছে—তিনি জগদম্বারূপে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, তিনি যে three aspects-এ এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন—সেই ভাবের মূর্তি হচ্ছেন কালীমূর্তি।"

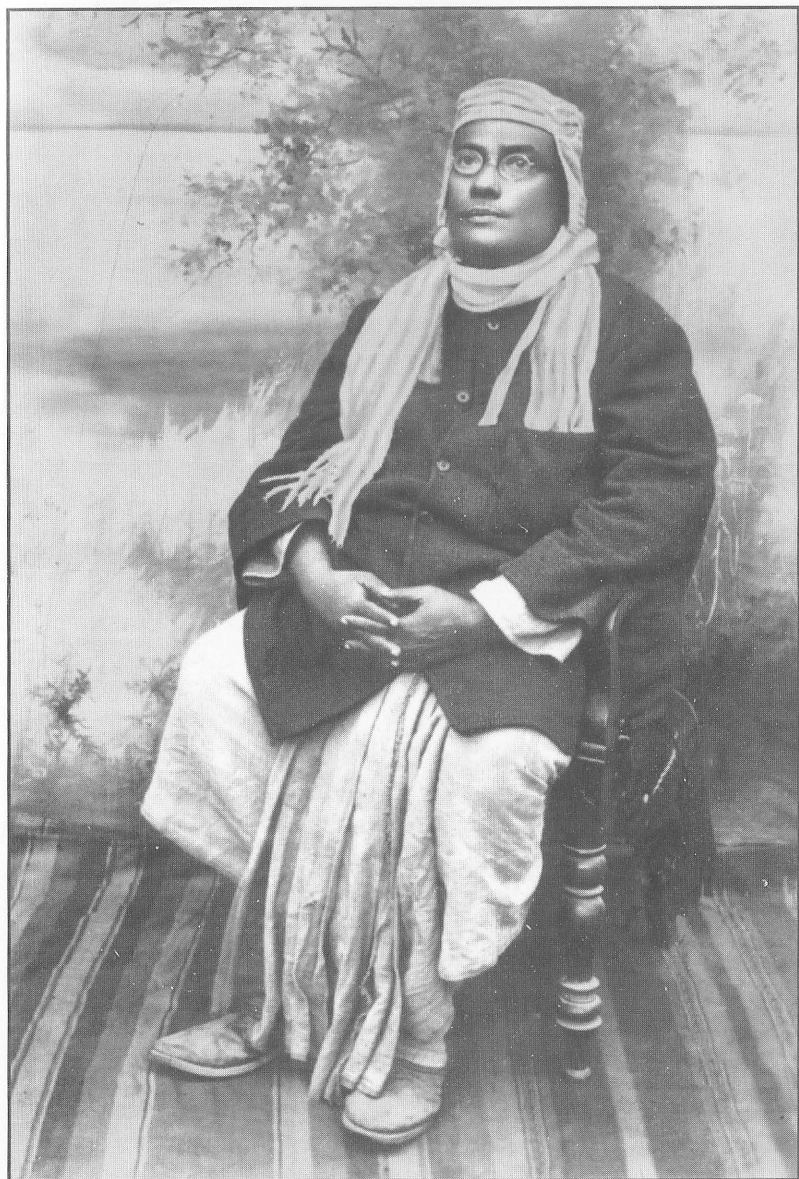
তারপর তিনি ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন,

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ (গীতা, ২/৬৯)

"যা সকল জীবের দৃষ্টিতে রাত্রি, তাতে সংযমী জাগ্রত এবং যাতে সকল জীব জাগ্রত, তা মুনির দৃষ্টিতে রাত্রি।

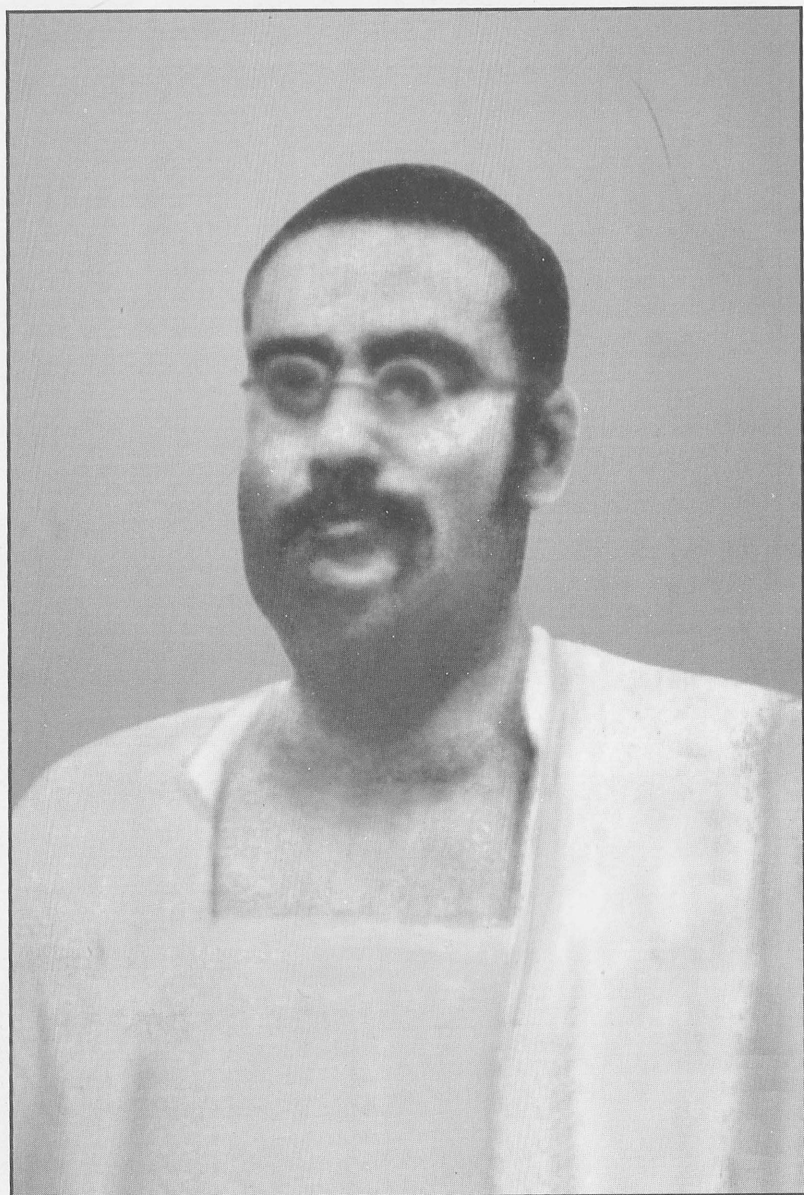
"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ (গীতা, ৮/২৪,২৫)

"অগ্নি ও জ্যোতির অভিমানিনী দেবতা এবং দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছ-মাসের অভিমানিনী দেবতাদের দ্বারা উপলক্ষিত যে-পথ, সেই দেবযানমার্গে গমন করলে ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছ-মাসের অভিমানিনী দেবতাগণ-দ্বারা উপলক্ষিত যে-পথ সে-মার্গে গমন করে, কর্মপর যোগী চান্দ্রমাস জ্যোতিদ্বারা লক্ষিত স্বর্গলোক-প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় মর্তলোকে ফিরে আসেন।



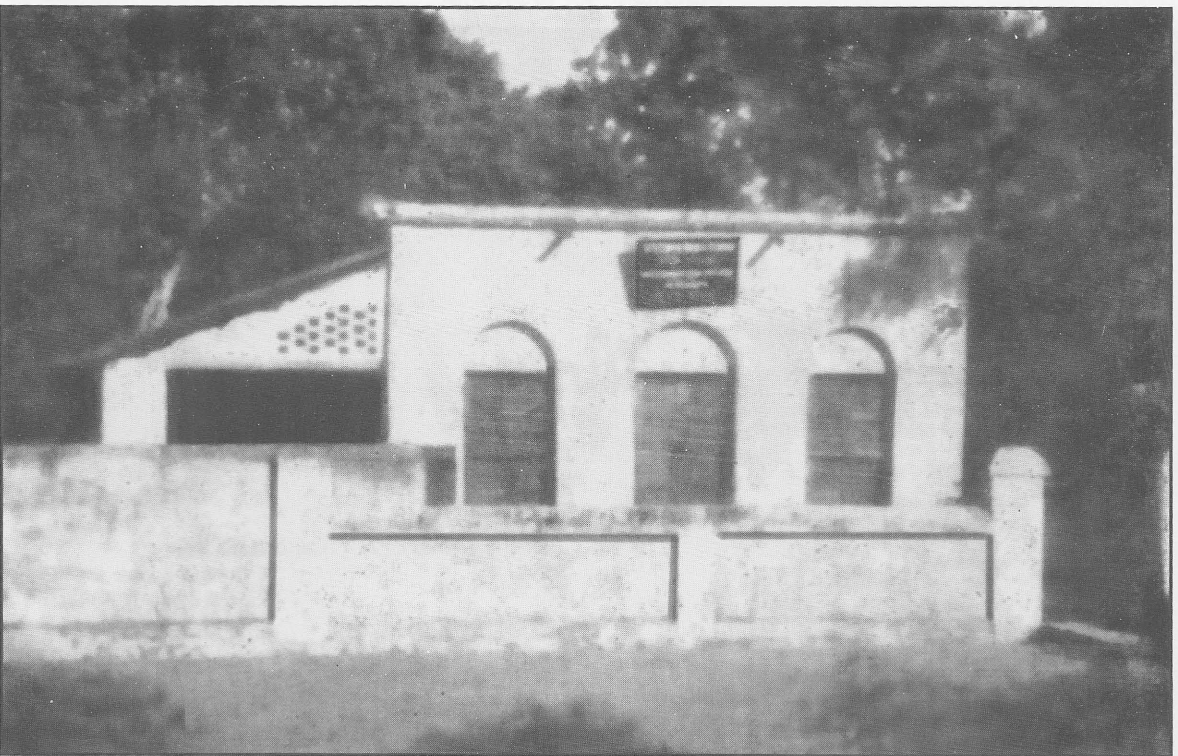






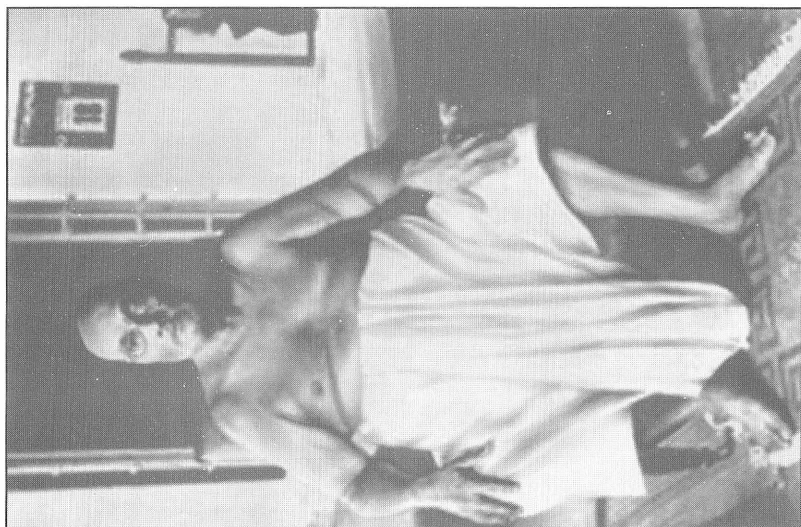


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, এলাহাবাদ



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ







"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীতা, ১৮/৬১,৬২)

"হে অর্জুন, অন্তর্যামী ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে [চৈতন্যরূপে] অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ মায়াশক্তিদ্বারা যন্ত্রস্থ পুত্তলিকার মতো ভূতগণকে চালিত করছেন। হে ভারত, সর্বতোভাবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাঁরই শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরমা শান্তি ও শাশ্বতস্থান প্রাপ্ত হবে।

"আমি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?' ঠাকুর উত্তরে আমায় বলেছিলেন, 'ঈশ্বর সাকার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের পারেও। যা-কিছু দেখছিস, সবই ঈশ্বর।' ঠাকুর এই কথাগুলি এত জোরের সঙ্গে বলেন যে, তাঁর কথায় আমি তখন যেন mesmerised (সম্মোহিত) হয়ে গেলুম। আমার ভেতরে যেন illumination (জ্যোতি) দেখা দিল। ভক্ত প্রহ্লাদেরও এই জ্ঞান হয়েছিল। তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু যখন স্ফটিক-স্তম্ভের মধ্যে হরি আছেন কি না প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন প্রহ্লাদ উত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওর মধ্যেও হরি আছেন।' তখন নৃসিংহমূর্তিতে শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করলেন এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে তুলে নিলেন।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীতা, ১৮/৬৫, ৬৬)

"তুমি আমাতে হৃদয় অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকেই নমস্কার করো। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি—তা হলে তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়। তুমি সকল প্রকার ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করো; আমি তোমাকে ধর্মাধর্ম [কর্মবন্ধনরূপ] সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত করব—তুমি শোক কোরো না।

"তিনি সকলের হৃদয়েই রয়েছেন, তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে পারলেই তিনি জীবকে উদ্ধার করেন।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৩ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে কথোপকথন

স্বামী ধীরেশানন্দ

এলাহাবাদ, ১৬ মে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে আমার প্রথম দর্শন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের দর্শন খুব সৌভাগ্যের কথা, সন্দেহ নেই। তিনি আমায় কত যত্ন করে খাওয়ালেন, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ''দেখো, বাবুগিরি কোরো না। খুব সাদাসিধেভাবে—যেটা না হলে নয়, এরকমভাবে চলবে। জুতো, জামা, কাপড় সবই পরবে, কিন্তু খুব সাদাসিধে। যতটা পারলে তাঁর কাজ করলে, বাকি সাধনভজন করলে। যদি পার তো কোনো লোকের খানিকটা উপকার করলে।''

রাতে আবার যখন তাঁর সঙ্গে বসার সুযোগ হলো, তখন অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার কথা কিছু বলো। মিশনে এসে তোমার কী experience (অভিজ্ঞতা) হলো? কিছু আনন্দ পাচ্ছ?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে, রিপুর উত্তেজনার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যে একটা শান্তি পাওয়া যায়, তার কিছু তো হলো না। এটার অভাব বোধ করি।"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, ''ওটা হওয়া বড় শক্ত—ধীরে ধীরে হয়। অনেক চেষ্টার পর, অনেক কাঠ-খড় পোড়ালে তারপর হয়। কত জন্মের সংস্কার রয়েছে, চেষ্টা করে করে সাধনভজনের দ্বারা সেগুলি ক্রমশ কমে যায়। একেবারে যায় না, তবে সেগুলির আধিপত্য কমে যায়। শরীরের উত্তেজনা একটু হবেই, তবে দেখতে হবে—thought-এর (চিন্তার) purification (শুদ্ধি) হচ্ছে কি না। thought যেন সর্বদা শুদ্ধ থাকে। সর্বদা সৎ-চিন্তা করতে হয়। চিন্তার শুদ্ধি না হলে কিছুই হবে না। শরীরের ধর্ম তো থাকবেই। ধ্যান-জপাদি করো—ওগুলো ক্রমে ক্রমে চলে যাবে বা কমে যাবে। আচ্ছা, তুমি এসব কথা শিবানন্দ স্বামীকে কেন জিজ্ঞেস কর না?''

আমি বললাম, "আজ্ঞে, তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনিও বলেন, 'ঠাকুরকে ডাকো, খুব ধ্যান-জপ করো, তাহলেই ওসব কমে যাবে।'"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "তাতেও যদি বেড়ে যায়?"

আমি বললাম, "তিনি বলেছেন, 'তাহলে আরো বেশি ঠাকুরকে ডাকবে, ধ্যান-জপ করবে।'" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, প্রথমটা মনে হয় বেড়ে যায়, কিন্তু পরে কমে যায়। আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে নেই। কত সব সাধু...দেখো না, পাঁচ মিনিট ধ্যান—ব্যস! বেশি করতে বল, পারবে না। দিন-রাত কেবল আড্ডা আর গল্প! সব educated (শিক্ষিত) লোক, তবু কাজে ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না।"

১৭ মে, সকাল ১০-৩০ মিঃ। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "আচ্ছা, তোমার পূজাতে বিশ্বাস আছে? ইউরোপ, আমেরিকায় মানুষ খুব পূজা করে।"

আমি বললাম, "কীরকম?"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "ওরা জীবন্তের পূজা করছে। তাই ওরা জীবন পাচ্ছে। আর আমাদের দেখো না—মৃতের পূজা করছে, তাই মৃত হয়ে যাচ্ছে। মৃতের পূজা করলে মৃত হয়ে যায়। ঐ ঘটা করে একটু একটু করে জল ঢালছে। কী হচ্ছে? না, পিতৃপুরুষদের দিচ্ছে! কী ভ্রান্ত! সে-জল হয় নদীতে, না হয় কুয়োয় পড়ে গেল। সে-জল তারা পাবে কী করে? কুসংস্কার! জীবন্তের পূজা করতে হবে। ভারতের লোকদের কথার, কাজের, সময়ের কিছু ঠিক নেই। time (সময়), space-এর (স্থানের) কোনো কিছু ঠিক নেই। সব মুক্তপুরুষ কিনা! তাই time, space, causation-এর (কার্য-কারণ সম্বন্ধের) বাইরে গেছে! একটুও punctuality (সময়ানুবর্তিতা) নেই। ঠাকুর এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার একজন লোক এসেছে। ফিরে যাওয়ার সময় ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হে, আবার কবে আসছ?' ঠাকুর এরকম জিজ্ঞেস করতেন। সে বলল, 'আজ্ঞে, অমুক দিন আসব।' ঠাকুর সে-দিন সেই সময় তাকে expect (আশা) করছেন—একেবারে ছটফট করছেন, কিন্তু লোকটির দেখা নেই। তার কয়েক দিন পর লোকটি এলে ঠাকুর তাকে বললেন, 'কী হে, সে-দিন আসবে বলেছিলে, এলে না যে! বউ কাছা ধরে টেনেছিল বুঝি?' লোকটি তো একেবারে অবাক। বলল, 'মশাই, আমাদের ঘরের খবর আপনি জানলেন কী করে?'

"আমাদের মধ্যে স্বামীজীর কথা ও কাজ ঠিক সাহেবদের মতো ছিল। শরৎ মহারাজ পারতপক্ষে কথার বেঠিক করতেন না। কিন্তু মহারাজের কিছু ঠিক ছিল না। হয়তো কাউকে বললেন যে, অমুক দিন তোমাদের ওখানে যাব। সে-দিন সে এসে বসে আছে। তিনি হয়তো বললেন, 'আজ পেটটা কেমন কেমন করছে।' কেন এরকম করেন, জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'ওর মনটা তত ঠিক নয়।' আমি

আগে কথার খুব ঠিক রাখতাম, এখন আর পারি না। কাজেই বলি, 'চেষ্টা করব', 'ঠিক নেই, যেতেও পারি' ইত্যাদি।''

১৭ মে, রাত ১০টা। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, ''ধনি-মানুষ অনেক খাবার নিয়ে এলে বা কিছু নিয়ে এলে কেউ হয়তো বলবে, খুব ভক্ত। কিন্তু যে গরিব, অনেক কষ্টে কয়েকটা টাকা খরচ করে সামান্য কিছু নিয়ে আসে—সেই হলো ঠিক ভক্ত। যে কিছুই নিয়ে আসে না, সে ভক্ত নয়। জিহ্বা ও উপস্থের সংযম নিতান্ত দরকার। কী জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে আসা, সাধুদের তা মনে রাখতে হবে; নইলে পরে সেসব কিছুই ঠিক থাকে না, কুঁড়ে হয়ে যায়—কোনোরকমে দিনটা আমোদে-আহ্লাদে, খেয়েদেয়ে কেটে যায়। জোয়ান বয়সে কিছু করে না নিলে বুড়ো বয়সে কিছু হওয়ার উপায় নেই। এই ধরো পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ—এই পঁচিশ বছর যদি সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে নিয়মিতভাবে ভগবানের নাম করে যাও, তবেই বাঁচোয়া। বন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে হলে খুব চেষ্টার দরকার। This world will always cheat you. This body is greatly antagonistic to the path of realising the truth. It will always cheat you. passion-এর (কামনাবাসনার) হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে সময়মতো প্রচুর চেষ্টা করা দরকার। নইলে বুড়ো বয়সে খুব কষ্ট হবে। মনে হবে—তাই তো, করলাম কী! বুঝলে? মঠে তোমাদের এসব ব্যাপারে কেউ কিছু বলে না?'' আমি বললাম, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষজী বলেন যে, 'কাজ ও সাধনভজন—দুটোই মিলিয়েমিশিয়ে করে যাও। ধ্যান-জপ বাদ দিলে কিছুই হবে না।''' বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, ''কিন্তু কী জান, কাজের চিন্তা থাকলে ধ্যানের সময়েও ঐসব চিন্তা হয়! ...বড় শক্ত। তবে কাজ কিছু কিছু করা ভাল। দু-চার ঘণ্টা কাজ করলাম, বাকি সময়টা সাধনভজন নিয়ে রইলাম—এ তো বেশ। এতে বেশ সমাজের একটু সেবাও করলাম, অথচ নিজের কাজও (অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ) করছি; এই বেশ। তুমি একটু-একটু (হোমিওপ্যাথিক) ওষুধপত্র দেওয়া শিখে নেবে, বুঝলে? Then you will be a useful member of the society. দু-চারখানা ছোট বই পড়ে ওখানে একটু-আধটু ওষুধ দিতে শিখে নেবে। মঠের যে এখানে আসে তাকেই আমি একথা বলি। বুড়ো বয়সে আমিও শিখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে থাকে না। তোমাদের অল্প বয়স, বুদ্ধি আছে—শিখে নেবে। ওতে লোকের সেবা হবে।'' আমি বললাম, ''আজ্ঞে হ্যাঁ, শিখে নেব।''

(উৎস ঃ উদ্বোধন ১০১তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের স্মৃতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের ঠিক পরেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদ থেকে হঠাৎ একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বিজ্ঞান মহারাজের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "বিজ্ঞান স্বামী, খোকা চলে গেল, খোকা চলে গেল।" বিজ্ঞান মহারাজও emotion চেপে রাখতে পারলেন না— তাঁর চোখেও জল।

বিজ্ঞান মহারাজ এলাহাবাদে খুব austere জীবনযাপন করতেন। তিনি মঠে এলে মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর জন্য special মাছ ও মিষ্টির ব্যবস্থা করতেন। তিনি বেশ খেতে পারতেন। ঐসময়ে আমি সবে মঠে join করেছি এবং তিন দিন তাঁর সেবক হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

একদিন ব্যারিস্টার শৈলেন ব্যানার্জি বিজ্ঞান মহারাজকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন, কারণ তিনি মহারাজকে বিশেষভাবে জানতেন। ব্যানার্জি পরিবারের সঙ্গে বেলুড় মঠের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী যখন দার্জিলিং-এ বিশ্রাম নিতে যান, তখন তিনি শৈলেনবাবুর বাবা এম. এন.ব্যানার্জির বাড়িতে ছিলেন। যাহোক, পরবর্তিকালে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে) শৈলেনবাবু তুলসী মহারাজের পক্ষ নিয়ে মঠের বিরুদ্ধে plead করেন। অথচ তাঁর স্ত্রী মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

এখন বিজ্ঞান মহারাজ শৈলেনবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন জেনে স্বামী শুদ্ধানন্দ আপত্তি জানালেন। কারণ, শৈলেনবাবু বেলুড় মঠের বিপরীত পক্ষের হয়ে মামলায় লড়েছেন। কিন্তু, মহাপুরুষ মহারাজ অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন, তিনি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "আমি ওদের সবাইকে জানি। আমি তো আর মামলা লড়তে যাচ্ছি না। এটা আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক।" অবশেষে ঠিক হলো, বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে সেবক হয়ে

স্বামী সত্যাত্মানন্দ (শৈলেন মহারাজ) ও আমি যাব। মহারাজ আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর শরীর বিশেষ ভাল না—মাছের ঝোলভাত খাবেন।

তারপর শৈলেনবাবু মঠে গাড়ি পাঠান। আমরা তিন জনে তাঁর বাড়িতে গেলাম। শৈলেনবাবু মহারাজকে খুব সমাদর করে বৈঠকখানায় বসিয়ে নানা কথা বলতে থাকেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে শৈলেনবাবু বলেন, ''মহারাজ, আমরা ভগবান বুঝি না। এই টাকাকড়ি, সম্পত্তি, জগৎ-সংসার—এসব বুঝি। তাছাড়া ভগবান আছেন, তার প্রমাণ কী?''

বিজ্ঞান মহারাজ চোখ বুজে সব শুনলেন। তারপর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন, ''আপনি যা বলছেন, তা আপনার দিক থেকে ঠিক। তবে আমি অনুভব করেছি, এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে এক চৈতন্যসত্তা বিরাজিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি।''

বিজ্ঞান মহারাজের ঐ অনুভূতিময় কথা শুনে শৈলেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর বিনীতভাবে হাতজোড় করে বললেন, ''মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন।''

তারপর আমাদের খাওয়ার জন্য ডাকা হলো। তাঁরা মহারাজকে পোলাও, মাছ, মাংস, ডাল, নানান তরকারি প্রভৃতি খেতে দিলেন। তিনি দিব্যি সব খেলেন। তারপর শৈলেনবাবু বললেন, ''মহারাজ, আপনি ঝোলভাতের কথা বলেছিলেন—তা-ও তৈরি আছে।'' তারপর তিনি সেই মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত খেলেন। সে এক দারুণ feast। সেই dinner খেয়ে আমরা রাতে মঠে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন খাওয়াদাওয়া হলো।" সব শুনে তিনি খুশি হলেন।

(উৎস ঃ স্বামী চেতনানন্দের ডায়েরি, ৩/১/১৯৭৪, হলিউড)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ কিছু স্মৃতি

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বলরাম মন্দিরে স্বামী ধীরানন্দের (কৃষ্ণলাল মহারাজ) সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলাম। পূর্বাশ্রম সম্পর্কে আমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। কৃষ্ণলাল মহারাজ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং সেবক। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় তিনি ছিলেন পূজক। রাস্তায় এসে উনি আমাকে বললেন, ‘‘চল, তোকে এক নতুন জায়গায় নিয়ে যাই।’’ আমি বললাম, ‘‘চলুন।’’ জায়গাটি ‘শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী’। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলাম, একটা ঘরে খাটের ওপর মায়ের ছবি বসানো। স্বামী ধীরানন্দ মায়ের ছবিখানিকে প্রণাম করলেন এবং আমাকেও প্রণাম করতে বললেন। প্রণাম সেরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘উনি কে?’’ উত্তর পেলাম, ‘‘উনি কে, পরে তুই জানতে পারবি।’’

এভাবে নিয়মিত বলরাম মন্দিরে যাতায়াত করতে থাকি। একদিন আমি কৃষ্ণলাল মহারাজকে বললাম, ‘‘আমার মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, কী করব?’’ বললেন, ‘‘এলাহাবাদে রামকৃষ্ণ মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ আছেন। তিনি বেলুড় মঠের বর্তমান সহাধ্যক্ষ। তোর মনোবাসনা তাঁকে চিঠি লিখে জানা।’’ চিঠি দিলাম, কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আবার চিঠি লিখলাম এবং হঠাৎ-ই উত্তর পেলাম, “Come immediately without delay.” আমি ঐ নির্দেশ অনুসারে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর এলাহাবাদের উদ্দেশে রওনা হলাম। মঠে পৌছালাম পরদিন সকাল সাড়ে দশটায়। তার পরদিন অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর ভোরে মহাতীর্থ ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করলাম। স্নান সেরে মঠে ফিরলাম সকাল নটায়। ফিরে দেখি, মঠের একতলা বারান্দার একপাশে ঠাকুরঘরের সামনে অথচ একটু দূরে বসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ একটা বড় খাতায় কিছু লিখছেন। আমাকে দেখে একটা বেঞ্চিতে বসতে বললেন এবং নিজে উঠে একটা ভর্তি বালতি থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে ঠাকুরঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঐসময়ে ঠিক কী করা উচিত বুঝতে না পেরে আমি বসেই রইলাম। ঐসময়ে আমি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করি, ‘‘আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?’’ তিনি থেমে গিয়ে উত্তর দিলেন, ‘‘আমার ভগবান দর্শন হয়েছে ঐ

জায়গায়—ত্রিবেণীসঙ্গমে; সেখানে আজ তুমি স্নান করে এসেছ। একদিন খুব ভোরবেলা ঐ সঙ্গমে আমি স্নান করে উঠে তিন-বেণীসহ এক বালিকা-মূর্তি দেখেছি। এই ঘটনা আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে জানাই এবং উত্তরে তিনি জানান, 'দর্শন তোমার ঠিকই হয়েছে।' ...এখন ঠাকুরঘরে চলো।" এভাবে উনি আগে এবং আমি পিছনে ঠাকুরঘরে চললাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম, দুটো আসন পাতা আছে। উনি একটাতে বসলেন এবং পুষ্পপাত্র দেখিয়ে আমায় বললেন, "ফুল দিয়ে ঐ কুলুঙ্গিতে যে-ছবি আছে, তা সুন্দর করে সাজিয়ে দাও।" ফুল নিয়ে কুলুঙ্গির সামনে গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমায়ের ছবি। আমার সাধ্যমতো সুন্দর করে ফুল দিয়ে ছবিখানি সাজিয়ে দিলাম। বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি দেখে আমার প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণলাল মহারাজ যে-উত্তর দিয়েছিলেন, তা মনে পড়ে গেল।

তারপর বিজ্ঞানানন্দজী আমাকে পাশের আসনটিতে বসতে বলেন। দীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হলে তাঁর সঙ্গে আমি ঠাকুরঘরের বাইরে আসি। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার কি ভগবান দর্শন হবে?" উত্তরে বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, "সময়ে সবকিছু হবে। বিশ্বাস, বিশ্বাস! সময়ে সবই হয়ে যাবে। রাস্তায় চলতে চলতে যদি এক বারও ভগবানের নাম করতে পার, তাহলেও অনেক কাজ হবে। মনের দ্বারা মনকে সংযত করতে হবে। সব ধর্ম সমান জানবে, কোনো ধর্মকে ছোট বা হেয় করবে না।"

পরের দিন কলকাতা চলে এলাম। এক দিন পরে, বলরাম মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণলাল মহারাজের কাছে সব ঘটনার বিবরণ দিলাম। কয়েক দিন পরে কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণলাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "জগতের মাকে কি দেখা যায়?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, দেখা যায়।" তাঁরই আদেশে বেদান্ত মঠে একদিন স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করতে যাই। তাঁর চরণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্ষণিকের জন্য এক আধ্যাত্মিক চেতনা অনুভব করেছিলাম। তারপর আড়াই বছরের মধ্যে বেলুড় মঠে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যখনই আসতেন, আমি ওখানে গিয়ে তাঁর দর্শন এবং পদসেবা করে আসতাম। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মকর সংক্রান্তির পুণ্য দিনে বেলুড় মঠের নূতন মন্দিরে ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাঁরই পরিচালনায় সম্পন্ন হয়। আমি সেখানে উপস্থিত থেকে মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করি এবং সমস্ত অনুষ্ঠান দেখে পরম আনন্দ লাভ করি।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ এলাহাবাদ যাচ্ছেন। ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যার পর। তাঁর অভ্যাসমতো বেশকিছু সময় আগেই বেলুড় মঠ থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে প্ল্যাটফর্মে বসে আছেন। সাহেব স্টেশনমাস্টার তাঁকে বসতে একটা চেয়ার দিয়েছিলেন। আমরা কয়েক জন ভক্ত দাঁড়িয়ে আছি, কথাবার্তা হচ্ছে। এমনসময় স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) আমাকে দেখিয়ে বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজকে বললেন, "এ কৃষ্ণলাল মহারাজের ভাইপো।" মহারাজ আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে লাগল এবং আমরা সবাই মিলে মহারাজের সঙ্গে কামরায় উঠলাম। সেখানে বসে কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ মহারাজ আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর পাশে বসালেন। আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "তুমি কৃষ্ণলাল মহারাজের ভাইপো?" উত্তরে আমি 'হ্যাঁ' বললাম। আর কোনো কথা বললেন না। কিন্তু ঐ সামান্য কথাতেই মন ভরে গেল। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। আমরা সবাই মহারাজকে প্রণাম করে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালাম। যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

আরেক দিনের ঘটনা। সেবারও মহারাজ এলাহাবাদ যাচ্ছেন। আমি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরায় উঠে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে তাঁর কাছে ইশারায় ডাকলেন। হঠাৎ হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, "একটা আঙুল ধরো তো!" উনি আঙুল নাড়িয়েই চলেছেন। আমি খপ করে বুড়ো আঙুলটা ধরে ফেলেছি। তা দেখে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মহারাজ ও ভক্তরা হাসতে লাগলেন। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তিনি কী ভাব নিয়ে ওটা করছেন, বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাঁকে বললাম, "আরেক বার করুন তো।" তিনি করলেন। এবার আমি মাঝখানের আঙুলটা ধরলাম। আবার মহারাজ হেসে উঠলেন। উপস্থিত সকলে তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "না হে, চালাক আছে!" যথাসময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। আমরা তার আগেই ট্রেন থেকে নেমে এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছি।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর আশীর্বাদ ও উপদেশ—'সময়ে সবকিছু হবে'—আমি কিছুটা উপলব্ধি করছি। বর্তমানে আমার বয়স ছিয়াশি বছর। বার্ধক্যজনিত দু-একটা সামান্য ব্যাধিতে ভুগছি। তা সত্ত্বেও মনের শান্তি ও আনন্দ আমার খুব আছে। আমি মনে করি, এসব স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ ও কৃপায় সম্ভব হচ্ছে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯৯তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

কাশীধামে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ

ব্রহ্মচারী প্রফুল্ল

আজ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার। খুব ভোরে উঠে পূজনীয় স— মহারাজ সেবাশ্রমের মোটর নিয়ে শ্রদ্ধেয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে আনতে এলাহাবাদ গিয়েছেন। সমস্ত কাজের মধ্যেও একটা পরিচিত হর্নের শব্দ শোনার জন্য কান-দুটো যেন সজাগ হয়ে রয়েছে। বেলা দেড়টার সময় সেই শব্দ শুনে মন আনন্দে নেচে উঠল। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম। বহুদিন পরে শ্রীগুরুদেবের দর্শন লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। পুনরায় সন্ধ্যাকালে অতি সন্তর্পণে ধীর পদবিক্ষেপে মহারাজের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করামাত্রই মন-প্রাণ শান্ত ও সৌম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলো। 'ধ্যানে মগ্ন যোগিবর'কে দূর থেকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম এবং বাইরে এসে ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আসন থেকে উঠে চেয়ারে বসলেন এবং আমাদের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। আমি অন্য সকলের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলাম। পূজনীয় কা— মহারাজ ও সমবেত ভক্তগণের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রাতের খাবারের আয়োজন হলো। মহারাজ সামান্য কিছু গ্রহণ করে, বাকি সব সকলকে দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। আমরা সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করলাম। তিনি নিজের শরীর দেখিয়ে বললেন, ''ভগবানের শরীরকে ভগবানই খেতে দিচ্ছেন।'' শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তা এড়িয়ে অন্য গল্পের অবতারণা করলেন। তাঁর বালসুলভ কথাবার্তায় হাসির ফোয়ারা বইতে লাগল এবং সমস্ত ঘরটি আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল।

তিনি আমাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আচ্ছা, তোমরা ঠাকুরকে ভালবাস, না মাকে ভালবাস?'' উত্তর এল, ''দু-জনকেই ভালবাসি।'' তিনি বললেন, ''তাহলে ঠিক আছে। ঠাকুর হলেন—রাম ও কৃষ্ণ, আর মা হলেন—সীতা ও যোগমায়া। এবার ছদ্মবেশে ঠাকুরের আসা। রাজা কখনো রাজবেশে প্রজাদের দেখতে আসেন; আবার কখনো ছদ্মবেশ পরে প্রজাদের সুখসুবিধা দেখতে যান। এবার ঠাকুরের ছদ্মবেশে আসা।''

আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ''মহারাজ, ঠাকুরের পুনরাগমন

সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, কোনো বইতে একশো বছর আবার কোনো বইতে দুশো বছর পরে আসবেন বলে লেখা রয়েছে।"

মহারাজ বললেন, "তবে একথা ঠিক যে, ঠাকুর শিগ্‌গিরই আসছেন। ঠাকুরের এবার পাঞ্জাবি-শরীরে আগমন, গায়ে খুব জোর থাকবে। ঠাকুর আমার সঙ্গে পারতেন না। একদিন আমার সঙ্গে লড়তে গিয়ে দেয়াল-ঠাসা হয়েছিলেন। পেটের রোগে ভুগে ভুগে জোর কমে গেছিল। খুব সাদাসিধে ছিলেন, কিন্তু যখন ভাবাবস্থায় থাকতেন তখন অন্য একজন হয়ে যেতেন। তাঁর কাছে যাওয়া ঐসময়ে সম্ভবপর হতো না।"

কিছুক্ষণ পরে, তিনি ঘড়ি দেখে আমাদের বললেন, "এবার সাড়ে আটটা বেজেছে, তোমরা সব যাও—আমি একটু শোব।" জনৈক সন্ন্যাসী বললেন, "আপনি শুয়ে পড়ুন, তারপর আমরা যাব।" "না, তোমরা যাও, আমি একটু ভগবানের নাম করে শোব।"—মহারাজের এই কথা শুনে একে একে প্রণাম করে আমরা চলে এলাম।

আজ ৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। বিকাল পাঁচটার সময় মহারাজ মোটরে দুর্গাবাড়িতে দেবীর দর্শন করে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ফিরে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সমস্ত কিছু নীরব—কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তিনি মা-দুর্গার ভাবে মগ্ন। আনন্দময়ীর আনন্দে যেন মেতে রয়েছেন। এমনিভাবে কেটে গেল খানিকক্ষণ। ভাব কেটে যাওয়ার পর তিনি যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে বসলেন। টেবিলের ওপর সাজানো নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভার। এসব দেখে বললেন, "এতসব কে খাবে? যখন খেতে পারতাম তখন কেউ দিত না, এখন খেতে পারি না, তাই ভূরি ভূরি খাবার আসছে।" সামান্যমাত্র গ্রহণ করে হাত-মুখ ধুয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক ভক্তের সঙ্গে বেলুড় মঠের মন্দির সম্বন্ধে মহারাজের কথাবার্তা হতে লাগল। মন্দিরটি স্বামীজীর মনোমতো হয়েছে কি না প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "স্বামীজী যে-প্ল্যান দিয়েছিলেন ঠিক তদনুযায়ীই মন্দির গড়ে উঠেছে, তবে সামান্য পরিবর্তিত আকারে। ঠাকুরের কী অসীম ইচ্ছা, বিশেষ করে স্বামীজীর—তা না হলে এতবড় একটা প্ল্যান যে এত শীঘ্র সম্পূর্ণ হবে তা আমরা ভেবে উঠতে পারিনি; এমনকী, স্বামীজী পর্যন্ত প্ল্যান করার পর ঘাবড়ে গেছিলেন। কম কথা নয়, ন-লাখ টাকা—স্বামীজীর প্রভাবেই তাঁর ভক্তের দ্বারা তাঁর মহতী ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। দু-জন মার্কিন ভক্তমহিলা প্রায় সাত লাখ টাকা দান করেছেন। কম কথা নয়! তাঁদের কথা আর কী বলব—এত সরল, এত উদার সচরাচর দেখা যায় না। তাঁরা ঠাকুরের চেয়ে স্বামীজীকে বেশি

মানেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল অদ্ভুত রকমের। সকলেই তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে যেতেন, আমরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, 'এসব ঐ পাগলা বামুনের কাজ, ভেতরে বসে তিনিই সব করছেন।' স্বামীজী বাঙালির প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন। কেউ বাঙালির প্রশংসা করলে তিনি খুশি হয়ে বলতেন, 'দেখুন, আমাদের ঠাকুরের বাঙালি-শরীর ছিল—তা কী কম সৌভাগ্যের কথা!' স্বামীজীকে আমরা দেখতাম, রাতে ন্যাংটো হয়ে শুতেন; এত ত্যাগী ও সরল ছিলেন স্বামীজী।''

এমনিভাবে তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতে লাগলেন। ক্রমে বেশ রাত হলো। আমরা একে একে সকলে মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৫তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

পাটনায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ব্রহ্মচারী বী—

আজ শ্যামা মায়ের বিসর্জনের দিন। পাটনা আশ্রমের কাছে লঙ্গরটুলি বাঙালি আখড়ার প্রতিমা নিরঞ্জন করে এসে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম এবং গাড়িটা আস্তে আস্তে আমাদের আশ্রমের কাছে এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ নামলেন। আমরা সকলেই প্রণাম করলাম। আশ্রমের বারান্দায় তাঁকে চেয়ারে বসানো হলো। তারপর আমার দীক্ষা হলো। দীক্ষার পর তিনি এসে আবার বারান্দায় চেয়ারে বসলেন। আমি ফুল-চন্দন নিয়ে ঠাকুরপূজা করতে গেলাম। পূজার পর বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "আমার হাতে কিছু ফুল দে।" আমি তাঁর হাতে ফুল দিতেই তিনি তা পকেটে ভরে নিলেন এবং বললেন, "এই আমার গুরুদক্ষিণা নেওয়া হলো।" পরে জল গ্রহণ করে আমায় কিছু প্রসাদ দিয়ে বি—বাবুর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। সেখানে আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর আমরা বি—বাবুর বাড়ি উপস্থিত হয়ে দেখি, মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতেই আমাদেরকে বসতে বললেন। একটু পরে তিনি খেতে বসলেন। খেতে আরম্ভ করেই বললেন, "ওগো, ভেতরে খাওয়ার জায়গা করো, বেলা হয়েছে।" কিছু পরে বি—বাবু খাওয়ার জন্য আমাদের ডাকলেন। আমরা উঠতেই 'তুই একটা সন্দেশ নিয়ে যা' বলে নিজের থালা থেকেই তুলে মহারাজ আমার হাতে সন্দেশ দিলেন। খেয়ে এসে আমরা দেখি, মহারাজ খাটে শুয়ে আছেন। আমি আসতেই বললেন, "তুই আমার হাতটা টিপে দে।" আমি তাঁর হাত ও পা টিপে দিতে লাগলাম। তাতে খুশি হয়ে বললেন, "তুই জানিস দেখছি।" কিছুক্ষণ চুপ করে পুনরায় বললেন, "দেখ, ঠাকুর এবং মাকে অভেদ চোখে দেখবি। মনে রাখবি, ঠাকুরের কৃপা না হলে মাকে পাওয়া যায় না, আবার মায়ের কৃপা না হলে ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যেন নারায়ণ, মা যেন লক্ষ্মী। মায়ের কাছে শক্তি চাইতে হয়। শক্তি না হলে কোনো কাজ হয় না। ঠাকুরের কাছে শুদ্ধাভক্তি চাইবি। স্বামীজীকে শিবজ্ঞানে পূজা করবি। স্বামীজীর মা শিবের ব্রত করে স্বামীজীকে পেয়েছিলেন।" কিছু পরেই আমায় চলে যেতে বললেন। আমি আশ্রমে ফিরে এলাম।

ঐ-দিন বিকালে গিয়ে দেখি, মহারাজ কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রণাম করে আমি বসলাম। কিছুক্ষণ কথা হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, স্বামীজীর সম্বন্ধে কথা হচ্ছে। তিনি বলতে লাগলেন, "স্বামীজী আমায় 'পেসন' বলে ডাকতেন। আমি মুড়ি খাচ্ছি, তিনি বারান্দা দিয়ে যাচ্ছেন, অমনি চট করে একগাল তুলে নিলেন। আমি চটে গিয়ে বললুম, 'একটা জায়গা করে নিন না? আমার এঁটো খেয়ে আমায় দোষী করেন কেন?' তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন। আমি নস্যি নিতে ভালবাসি, তাই স্বামীজী কলকাতা থেকে একদিন কাগজে করে এক পয়সার নস্যি এনে আমায় দিয়ে বললেন, 'তোমার জন্য কেমন একটা চমৎকার জিনিস এনেছি।' আমি আগ্রহভরে খুলে দেখলুম, নস্যি। তিনি ফুর্তি করতে লাগলেন। কিন্তু যখন গম্ভীর হতেন, তখন তাঁর কাছে যাওয়া যেত না, তখন রাজা মহারাজকে বলে গাম্ভীর্য কমানো হতো। রাজা মহারাজের কথা স্বামীজী যেমন শুনতেন তেমনি আবার তাঁকে (রাজা মহারাজকে) গালাগালও শুনতে হতো। স্বামীজীর মন্দির তৈরি করবার সময় তাঁর কথা বেশি করে মনে হতো, আর বড় কষ্ট হতো। তিনি আমাদের সকলকে এমন ভালবাসতেন যে, তা আর বলবার নয়।"

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, রামায়ণটা কতদূর হয়েছে?" তিনি বললেন, "এরই মধ্যে ছাপাখানার লোক তাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। কারণ, তারা টাকাটা একবারে পাবে বলে—সংসারী লোক কিনা!" এসময় একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনার নাকি রামায়ণ লেখার সময় কোনো দিকেই হুঁশ থাকে না?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি যে তাঁদের দেখতে পাই। যে প্লটটা লিখতে আরম্ভ করি, সেটা চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার অনেকগুলি ফাউন্টেন পেন আছে। তাতে কালি ভরা থাকে, আর আমি লিখে যাই।" কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন, "তুলসীদাস তাঁর গুরুর সঙ্গে একবার বৃন্দাবন গেছিলেন; গুরু বললেন, 'ঐ দেখো, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি!'—বলেই তাঁকে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ' ইত্যাদি বলে প্রণাম করলেন; কিন্তু তুলসীদাস 'রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে' ইত্যাদি বলে প্রণাম করলেন। তখন গুরু বললেন, 'কিগো, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি যে?' তাতে তুলসীদাস উত্তর করলেন, 'আমি তো রাম-সীতাকে দর্শন করছি, কই শ্রীকৃষ্ণ?' তেমনি ভগবান এক, নানা রূপে অবতীর্ণ হন। তুলসীদাস রামরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তা-ই তাঁর হলো।" এরপর প্রণাম করে আমরা বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি, মহারাজের এলাহাবাদ যাওয়ার জোগাড় হচ্ছে।

তিনি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন দেখে বি—বাবু বললেন, "মহারাজ, এখনো অনেক সময় আছে।"

মহারাজ বললেন, "তা হোক, স্টেশনে গিয়ে বসব। তোমরা চলো।"

কথাপ্রসঙ্গে 'দিন' দেখার কথা উঠল। তিনি বললেন, "আমি দিন দেখে কোথাও যাই না। আমি খারাপ দিনে গিয়েও দেখেছি, ভাল ফল হয়। যার ভেতর সন্দেহ থাকে, তারই খারাপ হয়। আমার সন্দেহও নেই, খারাপ ফলও কোনো দিন পাই না।" কিছু পরে মহারাজের সঙ্গে আমরা স্টেশনে গেলাম। সেখানে কথায় কথায় সন্ন্যাসের কথা উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, "স্বামীজী আমায় ঠাকুরঘরে ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নিতে বললেন। আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে তাঁর কাছে সন্ন্যাস চেয়ে নিলুম। যাবার সময় স্বামীজী কাছে ডেকে নিয়ে ভালভাবে খাওয়ালেন, আর বারবার আমার সন্ন্যাস-নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন।" এই কথা বলে মহারাজ খুব হাসতে লাগলেন। আবার বললেন, "তখন আমি খুব খেতে পারতুম। একদিন খাওয়ার পর খুব রোক করে এক গামলা রসগোল্লা খেয়েছিলুম। তখন খুব ব্যায়াম করতুম। ২৫০ ডন এবং ৫০০ বৈঠক করতুম।" কিছুক্ষণ পর ট্রেন এলে তিনি ট্রেনে উঠলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

প্রায় ছ-মাস পরে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ পুনরায় বি—বাবুর বাড়ি এলেন। কথাপ্রসঙ্গে বিহার-ভূমিকম্পে রিলিফের কথা উঠলে তিনি বললেন, "দেখো, আমি ঘুমিয়েছিলুম। জানলার কপাটগুলো খটখট করে উঠল। বারবার ঐরূপ করাতে আমি বললুম, 'কে?' তবুও সেই শব্দ। আমি বললুম, 'কৌন্ হ্যায়? কিঁউ খট্‌খটাতাজী?' তারপরই 'সীতারাম, আল্লাহ' শুনতে পেলুম। তবুও বুঝতে পারিনি।" জনৈক সন্ন্যাসীর নাম করে বললেন, "সে আমায় যখন বললে—'ভূমিকম্প হচ্ছে, বাইরে আসুন', তখন আমি বুঝতে পেরে বাইরে এলুম। তার কিছুক্ষণ পরেই থেমে গেল। এই ভূমিকম্পে বিহারের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা আর বলবার নয়!" বি—বাবু বললেন, "মহারাজ, মুঙ্গেরে সে-দিন মুসলমানদের একটা পরব ছিল। মুঙ্গেরের প্রায় সমস্ত মুসলমান একজায়গায় জমা হয়েছিল। প্রায় সব লোকই চাপা পড়ে মারা গেছে।" মহারাজ বললেন, "আহা! কত লোক মরে গেল এবং কত লোক আশ্রয়হীন হলো!" এরপর তিনি বলতে লাগলেন, "ঠাকুর এসেছিলেন সর্বধর্মের মিলন দেখাতে। স্বামীজী বলতেন, আমার নিয়মের মধ্যে এরকম একটা নিয়ম থাকবে যে, মঠে দাঁড়িয়ে কেউ কোনো ধর্মের কিংবা কোনো ধর্মের লোকের নিন্দা করতে পারবে না।" বি—বাবু বললেন, "চমৎকার

মন্দির হবে।'' মহারাজ বললেন, ''স্বামীজীর বড় ইচ্ছা ছিল এবং আমার ওপর মন্দির তৈরির ভার দিয়ে গেছেন। যাহোক তাঁর আশা সফল করে যেতে পারব।'' কিছুক্ষণ পরে নি—বাবু এসে মহারাজকে নেমন্তন্ন করে চলে গেলেন। মহারাজ বলতে লাগলেন, ''ঐ নি—র মা আমাকে ঠাকুরের কাছে যেতে নিষেধ করত। বলত, তুই দক্ষিণেশ্বরের ঐ পাগলার কাছে যাস, সে কত ছেলের মাথা খারাপ করেছে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাত হওয়াতে ঠাকুর বললেন, 'আজ থাকতে হবে।' আমি থাকলুম। তিনি নহবতখানা থেকে খাবার এনে আমাকে খাওয়ালেন। নিজের হাতে মশারি খাটিয়ে দিলেন। আমি খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুতেই তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'দেখ, তোদেরকে এত ভালবাসি কেন জানিস? তোরা যে আপনার লোক। মা তোদের ভালবাসতে বলেছেন, তাই।' অনেক কথার পর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন তিনি মশারিটা ফেলে দিয়েছেন, তা আমি টের পাইনি। ভোর হওয়ার পূর্বে আমায় ডেকে জপ করতে বললেন। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে লাগলেন। তারপর, সকালে প্রণাম করে বাড়ি যাব বলাতে বললেন, 'আবার আসবি।' বাড়িতে আসতেই মা আমায় খুব বকলেন। আমি কেবল দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে সুরকি ফেলছিলুম। সত্যি, যদি ঐ পাগলের পাল্লায় না পড়তুম, তাহলে আজ ছেলে, মেয়ে, নাতি কত কী হতো!'' পুনরায় বলতে লাগলেন, ''দেখো, আমরা না হয় তাঁকে দেখে পাগল হয়েছি, কিন্তু তোমরা যে তাঁর নাম শুনেই পাগল!'' বলতে বলতে মুখটা তাঁর লাল হয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। তিনি বললেন, ''ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন, তাই বাবুরাম মহারাজ তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'তুমি কি ঠাকুরের মতো ভালবাসতে পার?'''

কিছুক্ষণ পরে বললেন, "খুব গরম, বাইরে যাব।" তখন বাইরে তাঁকে চেয়ার দেওয়া হলো এবং আমরাও বসলাম। তিনি বললেন, ''একদিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে বসেছি, বেশ কোঁচানো কাপড় পরে একজন ভদ্রলোক এলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বললেন, 'কিগো, সে-দিন আসনি কেন? বউ বুঝি কাছা ধরে টেনেছিল?' সে তো শুনেই অবাক। সে বললে, 'আপনি জানলেন কী করে?' তিনি বললেন, 'আমি মানুষকে দেখলেই তার ভেতরের সব বুঝতে পারি।'''

তারপর আশ্রমের কয়েকটি ছেলের দীক্ষার কথা তাঁকে বললাম। মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''সত্যকথা বলিস তো?'' আমি বললাম, ''যতটা সম্ভব বলতে চেষ্টা করি।'' তিনি বললেন, ''সত্যকথা না বলতে শিখলে ধর্ম-কর্ম কিছুই হবে না।''

সন্ধ্যাবেলায় জনৈক ভক্ত এসে মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করে বললেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলুন।" তিনি বললেন, "ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক বই বেরিয়ে গেছে, তা পড়লেই জানতে পারবেন।" কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা বিদায় নিলাম।

আজ তিনি চলে যাবেন। প্রণাম করতেই বললেন, "ভূত দেখেছিস?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তোর শরীরেই যে পঞ্চভূত আছে। ভয় নেই, রামনাম করবি, চলে যাবে। যেখানে রামনাম হয়, সেখানে আর ভূত থাকতে পারে না।" আমি বললাম, "মহারাজ, আপনি একা ট্রেনে যাতায়াত করেন, আমি সঙ্গে থাকব।" তিনি বললেন, "শৈ—ই পাত্তা পায় না, আর তুই। আচ্ছা, একসময় ডেকে নেব, যখন সময় হবে। কোথায় জানিস? সেই শ্রীরামকৃষ্ণলোকে। তোরা গিয়ে সব গুলজার করবি।" ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। বি—বাবু বারবার বলছিলেন, "মহারাজ, আজকের আবহাওয়া খারাপ, আজ যাবেন?" মহারাজ বললেন, "তাই কী হয়? যাব বলেছি, যেতেই হবে। ঠাকুর 'বাহ্যে যাব' বললে গাড়ু হাতে করেও অন্তত যেতেন। সত্যের আঁট চাই।" এমনসময় বি—বাবুর বাড়ি থেকে একটি ছোট ছেলে এসে বলল, "মহারাজ, আপনি কি আজ চলে যাবেন? আপনি থাকলে কিন্তু রোজ ভাল ভাল খাবার হয়।" "হ্যাঁ, তোমাদেরও খুব মজা হয়, না?"—বলে তার সঙ্গে একটু ফুর্তি করতে লাগলেন। পরে মহারাজ বললেন, "মন-মুখ এক না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না। মন-মুখ এক করতে পারে তিন জন—বালক, পাগল আর ব্রহ্মজ্ঞানী। আমরা ঠাকুরকে দেখেছি, বালকের মতো সরল ছিলেন। কোনোদিন বা ন্যাংটো হয়ে ছোট ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। তখন অন্য লোকের মতো লজ্জা বলে কিছু থাকত না। এমনটা হওয়া চাই।" এরপর আমরা প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪১তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

একটি মিলন দৃশ্য

স্বামী নিরাময়ানন্দ

রেঙ্গুন হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ দুই-এক দিন মঠে ছিলেন। যে-দিন আসিলেন সে-দিন সন্ধ্যায় দুই বৃদ্ধ-শিশুর মিলনদৃশ্য বড়ই মনোরম হইয়াছিল। বিজ্ঞান মহারাজ বাবার (স্বামী অখণ্ডানন্দ) ঘরে ঢুকিতেই বাবা তাঁহাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। তারপর দুই জনে দুইটি চেয়ারে বসিয়া শিশুর মতো আলাপ করিতে লাগিলেন ঃ

—তোমার কটা ফাউন্টেন পেন? আমায় একটা দাও।

—বা রে, দেব কেন? তোমারও তো অতগুলো রয়েছে।

—আচ্ছা, হাতির দাঁতের পেন হয়?

মুর্শিদাবাদে আইভরির অনেক সূক্ষ্ম কাজ হয়—কিছুক্ষণ সেই বিষয়ে আলাপ হইল। তারপর বিজ্ঞান মহারাজ পাশেই নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

(উৎস ঃ স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথা)

বিজ্ঞান মহারাজের স্মৃতি

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

মহাপুরুষ মহারাজের দেহরক্ষার পর সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন স্বামী অখণ্ডানন্দজী। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষ্যে আমি যখন মঠে আসি, তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সঙ্ঘাধ্যক্ষ। তিনি থাকতেন মঠ থেকে বহুদূরে—এলাহাবাদে। শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের শেষে আমি বেনারসে যাই। সেখানে গিয়ে ভাবলাম, এলাহাবাদ যখন কাছেই তখন সেখানটা ঘুরে যাওয়াই ভাল। সেখানে আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দজী আছেন, তাঁকে দর্শন করে যাই। তাই বিশ্বনাথ-দর্শনের পর এলাহাবাদে আমাদের মঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করলাম। দিনটি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল। ঐ-দিনটিই আবার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দিন। সে-দিন দেশের প্রতিটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ঐ বিশেষ দিনে আমি ছিলাম এলাহাবাদে। সে-দিন আমাদের একটা গ্রুপফটোও তোলা হয়। বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন। আমি এবং কয়েক জন ভক্ত তাঁর দু-পাশে। যথারীতি তাঁর জামার পকেট ছিল শেভিং সেট ইত্যাদি রকমারি জিনিসে ঠাসা। যখন তাঁকে বললাম, ''মহারাজ, আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি।'' বিজ্ঞানানন্দজী সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করে বললেন, ''আচ্ছা বেশ, দেখা তো হলো। এবারে যাও, কলে জল আছে, জল খেয়ে ফিরে যাও।'' মহারাজের এই মন্তব্যে আমি বেশ মজা পেলাম। আমি আগেই জানতাম, মহারাজ নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন। মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী অবশ্য স্থানীয় এক বাঙালি ভক্তের বাড়িতে আমার দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এত ভাল দুপুরের খাবার আগে কখনো খাইনি। এরপর আমি বেনারস ও কলকাতা ঘুরে মহীশূরে ফিরে যাই। এলাহাবাদ মঠে যে-ফটো তোলা হয়েছিল তার কোনো হদিশ আর পাইনি। এলাহাবাদ মঠ থেকে প্রকাশিত আলোকচিত্র-সম্বলিত বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনীগ্রন্থে সেই ছবি ছাপা হয়নি। সেটা নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছে। সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার পর সেটা ছিল মহারাজের প্রথম ছবি। বিজ্ঞান মহারাজ মহীশূর ও মাদ্রাজেও গিয়েছিলেন এবং কিছু ভক্তের তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা পাওয়ার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ১০০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি[১]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

আমার নিজের স্মৃতিকথা খুব অল্প; তার ভিতর আবার সাধারণের কাছে বলার মতো যা ছিল, তা ইতিপূর্বেই স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থটির রচয়িতা প্রচ্ছন্নভাবে ও সংক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন স্থানে সেগুলি সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। কাজেই নতুন কথা বেশিকিছু বলার নেই। তবু তারই দু-একটির বিস্তারিত বিবরণ এবং কিছু নতুন কথা এখানে দেওয়া হলো।

তাছাড়া খুবই নির্ভরযোগ্য লোকের—প্রাচীন সাধুদের মুখে শোনা দু-চারটি ঘটনা আছে। এছাড়া বিজ্ঞানানন্দজীর দু-জন মন্ত্রশিষ্যের মুখে শোনা এবং আমার অনুরোধে লিখিতভাবেও আমাকে জানানো ঘটনা কিছু আছে। এই দু-ধরনের ঘটনাগুলি এতদিন প্রকাশ করিনি, প্রকাশ করা ঠিক কি না—এই সন্দেহদোলায় দুলে। 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' বইটি পড়ে মনে হলো, এধরনের ঘটনা যখন প্রকাশিত হয়ে সাধু ও গৃহস্থ উভয়বিধ পাঠকদের কাছেই তৃপ্তিদায়ক হয়েছে, তখন তা প্রকাশ করাই ভাল।

আমার এই 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতি'কে তিন ভাগে ভাগ করলাম ঃ

(১) আমার নিজের প্রত্যক্ষ করা বা শোনা, (২) অতি নির্ভরযোগ্য লোকের কাছ থেকে শোনা এবং (৩) শোনা ছাড়াও যা লিখিতভাবে পেয়েছি। লিখিতভাবে যে-দুজনের কাছ থেকে পেয়েছি, তাঁদের একজন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, যিনি এখন ইহলোকে নেই; দ্বিতীয় জন এক মহিলা—নামপ্রকাশে একান্ত অনিচ্ছুক।

---

১ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত রচনা। 'জনৈক সন্ন্যাসী'র রচনা হিসাবে তিনি ইহা উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার দেহান্ত (৩০/১/১৯৭৮) হওয়ায় তাঁহার নামেই ইহা প্রকাশিত হইল। দেহত্যাগের কয়েক দিন পূর্বে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা। ইহার প্রথম অনুচ্ছেদে যে-জীবনীগ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহার সম্পূর্ণ নাম 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ জীবনী ও বাণী' এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী স্বয়ং উহার রচয়িতা। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থটি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। উভয় গ্রন্থের প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎ দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।—সংযুক্ত সম্পাদক, উদ্বোধন পত্রিকা।

(১)

বিজ্ঞানানন্দজীর প্রথম দর্শন পাই ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি ছাত্রাবাসে কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণির নবাগত ছাত্রদের একজন হয়ে এসে—যাদের ভিতর, আমার সহপাঠীদের মধ্যে, বেশ কয়েক জন বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। এর আগে রামকৃষ্ণ মঠ বা মিশনের কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে বা কোনো সাধুর সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব বা পরিচয় ছিল না। কেবল স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল। যে-স্কুলে পড়তাম, সেখানকার চিরকুমার স্নেহশীল প্রধানশিক্ষক মহাশয় একদিন আমার হাতে একটি উপন্যাস দেখে সে-বয়সে ওসব পড়তে নিষেধ করেন, স্বামীজীর বই পড়তে বলেন। তিনিই বিদ্যার্থি-আশ্রমে আসার জন্য আমায় উৎসাহিত করেছিলেন; সেদিক থেকে বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপালাভের পরোক্ষ আদি সহায়করূপে তাঁকেই মনে করি, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আরো বেশি কৃতজ্ঞ বিদ্যার্থি-আশ্রমের স্থাপয়িতা ও তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী নির্বেদানন্দজীর কাছে। এখানে এসে তাঁর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সম্বন্ধে বহু কথা শুনতে পাই। গভীর মনোযোগ সহকারে সেসব শুনতাম; বলা যায়, গোগ্রাসে গিলতাম। এখান থেকেই বেলুড় মঠে যাওয়া-আসা এবং উৎসবাদিতে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করা শুরু হলো। আর পরম সৌভাগ্য এল একদিন অযাচিতভাবে—এই আশ্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সন্ন্যাসি-সন্তানকে দর্শন করলাম, তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর পাদস্পর্শ করে ধন্য হলাম। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সে-দিন বিদ্যার্থি-আশ্রমে এসেছিলেন।

আশ্রমে তখন ছোট্ট একটা ঠাকুরঘর ছিল। পাকা দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে, টিনের ছাউনি—বাংলো ধরনের, উত্তর ও দক্ষিণে গোটা ঘরের দৈর্ঘ্য-জোড়া প্রশস্ত বারান্দা। দু-দিকের বারান্দার দিকেই ওঠার সিঁড়ি এবং ঘরে ঢোকার দরজা। উত্তরের সিঁড়ির ওপর মাধবীলতার গেট। আমার চোখে এই ঠাকুরঘরটি অপূর্ব সুন্দর লাগত। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী আশ্রমে এসে প্রথমে ঠাকুরঘরে গেলেন। দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলেন। ঘরে ঢোকার ওদিককার দরজার মাথায় একটি ছবি টাঙানো ছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে যে-ছবিটি দেখা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশাইকে একদিন যে-ছবিটি এনে দেখাতে বলেছিলেন—পাখি ডিমে তা দিচ্ছে, চক্ষু ফ্যালফেলে, বাইরে তাকিয়ে আছে কিন্তু সারা মন ডিমের দিকে। যোগীর চক্ষুর উপমারূপে এটি বলেছিলেন। বিজ্ঞানানন্দজী বারান্দায় উঠে, বহুক্ষণ নিজের বড় বড় চোখদুটি মেলে স্থিরদৃষ্টিতে ছবিটির দিকে চেয়ে

রইলেন। তার আগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের এই অংশটি আমার পড়া ছিল, আমি বিজ্ঞানানন্দজীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম একদৃষ্টে—যোগীর চক্ষু কীরকম, তা তখন ধারণা করার শক্তি যতটুকু ছিল, তা দিয়ে তাঁর চোখ দেখে ধারণা করার চেষ্টা করলাম। তারপর ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করে, পাশেই যে-চালাঘরটি ছিল, তিনি তার ভিতর এসে বসলেন। ঘরের ভিতর আগে থেকেই টেবিল-চেয়ার সাজানো ছিল। কিছু জলযোগ করলেন, আর হাসিঠাট্টা করতে লাগলেন আমাদের (ছেলেদের) সঙ্গে। একটি ছেলেকে দেখে বললেন, ‘‘চেনা লোক মনে হচ্ছে!’’ নির্বেদানন্দজী সবিনয়ে বললেন, “চেনা লোক এখানে আরো অনেক আছে।” আশ্রমটি তখন দমদম এরোড্রোমের একেবারে সংলগ্ন এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে থাকায় দক্ষিণদিক ফাঁকা ছিল, দখিনা হাওয়ার প্রাচুর্য ছিল আশ্রমে। একটু জোরেই হাওয়া বইছিল তখন। আমার একজন বন্ধু ছিল—বয়সেও খুব ছেলেমানুষ এবং একটু রোগা। তাকে বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, ‘‘খুঁটিটা আঁকড়ে ধরো, হাওয়া তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।’’ একটা বাঁশের খুঁটির পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রথম দর্শন।

তান্ত্রিক-বংশের ছেলে ছিলাম। মা-কালীর ওপর ছেলেবেলা থেকেই টান ছিল, ছেলেবেলায় কয়েক বার কালীপুজোর দিন মা-কালীর ছোট্টমূর্তি নিজেই গড়ে পুজো করেছি—অবশ্য খেলার পুজো। কাজেই আশ্রমে এসে নির্বেদানন্দজীকে দেখে মুগ্ধ হলেও এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রতিটি কথা আক্ষরিক অর্থে সত্য—এই বিশ্বাস শ্রীভগবান কৃপা করে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দিলেও আরতির গান গাওয়ার সময় প্রথম প্রথম ‘অবতারবরিষ্ঠায়’ জায়গাটা গাইতাম না, চুপ করে থাকতাম। মনে হতো, এটা বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু, অতি শীঘ্র সে কু-ভাব মন থেকে মুছে দিলেন। মঠে দীক্ষা পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হলো, বিশেষ করে বিজ্ঞানানন্দজীকে এবং পরে অখণ্ডানন্দজী ও অভেদানন্দজীকে দর্শন করার পর। সন্দেহ-দোলায় দুলে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় কাটালাম অনেক দিন; কারণ তখন মাথায় ছিল, কুলগুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়, অন্যত্র নিতে নেই। অথচ মন ব্যাকুল হয়ে চাইছে ঠাকুরের কোনো সন্তানের কাছ থেকে দীক্ষা পেতে। এই ব্যাকুলতার আরো একটা কারণ ছিল। এখানেই একদিন শুনেছিলাম—নির্বেদানন্দজী প্রসঙ্গক্রমে ছেলেদের একবার বলেছিলেন যে, ঠাকুরের সন্তানদের কাছে দীক্ষা পেলেই মুক্তিলাভ হবে। শুনে একজন ছাত্র বলেছিলেন, ‘‘মুক্তি কী এত সহজ কথা! দু-পয়সা দিয়ে খেয়া পার হয়ে মঠে গিয়ে দীক্ষা নিলাম, আর মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল!’’ উত্তরে নির্বেদানন্দজী

বলেছিলেন, "এখন সত্যিই এত সোজা। কিন্তু কিছুকাল পরে মাথা খুঁড়লেও আর এ-জিনিস পাবে না।" নির্বেদানন্দজীর মুখেই অন্যসময় শুনেছিলাম, তুরীয়ানন্দজীকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "উপনিষদে আছে—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। তা, ঠাকুরের সন্তানরা যাদের কৃপা করছেন, তাদের তাঁরই বরণ করা হচ্ছে তো?" তুরীয়ানন্দজী উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ।"

মানসিক যন্ত্রণা যখন তীব্রতম হয়ে উঠেছে, তখন একদিন নির্বেদানন্দজী আমায় ডেকে বললেন, "এর আগে কাউকে নিজে থেকে দীক্ষা নেওয়ার কথা বলিনি; কিন্তু তোকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। দীক্ষাটা নিয়ে নে, দেরি করিস না। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে দু-জন এখনো রয়েছেন (অভেদানন্দজী পৃথক মঠে থাকতেন বলেই বোধ হয় দু-জন বললেন)—এঁদের মধ্যে যাঁকে ভাল লাগে তাঁর কাছে দীক্ষাটা নিয়ে নে।" তখন সব খুলে বললাম। শুনে হেসে বললেন, "ওটা কোনো বাধাই নয়।"

এর আগে একদিন বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, অখণ্ডানন্দজী এসেছেন শুনে। ঘরে একা বসেছিলেন তিনি। প্রণাম করে মনে মনে তাঁর কাছে মানসিক যন্ত্রণার প্রতিকার করে দেওয়ার প্রার্থনাও জানিয়েছিলাম। প্রণাম করে ফিরে যাওয়ার সময় দরজার কাছে এসে আবার ঘুরে তাঁর দিকে তাকালাম, আবার মনে মনে প্রার্থনা জানালাম—'আপনার ভেতর তো ঠাকুরই রয়েছেন, আপনি তো আমার মনের কথা সবই টের পাচ্ছেন, কৃপা করে একটা ব্যবস্থা করছেন না কেন?' সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার দিকে চোখ তুললেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে—আমিও স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে। প্রায় মিনিট দশেক হবে। তারপর স্পষ্ট দেখলাম, পাতলা কুয়াশার মতো একটা জ্যোতির ধারা তাঁর চোখ থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে স্পর্শ করছে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর থেমে গেল। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন, মুখে কিছুই বললেন না। হতাশ হলেও আনন্দ নিয়েই ফিরে এসেছিলাম সে-দিন।

এই ঘটনার পর দীক্ষা নিয়ে নির্বেদানন্দজীর সঙ্গে পূর্বোক্ত কথা হয়। তাই ঠিক করেছিলাম, অখণ্ডানন্দজীর কাছেই দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাব। কিন্তু তা জানাবার আগেই তিনি দেহরক্ষা করলেন। মন তখন প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠল—বিজ্ঞানানন্দজীর মঠে আসার প্রতীক্ষায় রইলাম। শেষে একদিন তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হলাম। সব থেকে বেশি আনন্দ হলো আর একটি ঘটনায়। প্রথম যখন বিদ্যার্থি-আশ্রমে আসি, আরতির গান ও সকালের ভজন শেষ হওয়ার পরই আসন ছেড়ে উঠে পড়তাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (তখনো তাঁর

সন্ন্যাস হয়নি) তখন ওখানকার কর্মী; ভাল গাইতে পারতেন বলে তিনিই ভজন পরিচালনা করতেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন, "আসনে কি ছারপোকা আছে? ভজন শেষ হতে না হতেই তিড়িং করে উঠে পড় যে!" ভেবে পেলাম না, বসে থেকে করবটা কী? মনে তখন অনেক বাজে চিন্তা উঠত। ঠাকুরঘরে এমনি বসে থাকলে যদি সেসব চিন্তা ওঠে, খুবই খারাপ হবে সেটা। দেখতাম, যেসব ছেলেরা দীক্ষিত, তাঁরা বসে জপ করছেন। আমার তো তখন দীক্ষা হয়নি, বসে থেকে করবটা কী? যাহোক, তার পরদিন থেকে নিজেই মনে মনে একটা মন্ত্র ঠিক করে নিয়ে তা-ই জপ করতাম কিছুক্ষণ। বিজ্ঞানানন্দজী দীক্ষাদানকালে প্রথমেই যখন সেই মন্ত্রটি বললেন, আনন্দে মন-প্রাণ ভরে গেল; বলা যায়, মন-প্রাণ ভরিয়ে দিয়ে আনন্দ উপচে পড়ল। দীক্ষার পর প্রার্থনাদি শিখিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, "ব্যস, ছুটি!"

আমার সঙ্গে আমার চেয়ে একটু বেশি বয়সের আর একটি ছেলের দীক্ষা হয়েছিল, নাম জানি না; পরে আর কখনো তাঁকে দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। আমি তো বোকা—দীক্ষা শেষ হওয়ার পর আনন্দে মশগুল হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে বসে আছি—কিছু যে বলতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়, সে জ্ঞানগম্যি ছিল না। সঙ্গীটি কিন্তু খুব তুখোড়—সে মহারাজকে বলল, "আশীর্বাদ করুন, যেন ব্রহ্মচর্যজীবন যাপন করতে পারি।" তিনি আশীর্বাদ করলেন। আমার তখন হুঁশ হলো, আমি বললাম, "আমাকেও আশীর্বাদ করুন!" প্রাণখোলা হাসি হেসে আশীর্বাদ করে বললেন, "প্রাণখুলে আশীর্বাদ করছি।" বললেন, "সত্য ও ব্রহ্মচর্য—এ দুটি জিনিস ঠাকুর খুব ভালবাসতেন।"

ফাঁকি দেওয়ার অনেকরকম ফন্দি তখন মাথায় ঘুরত—সব কাজেই। দীক্ষাদানের পর মহারাজ সকাল-সন্ধ্যায় জপ করার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, "কাপড় ছেড়ে জপ করবে।" ভাবলাম, এ তো এক হাঙ্গামার কথা হলো। কী দুষ্টু মন ছিল, ভাবলাম এ আদেশটা কাটিয়ে নিতে হবে। এই দুষ্টুবুদ্ধি নিয়ে কয়েক দিন পরে মঠে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "সব অবস্থায়, সবসময় জপ করা যাবে তো?" বললেন, "হ্যাঁ যাবে। ...চলতে চলতেও করা যাবে, ট্রেনে যেতে যেতেও করা যাবে।" তারপরই বললাম, "তাহলে সকাল-সন্ধ্যায় কাপড় না ছেড়ে করা চলে না?" পরিষ্কারভাবে 'না' বলে দিলেন। আরো কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কাপড় না ছাড়ার কথাটা আরো দু-এক বার তুললাম। কিন্তু আমার চপলতায় তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন না, ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তির প্রশ্রয়ও দিলেন না।

এরপর একবার মাথায় আর একটা চিন্তা ঢুকল। গুরু-শিষ্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক থাকে; ইনি আমাদের দীক্ষা তো দিলেন, কিন্তু আমাদের শিষ্য বলে মনে রেখেছেন তো? যাই আর প্রণাম করে চলে আসি, শিষ্য বলে মনে রেখেছেন— এমন কোনো লক্ষণই তো দেখি না; তখন দীর্ঘ কিছুকাল ধরে, যে ক-দিন তিনি মঠে ছিলেন, কলেজ যাওয়ার নাম করে সোজা মঠে চলে আসতাম। আশ্রমে ৮.৩০-৯টায় ভরপেট খেয়ে এলেও মঠে এসে নিত্য দুপুরে আবার প্রসাদ পেতাম—সেটা অবশ্য চালতার চাটনি-প্রসাদের লোভে। মিশন অফিসের সামনে একটা চালতাগাছ ছিল, খুব ফলত। সারাদিন মঠে কাটিয়ে আবার ভাল ছেলের মতো যথাসময়ে আশ্রমের বাসেই আশ্রমে ফিরতাম—যেন কলেজ থেকেই ফিরছি। কারণ মঠের একজন প্রাচীন সাধু মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, "ঠাকুরের সন্তানদের আগে আগে যা দেখেছি, যখন কৃপাবিতরণের কোনো বাছ-বিচারই থাকে না, তার স্বল্পকাল পরেই তাঁরা দেহত্যাগ করে চলে যান। এঁর এখন যা অবস্থা দেখছি, সেরকমই সন্দেহ হচ্ছে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, এইসময় করে নিয়ো। যদি কোনো সাধ থাকে এইসময় মিটিয়ে নিয়ো।" তখন জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছু থাকত না, মনে কোনো সংশয়ই খুঁজে পেতাম না। তবু দু-একটা যা ছোটখাটো প্রশ্ন জাগত, পূর্বোক্ত সাধুটির কথা অগ্রাহ্য করেই তা জিজ্ঞাসা করতাম না—কারণ শুনেছিলাম, তাঁর শরীর তখন খুব খারাপ—কথা বলতে যদি কষ্ট হয়! সাধ বলতে ঐ একটাই ছিল, নিত্য গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসা—তাঁকে দেখে আসা—সেটা মিটিয়ে নিতাম। যাহোক, নিত্য যাতায়াত করছি, কথা কিছু না বললেও প্রণাম তো করছি, কিন্তু তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত বলে চিনতে পারছেন, এমন লক্ষণ তো এর মধ্যে একদিনও দেখলাম না! মনটা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল। সোজাসুজি জিজ্ঞাসাও করা যায় না। একদিন একটা তুক করলাম, সন্দেহ-নিরসনের জন্য। (মনে রাখবেন, আপনারা একটি কিশোর ছেলের স্মৃতিকথা পড়ছেন—যার মনে অনেক আজে-বাজে প্রশ্ন জাগে, যার মন এসব বিষয়ে তখন সম্পূর্ণ অপরিণত।) ভাবলাম, 'আমার ডাকনাম তো উনি জানেন না। সেই নাম ধরে নিজে থেকে এর মধ্যে যদি আমায় একবারও ডাকেন, তাহলে বুঝব ভোলেননি।' এর দু-এক দিন পরই বিকালে বিজ্ঞানানন্দজীর ঘরে প্রণাম করতে ঢুকেছি, আমি আর আমাদের আশ্রমেরই আর একটি ছেলে (সে-ও বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত)—ঢোকামাত্র তিনি একগাল হেসে বললেন, "এই যে...!" আমার ডাকনামটিই বললেন! প্রাণ ভরে গেল। শুধু তা-ই নয়, সে-দিন ঘণ্টাখানেক ধরে অতি পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের দু-জনের সঙ্গে

রঙ্গরসিকতা করে হাসিয়ে হাসিয়ে পেটে ব্যথা ধরিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যে কোনো ব্যবধান আছে, সেকথা একেবারে ভুলিয়ে দিলেন—যেন তিনি তখন আমাদের সমবয়সি ও সহপাঠী অতি অন্তরঙ্গ একজন বন্ধু! শেষে বললেন, "স্টুডেন্টস্ হোমের মাছ খেতে হবে। কাল আনতে পারবে?" বিদ্যার্থি-আশ্রমকেই ইংরেজিতে 'স্টুডেন্টস্ হোম' বলা হয়। দু-জনেই একসঙ্গে উত্তর দিলাম, "পারব মহারাজ!" তিনি আমার নাম করে বললেন, "ও পারবে।" আমাকেই আনতে আদেশ করলেন। আনন্দের মাত্রা এতে আরো বেড়ে গেল। আশ্রমে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হলো! নির্বেদানন্দজীকে সব বললাম। তিনি শুনে তৎক্ষণাৎ জাল ফেলিয়ে একটা মাঝারি গোছের পোনামাছ ধরিয়ে জিইয়ে রাখালেন, যাতে সকালে নিয়ে যেতে দেরি না হয়। আশ্রমে ঝিল, পুকুর দুই-ই ছিল। আর একটু দুধও সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। আশ্রমে গোশালাও ছিল।

পরদিন মহা উৎসাহে মাছ আর দুধ নিয়ে মঠে হাজির হলাম। মহারাজের ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখালাম। দেখে আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "খুব ভাল মাছ।" শ্রীনাথ মহারাজের কাছে দিতে বললেন। তিনিই তখন মহারাজের খাবার রান্না করতেন, ঠাকুরকে ভোগ দেওয়ার পর মহারাজকে প্রসাদরূপে এনে দিতেন। তিনি মাছ ও দুধ দুই-ই রাখলেন। দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর শ্রীনাথ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বিজ্ঞান মহারাজ মাছ খেয়েছেন?" (তখন 'গুরু মহারাজ', 'প্রেসিডেন্ট মহারাজ', 'বড় মহারাজ', 'ছোট মহারাজ'—এসব কথার সৃষ্টিই হয়নি, সবাইকে নাম ধরেই ডাকা হতো; সাধুরাও বলতেন, আমরাও বলতাম। 'গুরু মহারাজ' বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরকেই বোঝাত।) শ্রীনাথ মহারাজ বললেন, "না, আজ শরীর খুব খারাপ, কেবল একটু লেবুর রস খেয়েছেন।" মনটা দমে গেল। কাল কত উৎসাহ নিয়ে মাছ আনতে বললেন, আজ সকালেও দেখে কত আনন্দ করলেন, অথচ খাওয়া হলো না! যাহোক, জানি যে খাননি, তবু বিকালে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, মাছ খেয়েছেন?" সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, খেয়েছি!" শুনে সব গুলিয়ে গেল—এঁরা তো মিছে কথা বলেন না! অথচ শুনলাম, লেবুর রস ছাড়া কিছু খাননি; এদিকে বলছেন—'হ্যাঁ খেয়েছি!' কী হলো ব্যাপারটা? হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনে উদ্ভাসিত হলো, তাহলে যা ভাবি, তা কি আক্ষরিক অর্থেই সত্য—ঠাকুর ও ইনি এক? ঠাকুরের খাওয়াকেই 'আমি খেয়েছি' বলছেন! চিন্তাটা সম্পূর্ণও হয়নি, হেসে যা বললেন, তাতে চিরতরে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের একত্ববোধ গভীরভাবে মনে গেঁথে গেল। শুধু তাঁর সম্বন্ধেই নয়, তখন থেকে মনে যে বিশ্বাস আগে

ভাসা-ভাসা ছিল, তা-ই গভীরভাবে দাগ কেটে বসল—ঠাকুর ও তাঁর সব সন্তানই অভেদ। এসময়েই প্রথমে বলেছিলেন, ''আমাদের নাম করে আনলেই আমাদের খাওয়া হয়।''

প্রসঙ্গত বলছি, এই যে ছেলেমানুষি ভাব, 'আমাকে মনে রেখেছেন তো?'—এ শুধু আমার একার হয়নি, অন্তত আরেক জনের কথা জানি—তিনি হলেন স্বামী সন্তোষানন্দ। একদিন তাঁকে আমার এই সন্দেহ ও তা নিরসনের কথা বলেছিলাম। তিনি হেসে বললেন, ''ছেলেবেলায় ওসব মনে হয়।'' তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। বললেন, ''দীক্ষার পর আমারও ঐরকম সন্দেহ হয়েছিল—'মা তাঁর শিষ্য বলে আমাকে মনে রেখেছেন তো?' কোনো লক্ষণই দেখি না, জিজ্ঞাসাও করতে পারি না সোজাসুজি; শেষে ঠিক করলাম, মাকে গিয়ে প্রণাম করার পর নিজেই বলব, 'মা, আমাকে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন—ঠিক আছে তো?' গিয়ে প্রণাম করার পর যেই সেকথা বলতে গেছি, কেবল 'মা!' কথাটিমাত্র উচ্চারণ করার পরই মা নিজেই মন্ত্রটি বলে বললেন, 'এই মন্ত্র দিয়েছিলাম তো? ঠিক আছে বাবা!'''

আর একদিন প্রণাম করে ওঠার পর বিজ্ঞানানন্দজী নিজেই আমাকে বললেন, ''ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ, আর মা হচ্ছেন চিন্তাস্বরূপিণী।'' আগেই বলেছি, মনে তখন কোনো সংশয় জাগত না, বিশেষ করে এঁদের সান্নিধ্যে যখন থাকতাম। সেজন্য কথাটির অর্থ নিয়ে তাঁকে কোনো প্রশ্ন করার চিন্তাও মনে জাগেনি। তখন মনে হয়েছিল—ঠাকুর চৈতন্যস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম, আর মা চিন্তাস্বরূপিণী অর্থাৎ সেই ব্রহ্মেরই শক্তি এবং তাঁর কথামতোই (ঠাকুরেরও কথামতো) দু-জন অভেদ। আমরা তখন উপনিষদে পড়েছি, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের শক্তিসমন্বিতরূপে, সগুণব্রহ্মরূপে প্রথম প্রকাশ 'চিন্তাস্বরূপ' হয়েই—''একোঽহং, বহু স্যাম্।'' তা থেকেই পরে জগতের সবকিছুর সৃষ্টি। আশ্রমে তখন ছেলেদের নিয়ে উপনিষদের ক্লাস হতো। নির্বেদানন্দজী তখন আমাদের নিয়ে এসব বিষয়ে খুবই আলোচনা করতেন। অবশ্য এখনো এর অর্থ তা-ই ভাবি।

বেলুড় মঠের মন্দিরের ভিত খোঁড়া থেকে শুরু করে ঠাকুরকে মন্দিরে বসানো পর্যন্ত সবই আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখেছি। একদিন মঠে গিয়েছি, বোধ হয় সকালবেলা। গিয়ে দেখি বিজ্ঞানানন্দজী মন্দিরের চারপাশ ঘুরে-দেখে বেড়াচ্ছেন। তখন দেওয়াল সবে মাটির ওপর পর্যন্ত উঠেছে, মন্দিরের চারপাশে শালবল্লার অরণ্য মাথা তুলতে শুরু করেছে। তাঁকে বেড়াতে দেখে আমি এবং আরো কয়েকটি ছেলে পিছু নিলাম। সবটা ঘুরে দেখে তিনি মিশন অফিসের সামনের

চাতালে চেয়ারে বসলেন। সামনে টেবিলের ওপর মন্দিরের ছোট্ট মডেল। আমরা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সব দেখতে লাগলাম। মাটির নিচেও ঘর রয়েছে দেখে, আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাটির নিচের এ-ঘরে কী হবে?" তিনি কৌতুকোজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চুপি চুপি বললেন (যেন কোনো গুপ্তকথা বলছেন), "ওখানে ঢুকো না।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে-দিন বিজ্ঞানানন্দজী পুরানো মন্দির থেকে এনে নূতন মন্দিরে বসান, সে-দিনটি বিপুল আনন্দে কেটেছে—তার বিশদ বর্ণনা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীগ্রন্থে গ্রন্থটির লেখক অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন; এখানে তার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সেসময় আট-দশ দিন আমরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে কয়েক জন দিন-রাত মঠেই থাকতাম। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরদিন স্বামী শান্তানন্দজী আমাকে মন্দিরের সামনের মাঠে দেখতে পেয়ে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন—তিনি তখন মিশন-অফিসের ওপরে ছোট একটা ঘরে থাকতেন। বললেন, "আজ এইমাত্র বিজ্ঞান মহারাজ নিজের ও ঠাকুরের সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন, যা সাধারণত বলেন না। তুমি চলো, আমি বলব, সেগুলো লিখে দেবে।" তাঁর সঙ্গে গেলাম, ফুলস্ক্যাপ কাগজে ঠাসা লাইনে প্রায় আট পৃষ্ঠার মতো লিখলাম। আগেই বলেছি, তখন এঁদের কাছে এলেই আনন্দে মন ভরে যেত, কোনো প্রশ্ন বা সংশয় জাগত না। তাই এঁদের কথা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতাম না—কেবল যেগুলো আমার নিজের মনে দাগ কেটে যেত, সেগুলো ছাড়া আর কিছু মনে রাখার চেষ্টাও করতাম না। এই লেখা কাগজগুলো পরে হারিয়ে যায়। তারপর শান্তানন্দজীর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমার কিছু মনে আছে?" বেকুবের মতো উত্তর দিতে হয়েছে, "না মহারাজ।"

এইসময়ই বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠে থাকাকালীন একদিন, কিংবা এর আগে কোনো একদিন, ঠিক মনে নেই, তাঁকে প্রণাম করে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সামান্য কিছু কথাবার্তাও বোধ হয় হয়েছিল। ঘরে আর কেউ ছিল না; হঠাৎ দেখি, বড় বড় চোখদুটি যেন আরো বড় করে তিনি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এর আগে যেমন একবার অখণ্ডানন্দজীর চোখে দেখেছিলাম, তেমনি স্পষ্ট দেখলাম, একইরকম পাতলা কুয়াশার মতো জ্যোতি তাঁর চোখ থেকে বার হয়ে আমাকে স্পর্শ করে রইল কিছুক্ষণ।

প্রসঙ্গত এখন, যখন জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি এবং যে

দু-জন সন্ন্যাসীর কথা বলব, তাঁরা দু-জনেই দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছেন—বলতে বাধা নেই, ঠিক একই ঘটনা, জীবনে আরো তিন বার দেখেছি—কাশীতে মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের চোখে, স্বামী নির্বেদানন্দজীর দেহত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যায় তাঁর চোখে এবং শেষবার কাশীতে স্বামী প্রেমেশানন্দজীর চোখে—যখন বিশেষ কোনো কারণে তিনি প্রাণখুলে আমাকে আশীর্বাদ করছিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর পাদস্পর্শ শেষবার করি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরার ভিতর—যেবার তিনি এলাহাবাদ গিয়ে আর ফেরেননি।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর দেহত্যাগ-সংবাদ পাই। তখন শুনে এমন একটা কিছু অভাববোধ হয়নি। এরপর যে-দিন প্রথম মঠে গেলাম, অভাববোধ করলাম—ভিতরটা সত্যিই তাঁর অভাববোধে হাহাকার করে উঠল।

(২)

শোনা কথারও অনেক কিছুই বিজ্ঞানানন্দজীর একটি জীবনীতে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থকার। অবশ্য কোনো ক্ষেত্রেই আমার নাম দেননি, প্রচ্ছন্ন রেখেছেন। নতুন কথা দু-চারটি যা জানি, তা-ই লিখছি।

বিজ্ঞানানন্দজী স্বভাবত খুব গম্ভীর হয়ে থাকলেও মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে যেন তাদের স্তরেই নেমে এসে কেমন হাসিঠাট্টা করতেন, সেকথা তো আগেই বলেছি। নির্বেদানন্দজীর মুখে শোনা, বড়দের সঙ্গে তাঁর রসিকতার একটা উদাহরণ দিয়ে এপ্রসঙ্গ আরম্ভ করি।

বিদ্যার্থি-আশ্রমে বিজ্ঞানানন্দজী কয়েক বার গিয়েছেন। দমদমে যখন আশ্রম, তখন সেখানে দু-বার গিয়েছিলেন। শেষবারে আমরা ছিলাম, আগে বলেছি। তার আগের বার তাঁর এরোপ্লেনে চড়ার ‘শখ’ হয়েছিল। দমদম এরোড্রোমে এসে প্লেনে চড়ে কিছুক্ষণ আকাশে উড়ে, ফেরার পথে বিদ্যার্থি-আশ্রমে এসেছিলেন। সেসময় দশ টাকা দিলে কিছুক্ষণ প্লেনে উঠে ঘোরার ব্যবস্থা ছিল—বোধ হয় ‘বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব’ সে ব্যবস্থা করত। সেবারেই আশ্রমে হাঁস দেখে এসেছিলেন। ছেলেদের ডিম খাওয়ানোর জন্য হাঁস রাখা হয়েছিল।

এরপর অখণ্ডানন্দজীও একবার দমদমে বিদ্যার্থি-আশ্রমে আসেন। তিনি ডিম খাওয়া পছন্দ করতেন না। হাঁস দেখে এবং সেগুলি আশ্রমের জেনে নির্বেদানন্দজীকে বলেন, ‘‘এগুলো রেখো না।’’ তা-ই করা হয়।

তারপর একবার বিজ্ঞানানন্দজী মঠে এসেছেন। নির্বেদানন্দজীও গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। একথা-সেকথার পর বিজ্ঞানানন্দজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সেই হাঁসগুলো ডিম দিচ্ছে তো?" অখণ্ডানন্দজীর আদেশের কথা জানিয়ে নির্বেদানন্দজী বললেন, "সেগুলো বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।" বিজ্ঞানানন্দজী তৎক্ষণাৎ বললেন, "বেশ তো, মুরগি রাখুন। তিনি হাঁস রাখতে নিষেধ করেছেন, মুরগি রাখতে তো নিষেধ করেননি!"

স্বামী গঙ্গেশানন্দজীর কাছে শুনেছি, তিনি একবার বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে গাড়িতে আসতে আসতে (যতদূর মনে হচ্ছে, হাওড়া স্টেশন থেকে বেলুড় মঠে আসার সময়) পথে তাঁকে বলেন, "মহারাজ, ঠাকুরের অনেক সন্তানকে দেখলাম, আপনাকেও দেখলাম, সঙ্গ-সেবাদিও করলাম; কিন্তু কই, কিছুই তো হলো না!" শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার মুখে একথা শুনব, আশা করিনি। ভগবান যখন পার্ষদদের নিয়ে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হন, তাঁদের লীলা দেবতারাও দেখতে আসেন। ঠাকুরের এতজন সন্তানকে যে দেখেছ, এতেই একটা জীবনের কাজ হয়ে গেছে।"

কয়েক জন প্রাচীন সাধুর কাছে, গৃহি-ভক্তদের কাছেও—কয়েকটি ঘটনা একইভাবে শুনেছি—ভাষায় সামান্য তারতম্য মাত্র ছিল। এরূপ দুটি ঘটনা এখানে বলে এপ্রসঙ্গ শেষ করছি।

স্বামী শিবানন্দজীর একজন গৃহি-মন্ত্রশিষ্য তাঁর দেহত্যাগের পর মনে খুব আঘাত পান। কয়েক দিন অস্বস্তিতে কাটাবার পর তিনি ঠিক করলেন এলাহাবাদে গিয়ে বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গ করবেন—ভিতরটা খানিকটা জুড়োবে। এলাহাবাদে তাঁর বাড়ি ছিল। সেখানেই গেলেন। বিজ্ঞানানন্দজীর নির্দেশমতো নিত্য বিকাল পাঁচটায় তাঁর কাছে যান, কিছুক্ষণ কাটিয়ে শান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরেন। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল। একদিন যেতে দশ মিনিট দেরি হয়েছে, ঘরে ঢোকার আগে দরজার কাছে যেতেই বিজ্ঞানানন্দজী বলে উঠলেন, "গেট আউট! দশ মিনিট ধরে আপনি আমাকে আপনার কথা ভাবিয়েছেন!" শুনে ভক্তটির মনে খুব লাগল, খুব অভিমানও হলো; ফিরে গেলেন। ভাবলেন—'ভিতরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেলেও আর আসছি না।' করলেনও তা-ই।

তিন দিন পরে বিকালে দ্বারে করাঘাত শুনে দরজা খুলে দেখেন, বিজ্ঞানানন্দজী বাইরে দাঁড়িয়ে; অসুস্থ শরীর নিয়ে হেঁটে এসেছেন। দরজা খোলার পরই ভক্তটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সাধুর ওপর কি রাগ করতে আছে,

বাবা?'' এ অভাবিত করুণায় চোখের জলে ভক্তটির সব অভিমান ধুয়ে গেল, আনন্দে বুক ভরে উঠল।

অন্য ঘটনাটি আসামের এক দম্পতিকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেরই দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। যাওয়ার ঠিক আগে স্ত্রী জ্বরে পড়লেন। স্বামী অপেক্ষা করলেন না, যথাসময়ে দীক্ষা নেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন, ''ভাবনার কী আছে, পরের বারে হবে।'' কিন্তু স্ত্রী সে-সুযোগ আর পেলেন না—তার আগেই বিজ্ঞানানন্দজী দেহত্যাগ করলেন। সংবাদ পেয়ে স্ত্রী আহার ত্যাগ করে কয়েক দিন ধরে কেবল কাঁদতে লাগলেন। অনেক বোঝানো হলো, খাওয়ানোর চেষ্টা করা হলো, সব বৃথা! স্বামী ভাবলেন—'এ আর বাঁচবে না। না খেয়ে এভাবে একটানা কেঁদে চললে মানুষ ক-দিন বাঁচতে পারে!' কয়েক দিন পরে অফিস থেকে ফিরে দেখেন—স্ত্রী বসে আছেন, খুব হাসিখুশি ভাব, মুখ আনন্দোজ্জ্বল। জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী ব্যাপার?'' স্ত্রী বললেন, ''উনি (বিজ্ঞানানন্দজী) আজ এখানে সশরীরে এসে আমায় দীক্ষা দিয়ে গেছেন।''

(৩)

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় যে-ঘটনাটি বহুবার আমাকে বলেছিলেন, লিখেও জানিয়েছিলেন, প্রথমে সেটি বলছি।

বিজয়লালবাবুর মা বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা। প্রথম বয়সে বিজয়লালবাবু ধর্ম-কর্মে বা দীক্ষাদিতে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তাঁর মা-ই একরকম জোর করে তাঁকে দীক্ষার জন্য বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে নিয়ে যান। কেবল মায়ের কথা রক্ষার জন্যই তিনি গিয়েছিলেন, দীক্ষায় নিজের কোনো বিশ্বাস ছিল না। দীক্ষার সময় আসনে বসার পর বিজয়লালবাবুর মনে হলো—'আমার যে নিজের বিশ্বাস বা ইচ্ছা নেই, মা-ই জোর করে আমাকে এখানে এনেছেন, একথা এঁকে জানানো দরকার।' যাঁরা বিজয়লালবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন মিশেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি খুব আবেগপ্রবণ ছিলেন। কথা বলতেন প্রায় সবসময়ই আবেগভরে, এমনকী শেষ বয়সেও। তিনি দীক্ষাগ্রহণের পূর্বমুহূর্তে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে নিজের স্বভাবসিদ্ধ আবেগভরা কণ্ঠে বিজ্ঞানানন্দজীকে বললেন, ''দেখুন, ভগবান আর আমার মধ্যে একচুলও ব্যবধান নেই। তাহলে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবার অন্য লোকের (গুরুর) কী প্রয়োজন?''

শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''একথা শুনে মহারাজ কী বললেন?''

বিজয়লালবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "একটিও কথা বললেন না। কেবল স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিলেন।"

বিজয়লালবাবু পরবর্তিকালে বহুবার আমার কাছে এসেছেন। ঠাকুরের কথা, বিজ্ঞান মহারাজের কথা বলতে বলতে বারবার তাঁর চোখ জলে ভরে যেতে দেখেছি। একদিন ঠাকুরের আলোচনা-প্রসঙ্গে ঠাকুরের সেই কথাটি বলেছিলাম, "ভগবানের জন্য কাঁদলে চোখের জলে মনের ময়লা ধুয়ে যায়।" শুনে সে-দিন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একজন ভক্ত-মহিলার। তিনি নামপ্রকাশে অতি কুণ্ঠিতা ও একান্ত অনিচ্ছুক বলে নাম প্রকাশ করলাম না। তাছাড়া এখন নাম প্রকাশ না করাই ভাল। তাঁর লিখিত কথাই এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি—কেবল ব্যাকরণ-সম্মত করার জন্য ভাষায় যেটুকু প্রয়োজন, স্থানে স্থানে সেটুকু মাত্র সংশোধন করে দিলাম—তাও বিজ্ঞানানন্দজীর কথা যেগুলি, সে-অংশগুলির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করলাম না—কেবল ক্রিয়াপদগুলি কোথাও চলিতভাষায়, কোথাও সাধুভাষায় ছিল, সেগুলি মাত্র একরকম করে দিলাম ঃ

"স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কৃপা ও করুণার কথা আমার মতো মূর্খ সন্তানের বলার কিছু নেই। তিনি আমায় কৃপা করে শ্রীচরণে আশ্রয় দেবেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর চরণে আশ্রয় পাওয়ার ঠিক আগে আমি অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলাম—কী করে দুর্জয় সংসার-বন্ধন কাটাব, তা-ই অনুক্ষণ ভাবছিলাম। আমার জীবন ছিল খুবই দুঃখের। আমি মা-বাপের একান্ত আদরের সন্তান ছিলাম। ন-বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর একুশ দিনের মধ্যেই আমি বিধবা হই। বিবাহিত জীবন যে কী, তার কিছুই বুঝলাম না। এতে বাপ-মা খুব দুঃখ পেলেন। আমার আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ঐ বয়সেও 'বাবা'-কে অর্থাৎ শিবকেই আমি জীবনের একমাত্র সম্বল করেছিলাম। তাঁদের সেই চেষ্টা তাঁর (শিবের) কৃপাতেই ব্যর্থ হলো। তাতে তাঁরা আমার ওপর বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তখন থেকেই মাঝে মাঝে শিব ও যিশুখ্রিস্টের দর্শন পেতে থাকায় আমি আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতাম; সেজন্যই বিবাহের প্রস্তাব আমার কাছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। তখন আমি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম। শ্বশুররা ভক্তলোক ছিলেন; তাঁদের বাড়িতে ন-বছর বয়সেই কুলগুরুর কাছে দীক্ষা পাই। তাঁরা আমার ধর্মাচরণে কোনোদিন বাধা দেননি; কিন্তু সাংসারিক বিষয়ে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়েছেন। সবই নীরবে সহ্য করেছি।

"দৈবক্রমে বত্রিশ বছর বয়সে তারকেশ্বর গিয়ে সেখানে বামাক্ষ্যাপার শিষ্য তারাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ পাই। তিনি বলেছিলেন, 'মা, তুমি বেড়াজালে আগুনে-পোড়া রুটি হচ্ছ। তোমার শান্তি মিলবে, তিন মাসের মধ্যেই সদ্‌গুরুর দর্শন পাবে ও জীবনের জ্বালা জুড়োবে। এক বছরের মধ্যে ঘর থেকে চলে যেতে হবে ও সংসারবন্ধন কেটে যাবে।' এরপরই আমার বত্রিশ বছর বয়সেই একদিন স্বপ্নে[২] একজন দিব্য মহাপুরুষের দর্শন পাই; তিনি আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে বলেন, 'আমি বেলুড় মঠে এসেছি, তুমি কাল এসো।' আমি আগে কোনোদিন বেলুড় মঠে যাইনি, দেখিনি। পরদিন ভোরে পাড়ার এক ভদ্রলোক (মহাপুরুষ মহারাজের একজন মন্ত্রশিষ্য) ও আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বেলুড় মঠে গেলাম। একখানা নতুন থানধুতি ও চারটে টাকা সঙ্গে নিলাম। মঠে গিয়ে ভরত মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দ) সঙ্গে দেখা করে বললাম, 'দীক্ষা নেব।' তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'বলা নেই, লেখা নেই, দীক্ষা নিলেই হলো!' আমি চুপ করে থাকলাম। এমনসময় হঠাৎ বিজ্ঞানানন্দজীর সেবক করমভাই মহারাজ (স্বামী অমোঘানন্দ) ভরত মহারাজের সামনে এসে আমাকে বললেন, 'মহারাজ আপনাকে ওপরে ডাকছেন।' আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওপরে উঠে গেলাম। গিয়ে দেখি—বিজ্ঞানানন্দজী ফুল, ফল, মিষ্টি সাজিয়ে রেখে যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আমাকে বললেন, 'বোসো মা!' আমি ভয়ে এমন হয়ে গেছি যে প্রণাম করতেই ভুলে গেলাম। তিনি আমায় মন্ত্র দিলেন, স্বপ্নে যা বলেছিলেন তা-ই দিলেন; তিন-চার বার বললেন এবং কী করে জপ করতে হয় তা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝেছ মা!' তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম এবং তাঁর মধ্যে জ্যোতির্ময়রূপে শিবমূর্তি দর্শন করলাম। এই দিব্যদর্শনে আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরে এল, দেখি, তাঁর রাতুল চরণ দু-খানি আমার মাথার ওপর। ছেলেবেলা থেকেই আমার একমাত্র ভালবাসার দেবতা ছিলেন শিব; তাই মনে একটু ভয় ছিল, তিনি যদি শিবপূজা করতে নিষেধ করেন! কিন্তু নিজে থেকেই বললেন, 'শিবই একমাত্র জগদ্‌গুরু।' আর প্রথমেই তো নিজের মধ্যে শিবকে দর্শন করিয়ে সেকথাও প্রত্যক্ষ করিয়ে দিলেন। আমার হাতে মিষ্টি দিলেন। বললেন, 'মুখে-চোখে জল দাও, পরে প্রসাদ পেয়ে জপের

---

২ স্বপ্নের কথা সাধারণত উদ্বোধনে প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু প্রবন্ধটিতে ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হলো এই জন্য যে, এখানে এবং পরে দেখা যাবে, তাঁর জীবনে স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থা মাঝে মাঝে একেবারে মিলে গিয়েছে।—সম্পাদক *

* এই সম্পাদকীয় মন্তব্যটি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর। তিনি তখন (জানুয়ারি ১৯৭৮ খ্রিঃ) 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক।—সংযুক্ত সম্পাদক।

মালা নিয়ে আমার কাছে এসো।' ঐ-দিন আমার একার দীক্ষা হয়, ঘরে আর কেউ ছিল না।

"দীক্ষার পরে ১ মাঘ আমি মঠে যাই—শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের আগে। সেবার আমি তাঁর চরণে মাত্র দুটি টাকা দিয়ে প্রণাম করি; কিন্তু তিনি আমায় বললেন, 'টাকা দিয়ে তোমায় প্রণাম করতে হবে না, ও-পথ তোমার নয়।' বললেন, 'ঘড়ির কাঁটার মতো জীবন তৈরি করো। আর, কাউকেও তোষামোদ করবে না।'

"পনেরো দিন পরে আমার মেজো ভাইয়ের দীক্ষা হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসবের পরে আবার একদিন বিজ্ঞানানন্দজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'পুরুষোত্তমে চলে যাও, ঘুরে এসো।' তাঁর কথামতো পুরী গিয়ে আমি তিন মাস ছিলাম। ফিরে এসে শিবরাত্রির পরের দিন প্রসাদ পাওয়ার পর আবার তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই আমাকে বললেন, 'কার হুকুমে এখানে এসেছ?' আমি বললাম, 'সেবক বলেছেন।' তিনি বললেন, 'কে সেবক? আমি কি তোমাকে আদেশ করেছি?' আমি ভয়ে কেঁদে ফেলে বললাম, 'ক্ষমা করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি চিরশান্তি লাভ করো।' ঘরে এক ভদ্রলোক তাঁর চরণসেবা করছিলেন। আমি প্রণাম করে বাইরে এলাম; বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, বিজ্ঞানানন্দজী সেই ভদ্রলোকটিকে বলছেন, 'ও চিরজীবন দুঃখী।'

"১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল বিজ্ঞানানন্দজীর মহাপ্রয়াণ হয়। তিন মাস পরে শ্রাবণ মাসে তিনি আমায় স্বপ্নে আবার দীক্ষা দিয়ে বললেন, 'এটি সন্ন্যাস-মন্ত্র। এই আদি, এই সমাপ্তি।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'গেরুয়া কাপড় পরব না?' তিনি বললেন, 'না।' তারপর বললেন, 'আমাকে দক্ষিণা দাও!' আমি চারটে টাকা দক্ষিণা দিলাম।

"মন তখন আমার খুবই খারাপ হতো এই ভেবে যে, লোকে কত গুরুসেবা করে, আমি তাঁর সেবা কিছুই করতে পারলাম না। তিনি অন্তর্যামী, করুণাময়। একদিন স্বপ্নে দর্শন দিলেন—ঠাকুরঘরের ছোট চেয়ারে বসে বললেন, 'প্রতিদিন এই শিবের ভেতর থেকে তোমার নিত্যসেবা নিচ্ছি; তুমি দুঃখ কোরো না।' তারপর দেখলাম, বিজ্ঞানানন্দজী শিবের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। এই দর্শনের পর আমি বেলুড় মঠে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে যাই। তাঁর কাছে আমার স্বপ্নের সব কথা নিবেদন করি।

"তিনি সব শুনে বললেন, 'এ মন্ত্র কোথায় পেলে?' বললেন, 'তুমি কাশীতে কৈবল্যানন্দজীর কাছে গিয়ে কৌলমতে পূর্ণাভিষেক নাও। এই মন্ত্রের কথা কিছু বলবে না। ...এই কথা-কটি বলে আহুতি দেবে।'

"...তিন দিন ধরে পুজো হয়েছিল। উনি আমায় খুব কৃপা করেছেন, শান্তি দিয়েছেন।

"দীক্ষার পর দু-বছর দীক্ষার কথা কাউকে জানাইনি, ঠাকুরের ফটো লুকিয়ে রাখতাম; রাতে বার করে পুজো করতাম। পরে জনৈকা আত্মীয়া আমার দীক্ষার কথা প্রকাশ করে দেন। তখন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বেলুড় মঠ ও আমার গুরুর নিন্দা করতে লাগলেন। আমি তাঁদের বললাম, 'গুরুনিন্দা সহ্য করব না।' তাতে তাঁরা আমাকে আরো বেশি যন্ত্রণা দিতে লাগলেন। এরপর শীঘ্রই শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে চলে এসে অন্যত্র রয়েছি। আর কখনো সেখানে যাইনি।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৮৩ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

১০ মার্চ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বেলুড় মঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসব হইয়া গেল। ইহার পর মার্টিন কোম্পানি শ্রীমন্দিরের কাজ আরম্ভ করে। প্রায় নব্বই ফুট লম্বা, নব্বই ফুট চওড়া ও ছয় ফুট গভীর মাটি কাটিয়া একটি পুকুর তৈয়ার করা হইল। দুই ফুট অন্তর শালবল্লা পোঁতা হয়, যাহা সাত ইঞ্চি, আট ইঞ্চি, নয় ইঞ্চি, এমনকী দশ ইঞ্চি পর্যন্তও মোটা ছিল। প্রত্যেকটি প্রায় কুড়ি-একুশ ফুট লম্বা। ইহার উপর এক ফুট গভীর চুন, সুরকি ও খোয়া পেটাই হয়।

ইতোমধ্যে শুভ অক্ষয়তৃতীয়ার দুই দিন পূর্বে পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ বিনা সংবাদে এলাহাবাদ হইতে মঠে আসেন। মধ্যাহ্ন-আহারের পর বিশ্রামান্তে বলিলেন, "আগামী পরশু অক্ষয়তৃতীয়া। ঐ-দিনে ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে, তাই আমি এসেছি।"

আমরা বলিলাম, "জিনিসপত্র সব এখনো জোগাড় হয়নি। কী করে কাজ আরম্ভ হবে?" মহারাজজী বলিলেন, "সে যাই হোক, মন্দিরের ঈশান কোণে একটু কংক্রিটের কাজ আরম্ভ করলেই হবে। পরে যখন জিনিসপত্র সব জোগাড় হবে, তখন ঠিক ঠিক কাজ আরম্ভ করবে।"

স্বামী প্রবোধানন্দজীর উপর মন্দিরনির্মাণের কাজকর্ম দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়, আর মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের উপর কাজ করাইবার ভার ছিল। এই দুই জনকেই পূজ্যপাদ মহারাজ ডাকিলেন। তাঁহাদের বলিলেন, "এখনো জিনিসপত্র সব জোগাড় হয়নি কেন?"

বিজ্ঞান মহারাজের আদেশানুযায়ী সব জিনিস জোগাড় করা হইল। অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে একটি পুষ্পপাত্রে ফুল, বেলপাতা, দূর্বা, চন্দন ইত্যাদি সাজাইয়া আনা হয়। কিছু কংক্রিট ও লোহার রড নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হইল।

বেলা নয়টায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সেই স্থানে আসিলেন। তিনি নিচে না নামিয়া উপরেই একটি চেয়ারে বসিলেন। নিচে নামিবার কথা বলা হইলে বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে মারতে চাও?"

ভিত্তিস্থাপনের জায়গায় প্রথমে গঙ্গাজল ঢালিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞান মহারাজ ঐ-স্থানে কিছু ফুল দিবার উদ্দেশ্যে পুষ্পপাত্র হইতে হাত বাড়াইয়া ফুল লইবার পূর্বেই হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পুষ্পপাত্র হইতে একটি শ্বেতপদ্ম ও একটি বিল্বপত্র ভিত্তিস্থাপনের জায়গায় পড়িয়া যায়।

পরে বিজ্ঞান মহারাজ পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কিছু কংক্রিট ঐ-স্থানে ফেলিলেন। তারপর সাধু-ব্রহ্মচারিগণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ও কংক্রিট ফেলিয়া শুভকার্য সমাপন করিলেন।

কার্যসমাপনান্তে বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, ''স্বামীজী আমাকে এই মন্দিরের নক্সা করতে বলেন। আমিও একটা কাগজে পেন্সিলের সাহায্যে নক্সা করে স্বামীজীকে দেখাই। তা দেখে তিনি খুবই খুশি হন এবং এই জায়গায় মন্দির হবে—তা-ও আঙুল দিয়ে নির্দেশ করেন। আমি বললাম, 'স্বামীজী! আপনি থাকতে থাকতে যদি ঠাকুরের মন্দিরটি হয়, তাহলে খুবই ভাল হয়।' তখন স্বামীজী বললেন, 'আমি ওপর থেকে দেখব, পেসন।' তাই আজ স্বামীজী এই শুভকার্যে নিজেই হাওয়া-রূপে এসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেলেন।'' পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম 'হরিপ্রসন্ন'। স্বামীজী আদর করিয়া ডাকিতেন 'পেসন'।

সেইবার মহারাজ প্রায় এক মাসের অধিক মঠে অবস্থান করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কংক্রিটের কার্যারম্ভ দেখিয়া যান; কিন্তু তখনো সব জিনিস জোগাড় হয় নাই, তাই তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া গেলেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরের জন্মতিথির দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৩১ আষাঢ় (১৬ জুলাই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ), মঙ্গলবার, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, গুরুপূর্ণিমা তিথিতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী উহার পুনঃস্থাপন করিলেন। শুভমুহূর্তে কার্য সম্পন্ন হইল। এই কার্যের জন্য পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ এলাহাবাদ হইতে পুনরায় মঠে আসিয়াছিলেন। ঐ-দিন ভিত্তিশিলার উপর স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা করেন। গীতা, চণ্ডী, উপনিষদ্ ও কথামৃত চার কোণে চার জন পাঠ করেন।

নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভমন্দিরের ঈশান কোণে ভিত্তিস্থাপনের কাজ আরম্ভ হইল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ রৌপ্যকর্নিক দ্বারা মশলা দিলেন, এই কর্নিকের দ্বারাই মহাপুরুষ মহারাজ প্রথম ভিত্তিস্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার উপর পাথরের বাক্স বসানো হইল। ইহার ভিতর তাম্রলিপি রাখা হইল। উহাতে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিন, মহাসমাধির দিন ও মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন এবং কে স্থাপন করিয়াছেন—দিন-তারিখ সব সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে লেখা আছে। আর একটি তামার চোঙার ভিতর কাগজে হাতের লেখায় ঐসকল দিন-তারিখ ইত্যাদি লেখা আছে। পঞ্চমুদ্রা ও ঐ-বৎসরের একটি টাকাসহ উহাও ঐ বাক্সের ভিতর রাখা হইল।

বেলা চারটার সময় ঐ-ভিত্তির উপর শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের প্রতিকৃতি সাজানো হয়। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ রামনাম ও কালীকীর্তন করেন। পরে সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন। মন্দিরের কুলি-মিস্ত্রিরাও প্রসাদ পাইয়া খুব আনন্দলাভ করে। ঐ-দিন পুরাতন মন্দিরে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর ভাগবত পাঠ হয়। পাঠের পর 'কেশব কুরু করুণা দীনে' এই গানটি গাওয়া হয়। ঐসময়ে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার ঘরে আহারের পর চেয়ারে বসিয়া আছেন; গানটি শুনিয়া বলিলেন, "এই গানটি গিরিশবাবুর রচিত।" মহারাজজী সেবকদের আরো বলিলেন, "একবার জন্মাষ্টমীতে গিরিশবাবু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন, আমিও সে-দিন ছিলাম। সন্ধ্যার পর গিরিশবাবু 'কেশব কুরু করুণা দীনে' গানটি ঠাকুরকে শোনালেন। গান শুনে ঠাকুরের ভাব হয়। ঠাকুর গিরিশবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন ও তাঁর কোলে বসলেন। ঠাকুরের নয়নযুগল দিয়ে প্রেমাশ্রু বইতে থাকে। পরে গিরিশবাবু কলকাতায় চলে যান। অনেক রাত হওয়াতে সে-দিন আমার আর বাড়ি যাওয়া হলো না। ঠাকুর বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আর গিয়ে কাজ নেই, আজ এখানেই থেকে যা।' আমিও সেদিনকার মতো দক্ষিণেশ্বরেই রাত্রিযাপন করি। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে মায়ের প্রসাদি লুচি ও মিষ্টি খেতে দিলেন। আহারান্তে শুয়ে পড়ি। ঠাকুর নিজেই আমার বিছানা করে মশারি খাটিয়ে দিলেন। আমিও শোওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝরাতে জেগে দেখি, ঠাকুরের ঘুম নেই—কেবল 'মা, মা' করছেন, আর আমার মশারির চারপাশে ঘুরছেন। আমি তো দেখে অবাক! কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আমাকে কৃপা করেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! শুনেছি ঠাকুর অন্যদের কারো পিঠে, কারো জিভে, কারো হাতে মন্ত্র লিখে দিয়েছেন। আপনাকে কেমন করে কৃপা করলেন।" তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন, কোনো কথাই বলিলেন না। পরে বিশ্রাম করিতে যান। সেবকরাও চলিয়া যায়।

একদিন বেলুড় মঠে কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী বলিলেন, "যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম যাতায়াত করি, তখন একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন,

'তুই কুস্তি লড়তে জানিস?' এই কথা বলেই ঠাকুর তাল ঠুকে আমাকে ধরলেন। আমিও ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে ঘরের এককোণে চেপে ধরি। তখন আমার শরীর খুবই ভাল, বেশ ক্ষমতাও ছিল। পরে ঠাকুর বললেন, 'আমিও আগে তোর মতো ছিলাম, এখন রোগা হয়ে গেছি।' তখন ঠাকুর একটু রোগা ছিলেন, কিন্তু অনুভব করলাম, শরীর মাখনের মতো কোমল।''

পরে বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, ''আমি তো তাঁকে হারাইনি, তিনিই আমাকে হারিয়েছেন। তিনিই আমাকে আকর্ষণ করলেন। তাঁর স্পর্শে শ্রীপাদপদ্মে মাথা নত করলাম।

''আরেক দিন ঠাকুর আমাকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে রাত্রিবেলা থাকতে বলেন, আমি সে-দিনও থেকে যাই। রাতে মায়ের প্রসাদি খান-চার ছোট ছোট লুচি ও একটু মিষ্টি খেতে দিলেন। আমি তো দেখেই ভেতরে ভেতরে চটে যাই। ভাবলাম—এ-কয়খানা লুচিতে আমার কী হবে! এতে তো পেটের এককোণও ভরবে না, বরং খিদে বেড়ে যাবে। বেশি পাবারও উপায় নেই। কিছু না বলে তাতেই জলযোগ করে শুয়ে পড়ি।

''মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, ঠাকুর তাঁর বিছানায় বসে আছেন। কেবল 'মা, মা' করছেন। আমি ভাবলাম—লোকটা পাগল হলো নাকি! ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, কেবল বসে বসে 'মা, মা' করছেন! লোকে যে বলে পাগলা বামুন, এ তো দেখছি সত্যিই তা-ই। আমিও কি পাগলা বামুনের পাল্লায় পড়লাম নাকি! এসব নানারকম ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

''ভোরবেলায় বাড়িতে যেতেই দিদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাতে কোথায় ছিলি?' বললাম, 'দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে।' শুনে দিদি বললেন, 'ঐ পাগলা বামুনটার কাছে বুঝি। ওরে, তার কাছে যাসনি, লোকটা পাগল। কলকাতার তিনশো ছেলের মাথা খেয়েছে। আমি প্রায়ই ঐ ঘাটে স্নান করতে যাই; সব দেখেছি, সব জানি।' এসব শুনে একটু হাসলাম মাত্র।''

ঐসময় জনৈক ভক্ত বিজ্ঞান মহারাজকে বলিলেন, "ঠাকুরের কথা বলুন।" মহারাজজী বলিলেন, "এমন সরল বামুন কখনো দেখিনি।" ঠাকুরের ভোগ নিবেদনের কথায় বলিলেন, ''শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে যা ঠাকুরকে নিবেদন করবে, তা-ই তিনি গ্রহণ করবেন।"

মহারাজজীকে সকালে প্রণাম করিতে আসিলে তিনি বলিলেন, ''বল তো, এখন দিন না রাত।'' সাধারণতঃ সকলেই দিনকে দিন বলে, আর রাতকে রাত

বলে। কিন্তু মহারাজ বলিলেন, "না, যোগীর দিন হচ্ছে রাত—বিশ্রাম করে। আর রাত হচ্ছে দিন, সারারাত ধ্যানজপ করে।" ইহা বলিয়া গীতার এই শ্লোকটি বলিলেন ঃ

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।। (গীতা, ২/৬৯)

মহারাজ প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার মস্তকমুণ্ডন করিতেন। নাপিত মুণ্ডন করিয়া কামাইয়া দিত, তাহাকে আলাদা পয়সা দিতেন আর বলিতেন, "মঠ থেকে তোমার যা প্রাপ্য তা নেবে।" যতক্ষণ না কামানো শেষ হইত, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতাম। ঠিক হইয়াছে বলিলে তবে নাপিতের ছুটি হইত। একবার নাপিত চলিয়া যাইবার পর মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন, ভাল কামানো হয় নাই। নাপিতকে ডাকা হইল। আবার সব ঠিক করিয়া দিল—সেই অবধি সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

একদিন স্বামী রমানন্দ (ক্ষীরোদ মহারাজ) শৈলেন মহারাজের জন্য একটি ৩৬ ইঞ্চির সোয়েটার আনিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মহারাজজীর খুব পছন্দ হয় এবং তিনি তাহা গায়ে দিয়া সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িলেন। উহা পরিয়া বোতাম লাগাইতে পারিলেন না। তবুও গায়ে রাখিয়া দিলেন।

স্বামী রমানন্দ বলিলেন, "মহারাজ, এটা শৈলেন মহারাজের জন্য এনেছি।" মহারাজজী বলিলেন, "না, এটা আমি গায়ে দেব। বেশ লাগছে।" তাঁহার শরীর অনুপাতে ৪২ ইঞ্চির সোয়েটার দরকার। স্বামী রমানন্দ বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ, আপনাকে আর একটা এনে দেব।" মহারাজজী বলিলেন, "তা বেশ, একটা এনে দাও।" পরদিন ৪২ ইঞ্চির সোয়েটার আনা হইল। সেটি গায়ে দিয়া শৈলেন মহারাজেরটা তাঁহাকে ফেরত দিলেন।

মহারাজজীর গায়ের জামা খুবই ঢলঢলে ছিল, পকেটও খুব বড় বড়। মানিব্যাগ ও অন্যান্য কাগজপত্র ঐ পকেটে রাখিতেন। শীতকালে উহার উপরে একটি তুলার কম্বলের জামা পরিতেন। একটি টুপিও ছিল। পায়ে ডবল মোজা বারো মাস পরিতেন। চটিজুতা ব্যবহার করিতেন। বেলুড় মঠে আসিবার সময় একটি ছোট ট্রাঙ্ক ও একটি হিন্দুস্থানি লেপ আনিতেন।

মঠে আসিয়া মানিব্যাগটি দিয়া বলিতেন, "দেখো তো কত আছে।" সব গুনিয়া রাখিয়া দিতাম। দীক্ষার প্রণামি তাহাতে রাখা হইত। এলাহাবাদে যাইবার দিন আবার গুনিতে দিতেন। তখন অনেক টাকা থাকিত। বলিতেন, "এ-টাকা

সব রামায়ণে যাবে।'' রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া ছাপাইতেছিলেন। উহার জন্য খরচ করিতেন। রামায়ণ লিখিবার সময় টেবিলের পাশে একটি রামচন্দ্রের সপার্ষদ ছবি থাকিত। তাহাতে চাবি দিলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মহাবীরের হাত, পা ও মাথা নড়িত। উহা একজন ভক্ত মহারাজজীকে দিয়াছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, ''যখন রামায়ণ লিখতে বসি, তখন সব ভুল হয়ে যায়। সামনেই রামচন্দ্রজী, সীতাদেবী, লক্ষ্মণজী ও মহাবীরকে দেখতে পাই।''

(উৎস ঃ দিব্যপ্রসঙ্গে)

রেঙ্গুনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্যদেব দর্শন দিলেন, চারিদিক আলোকিত হইল। কূলকিনারা নাই। আজ বেলা প্রায় দুইটায় রেঙ্গুন পৌঁছিব। দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া জিনিসপত্র সব গোছানো হইল। অপেক্ষা করিতেছি, কখন রেঙ্গুনে পৌঁছিব। ইতোমধ্যে রেঙ্গুন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজ জাহাজে আসিয়া পূজ্যপাদ মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, মহারাজজী অবাক হইয়া বলিলেন, ''কী করে এলে?'' তিনি বলিলেন, ''পুলিশের লঞ্চে এসেছি।'' জিনিসপত্র দেখিয়া বলিলেন, ''এই তো সব জিনিস।'' মহারাজজী বলিলেন, ''ফল ও মিষ্টি এসব শ্রীনাথ জোগাড় করেছে।'' তারপর বলিলেন, ''ওহে ভাই, আমাকে নামতে দেবে তো?'' পুণ্যানন্দজী বলিলেন, ''নিশ্চয়ই দেবে, মহারাজ।'' মহারাজজী বলিলেন, ''যদি না দেয়, তাহলে মাটিটা একটু ছুঁতে পারলেই হলো। পরে আবার জাহাজে এসে বসে থাকব, আর কলকাতায় ফিরে যাব।'' পরে একসময় মহারাজ বলিয়াছিলেন, "রেঙ্গুনে আসবার জন্য ঠাকুর আদেশ করেছিলেন।" সেই কারণেই বলিয়াছিলেন যে, নামিতে না দিলেও মাটিটা একটু ছুঁইয়া যাইবেন। কারণ, তাহা না হইলে ঠাকুরের আদেশ রক্ষিত হইবে না।

জাহাজ জেটিতে লাগিল, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের দর্শনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। মহারাজজীকে ফুলের মালা পরাইয়া অভ্যর্থনা করা হইল। মহারাজজী আস্তে আস্তে চলিয়াছেন। দুই পাশে লোকের ভিড়। মহারাজজীসহ দ্বিজেন মহারাজ ও স্বামী পুণ্যানন্দ মোটরে আশ্রমে আসিলেন। জিনিসপত্রসহ আমি পরে আসিলাম। আশ্রমে আসিয়া মহারাজজী বলিলেন, "এদেশের লোকেরা খুব ভদ্র। আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করলে না।"

৮ ডিসেম্বর আমরা রেঙ্গুন আশ্রমে আসিলাম। বিকালে চা খাওয়ার পর অনেক ভক্ত দর্শন করিতে আসিলেন। অনেকের দীক্ষার কথাও হইল।

রাতে আহারের পর বলিলেন, "শোওয়ার সময় পাখাটা বন্ধ করে দিয়ো।" ডিসেম্বর মাসেও রেঙ্গুনে বেশ গরম থাকে, পাখা ব্যবহার করিতে হয়।

যে বাড়িতে মহারাজজী ছিলেন, উহা কাঠের বাড়ি। কাঠের মাচানের উপর ঘর। রেঙ্গুনে প্রায় সব বাড়িই এই রকমের। মহারাজজী ছোট ঘরে, আমি হলঘরে। হলঘরের এককোণে বাথরুম, আমার বিছানার পাশ দিয়াই বাথরুমে যাওয়ার পথ।

মশারি খাটাইয়া শুইয়া পড়ি। মহারাজজীর পাখা বন্ধ করা হইল। অত্যন্ত মাথা ধরাতে আমার মোটেই ঘুম হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বাথরুমে আসিলেন। হাতে টর্চ লাইট, কাপড় পরা। আবার কিছুক্ষণ পরে আসিলেন, কাপড় বগলে। আবার আসিলেন, একেবারে দিগম্বর। তারপর ভোর হইল।

মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ''ঠাকুর পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন।'' রাতে খাওয়ার সময় জামাকাপড় এঁটো হইত। বলিতাম, ''মহারাজ, এসব জামাকাপড় ছেড়ে দিন, ধুয়ে দিই। অন্য জামাকাপড় পরুন।'' তিনি বলিতেন, ''কী আর হয়েছে। জামাকাপড়ের সঙ্গে কী আর সম্পর্ক!''

পরদিন ৯ ডিসেম্বর। ভোরবেলা জিজ্ঞাসা করিলাম, ''মহারাজ! কেমন বিশ্রাম হয়েছে?'' বলিলেন, ''বেশ ভালই।'' চা খাওয়ার পর কয়েক জনের দীক্ষা হইল। ভক্তেরা মহারাজজীর জন্য নানা রকমের খাবার আনিয়াছেন। সবই মহারাজকে সাজাইয়া দেওয়া হইল। নিত্য যাহা রান্না হয় তাহাও দেওয়া হইল। তিনি সামান্যই গ্রহণ করিলেন, তবে নূতন খেজুরগুড়ের সন্দেশ, পায়স ও পিঠা খুব পছন্দ করিতেন। নানা রকমের আচার রহিয়াছে, তাহাও খুব আনন্দের সহিত খাইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত ভক্তদের ঠাকুরের কথা বলিলেন।

১০ ডিসেম্বর। অনেকের দীক্ষার ব্যবস্থা হইল। দীক্ষার পর মহারাজজী বলিলেন, ''এবারে সবাইকে (দীক্ষার্থীদের) গঙ্গাধর মহারাজের কাছে সারগাছি পাঠিয়ে দাও।'' বিকালে ভক্তদের কিছু বলিলেন।

সেইসময় পেগুতে বুদ্ধদেবের শয়ানমূর্তি দর্শনে যাইবার কথা হয়। আগামী কাল সকালে চা খাওয়ার পর দুইটি মোটরে যাওয়া হইবে। দ্বিজেন মহারাজ বলিলেন, ''তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই তো আগে গিয়েছিস, বরং এখানে মহারাজের রান্নার ব্যবস্থা করবি।'' ঐকথায় রাজি হইলাম।

রাতে শোয়ার সময় মহারাজজী বলিলেন, ''কাল তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।'' বলিলাম, ''আপনার খাবার তৈরি করতে হবে বলে দ্বিজেন মহারাজ আমাকে যেতে বারণ করেছেন।'' তাহা শুনিয়া বলিলেন, ''অতদূর থেকে এসেছ, আর কিনা দর্শন করতে যাবে না! তা হবে না, আমি খাব না।''

দ্বিজেন মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ আমাকে যেতে বলেছেন।" তিনিও রাজি হইলেন। শেষরাতে উঠিয়া মহারাজের জন্য কুকারে রান্না চাপাইলাম। রান্নাশেষে স্টিম করিয়া রাখিলাম।

১১ ডিসেম্বর বেলা আটটায় পেগুতে বুদ্ধদেবের শয়ানমূর্তি দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। মন্দিরের অনতিদূরে মোটর দাঁড়াইল। মহারাজজীর সহিত আমরা সকলেই দর্শনে যাইলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছি। ইতোমধ্যে মহারাজজী গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় নাই। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, মহারাজ গাড়িতে ভাবস্থ হইয়া আছেন। চুপচাপ, কোনো কথা বলিতেছেন না।

মহারাজজী সাধারণতঃ ফল খাইতেন না। তবুও কয়েকটি কমলালেবু আনিয়াছিলাম। ঐসময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, একটু লেবুর রস খাবেন?" মহারাজজী বলিলেন, "দাও।" আধ গ্লাস লেবুর রস করিয়া দিলাম। রেঙ্গুনের পথে মোটর ছাড়িলে পর মহারাজজী বলিয়াছিলেন, "আজ বুদ্ধদেব দয়া করে আমাকে দর্শন দিয়েছেন।"

আশ্রমে আসিতে প্রায় বারোটা বাজিল। মহারাজজী বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলেন, "খাব না। তুমি খাও।" সকলের সহিত খাইতে বসিলাম। প্রায় অর্ধেক খাওয়া হইয়াছে, তখন মহারাজজী ডাকিলেন। আসিতেই বলিলেন, "গরম গরম লুচি ও আলুর চচ্চড়ি নিয়ে এসো।" তাহাই মহারাজের জন্য করিয়া আনিলাম। তিনি আহার করিলেন। কুকারের খাবার পড়িয়া রহিল।

বিকালে ভক্তমহিলাগণ বলিলেন, "মহারাজ! আজ আমাদের ঠাকুরের কথা বলুন।" মহারাজজী ঠাকুরের দুইটি কথা বলিলেন মাত্র। (১) "ইষ্টনিষ্ঠা—মেয়েরা শ্বশুর, শাশুড়ি, স্বামী, দেবর ও অন্য সকলের যথোপযোগী সেবা করে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আলাদা সম্বন্ধ। এরকম সব দেবতার ওপর শ্রদ্ধাভক্তি রাখবে, কিন্তু নিজের ইষ্টের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি থাকবে।" (২) "মেয়েরা পুরুষদের ভোলাবার জন্য সাজগোজ করে, আর নানারকম অঙ্গভঙ্গি দেখায়!" এই কথা বলিতেই সকলে মাথা নিচু করিয়া হাসিতেছেন। তখন মহারাজজী বলিলেন, "কেন, এসব তো ঠাকুরের কথাই বলছি।" এই দুইটি কথা শুনিয়াই মহিলাগণ উঠিয়া চলিয়া যান। সাধারণতঃ মহারাজজী মহিলাদের সহিত বেশি কথাবার্তা বলিতেন না।

১২ ডিসেম্বর। সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ পূর্বদিন বাহির হইয়াছিল। সকালে মহারাজজীকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। দেখিয়াই বলিলেন, "আজ তুমি খেতে পারবে না—উপবাস। অষ্টম এডওয়ার্ড অতবড় সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে পারল, আর তুমি এক দিন উপবাস করতে পারবে না?" বলিলাম, "নিশ্চয়ই পারব, মহারাজ।" অবশ্য সেই দিন পেটের গোলমাল হইয়াছিল, মহারাজ তাহা জানিতেন না—উপবাসে উপকারই হইল। মহারাজ আবার বলিলেন, "দেখলে, একটি মেয়েমানুষের জন্য অতবড় সাম্রাজ্য ত্যাগ করলে! মহামায়ার কী খেলা!"

কয়েক জনের দীক্ষা হইল। প্রত্যেককেই একটি কাগজ দেওয়া হইত—তাহাতে কী করিয়া ধ্যানজপ ও প্রার্থনা করিতে হইবে এবং একটি বড় মন্ত্র ও একটি ছোট মন্ত্র লেখা থাকিত। ছোট মন্ত্রটি সবসময় জপ করিতে বলিতেন। বড় মন্ত্রটি সকাল-সন্ধ্যায় শুদ্ধভাবে বসিয়া জপ করিতে বলিতেন। অনেকেই দীক্ষার পর সব পদ্ধতি ভুলিয়া যায় ও মহারাজকে চিঠিতে জানায়, এই কারণে মহারাজ সব লিখিয়া দিতেন। দীক্ষিত ভক্তদের এইভাবে প্রার্থনা করিতে বলিতেন ঃ "হে প্রভু! হে জগদম্বে! আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার অচলা অটলা ভক্তি হোক। সদাসর্বদা যেন মনে রাখতে পারি, ভুলে না যাই। আর বিশেষ করে অন্তিমকালে প্রাণ যাওয়ার বেলা যেন আপনাদের স্মরণ-মনন করতে পারি। সেইসময় আপনারা দয়া করে আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনাদের কাছে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে রেখে দেবেন।"

বিকালে মহারাজজী শহরে বেড়াইতে গেলেন। জিনিসপত্র আনিবার জন্য একটা তালপাতার বাক্স লইলেন। এক জোড়া আইভরির কাপ-সসার কিনিলেন। অধ্যক্ষ মহারাজ মঠের জন্য একটি বড় ত্রিকোণ ঘণ্টা কিনিয়া দিলেন।

জনৈক ভক্ত প্লাইউডে নানা রকমের কারুকার্য করিয়া তাহাতে ঠাকুর ও মায়ের ছবি বসাইয়া মহারাজকে দিয়াছেন। মহারাজজী দীক্ষার কাপড় ও টাকা সব অধ্যক্ষ মহারাজকে দিলেন। ইহা ব্যতীত, সব সাধুদের আলাদা কাপড় দিলেন। অধ্যক্ষ মহারাজ বলিলেন, "এসব দীক্ষার জিনিস আপনার।" মহারাজজী বলিলেন, "তুমি আমাকে এনে যে আনন্দ পেয়েছ, আমিও তোমাকে সব দিয়ে সেই আনন্দ পেলাম।" অধ্যক্ষ মহারাজ আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

১৩ ডিসেম্বর। বেলা নয়টায় রেঙ্গুন হইতে কলকাতার জাহাজ ছাড়িবে। মহারাজজীর খাবারের ব্যবস্থা কুকারে করিলাম। আমরা আশ্রমেই আহারপর্ব শেষ করিলাম।

ভক্তেরা মহারাজজীকে সুগন্ধি ফুলের মালা পরাইয়া প্রণাম করিলেন। অনেকেই খাবার দিয়াছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ নূতন খেজুর-গুড়ের কিছু সন্দেশ দিয়াছিলেন। 'জয় গুরু মহারাজকী জয়', 'জয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকী জয়'—এই ধ্বনির মধ্যে মোটর ছাড়িয়া দিল। জাহাজঘাটেও খুব জনতা। বহু লোক মহারাজজীর দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে মহারাজ জাহাজে উঠিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজের বাঁশি বাজিল, জাহাজ ছাড়িয়া দিল। মন্থরগতিতে জাহাজ সমুদ্রাভিমুখে চলিল।

জাহাজ সমুদ্রে আসিবার পূর্বেই মহারাজজী খাবার চাহিলেন। খাবার দেওয়া হইল। নূতন গুড়ের সন্দেশও দিলাম। আহারান্তে তিনি বিশ্রাম করিলেন। আমরাও আমাদের জায়গায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। দ্বিজেন মহারাজ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। আমারও চোখ লাগিয়া আসিয়াছে। প্রায় তিন কোয়ার্টার পর, ডাক্তারের কামরার সম্মুখে আসিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। ডাক শুনিয়া উঠিয়া দেখি, মহারাজজী দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু দরকার আছে কি মহারাজ?" বলিলেন, "না, তোমাদের দেখতে এসেছি।" বলিলাম, "বাটলারের কামরার দিক দিয়ে দরজা খোলা আছে।" ঐ-দিকে আসিয়া আমাকে চোখে ইশারা করিয়া ডাকিলেন। মহারাজজীর পিছনে পিছনে কেবিনে আসিলাম।

মহারাজ বলিলেন, "সেই সন্দেশগুলো কোথায় রেখেছ? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। দেখতে পেলাম না, তাই ডাকতে গিয়েছি।" "সামনেই তো মহারাজ, এই যে কৌটোটি।"—খুলিয়া দেখাইলাম। তখন মহারাজ একটি একটি করিয়া আটটি সন্দেশ খাইলেন। আমাকেও চারটি খাওয়াইলেন। বলিলেন, "খুব চমৎকার করেছে।"

বেলা দুইটায় জাহাজ সমুদ্রের মাঝে চলিয়াছে। মহারাজজীর কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্ত বেতারে কাজ করেন। তিনি জাহাজে খবর পাঠাইয়াছেন, "আপনার যাত্রার মঙ্গল কামনা করি।"

চায়ের সময় আসিয়া তারের খবর শুনিয়া অবাক হইলাম। কী করিয়া সংবাদ আসিল। দ্বিজেন মহারাজ বলিলেন, "জাহাজেও বেতার আছে। তাতেই খবর এসেছে।" মহারাজ চায়ের সঙ্গে আরো চারটি সন্দেশ খাইলেন। দ্বিজেন মহারাজকে খাইতে বলিলেন, তিনি চায়ের সহিত মিষ্টি খাইতে রাজি হইলেন না। বলিলেন, "চায়ের মৌতাত নষ্ট হয়ে যায়।"

এইবারেও জাহাজের পাচকের সহিত রান্নার ব্যবস্থা করিলাম। দুই বেলাই

মহারাজের কেবিনে খাবার দিয়া যাইত। রান্নার সব জিনিসই দিতাম। মহারাজ যাহা পছন্দ করিতেন, তাহাই করা হইত। মহারাজজীর আহারের কোনো অসুবিধাই হয় নাই।

পরদিন ১৪ ডিসেম্বর। মধ্যাহ্নভোজনের পর বিশ্রাম করিলেন। বেলা তিনটায় চা খাইবার পর বলিলেন, "দেখো, জামাটা এখানে ছিঁড়ে গেছে। একটু সেলাই করে দাও।" বলিলাম, "এ জামাটা ছেড়ে দিন, আরো জামা আছে, দিচ্ছি।" বলিলেন, "না, এটাই সেলাই করে দাও।" চুপ করিয়া আছি। তারপর বলিলেন, "সুচ-সুতো আনা হয়নি বুঝি! মনে করেছ, খুব সেবা করছ। সেবা করতে হলে নিখুঁতভাবে সব করতে হয়।"

আমি তো শুনিয়া অবাক। আবশ্যকীয় সব জিনিসই আনিয়াছি। এমনকী সাগু, বার্লি পর্যন্ত। কিন্তু, জাহাজে ঐ-সময়ের মধ্যে সুচ-সুতোর দরকার হইবে—অতটা ভাবি নাই, আর মনেও হয় নাই। কোনো জিনিসের অভাবই হইবে না—ইহাই ভাবিয়াছিলাম।

আমাকে বলিলেন, "যাও, জাহাজে খুঁজে দেখো। সুচ-সুতো নিয়ে এসো।" কোথায় খুঁজিয়া পাইব? কে আমার জন্য সুচ-সুতো লইয়া বসিয়া আছে? এদিক-ওদিক খুঁজিয়া কোথাও পাওয়া গেল না।

বয়কে ডাকিবার জন্য বেল বাজাইলাম। বয় আসিলে বলিলাম, "তোমাদের সুচ-সুতো নিয়ে এসো।" সুচ-সুতো আনিলে মহারাজজীর জামা সেলাই করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, "ওহে, এখানেও যে ছেঁড়া।" আবার বয়কে ডাকিয়া সুচ-সুতো আনাইয়া সেলাই করিলাম। জামাটি বরাবর গায়েই ছিল।

১৫ ডিসেম্বর। জাহাজ কলকাতায় পৌঁছাইল। অনেক ভক্ত আউট্রাম ঘাটে সমবেত হইয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বেই মোটরে মহারাজজী-সহ আমরা মঠে আসিলাম।

(উৎস ঃ দিব্যপ্রসঙ্গে)

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

ঠাকুরের নবনির্মিত মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আমেরিকা হইতে স্বামী অখিলানন্দজী, দুই জন আমেরিকান মহিলা-ভক্ত মিসেস উর্স্টার ও মিস রুবেল মঠে আসিয়াছেন।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ হইতে মঠে পৌঁছিলেন। ১৪ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তি—মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন। প্রতিষ্ঠাকার্যের জন্য সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকলেই খুব ব্যস্ত। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন চলিয়াছে। অনঙ্গ মহারাজ সব ব্যবস্থাদি করিতেছেন।

অপরাহ্নে বিজ্ঞান মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরে নগ্নপদে আসিলেন। গর্ভমন্দিরে চেয়ারে বসিয়া সব দেখিলেন। তখনো কাজ শেষ হয় নাই; মেঝেতে জল, চুন ও সুরকি আছে। মোজা সব ভিজিয়া গিয়াছে। জুতা পরিবার কথা বলায় বলিলেন, ''না, ঠাকুর আছেন।'' তখন বেদিতে ঠাকুরের মর্মরমূর্তি বসানো হইয়াছে—কাপড়ে ঢাকা। খুলিয়া দেখাইবার কথায় বলিলেন, ''দরকার নেই।'' সেইসময় কেবলমাত্র গর্ভমন্দিরের ভিতরের কাজ কোনোপ্রকারে শেষ হইয়াছে। আর সমস্তই বাকি ছিল।

মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১১২ ফুট ৬ ইঞ্চি। গোপুরমের উচ্চতা প্রায় ৭৮ ফুট। নাটমন্দির লম্বা প্রায় ১৫২ ফুট, চওড়া ৭২ ফুট, উচ্চতা প্রায় ৪৮ ফুট। সমস্ত মন্দিরটি প্রায় ২৩৩ ফুট লম্বা। চুনার পাথরের মন্দিরটি নির্মাণ করিতে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরের নয়টি গম্বুজ, ইহাকে নবরত্ন মন্দির বলে। নাটমন্দিরের পূর্বদিকের দরজার উপর গণেশজীর ও পশ্চিমদিকের দরজার উপর মহাবীরজীর মূর্তি। এই মূর্তিদ্বয়ের নক্সা নন্দবাবুর [শিল্পী নন্দলাল বসু] আঁকা।

প্রতিষ্ঠার দিন ভোরবেলা পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের 'আত্মারামের কৌটা' পুরাতন মন্দির হইতে নূতন মন্দিরে লইয়া যাইবেন। হাঁটিতে পারিবেন না বলিয়া মোটরের ব্যবস্থা হইল। তাহাতে তিনি আত্মারামের কৌটাসহ যাইবেন এবং বেদিতে তাহা স্থাপন করিবেন।

প্রতিষ্ঠার দিন ভোরবেলা হইতেই বহু সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তের সমাগম হইয়াছে, সকলেই উদ্‌গ্রীব—কখন মহারাজজী আত্মারামের কৌটাসহ পুরাতন মন্দির হইতে নূতন মন্দিরে আসিবেন। সমস্ত পথটিতে শালু পাতা হইয়াছিল। পুরাতন মন্দিরে ঠাকুরের মঙ্গলারতি হইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে মহারাজজী আত্মারামের কৌটাসহ্ নূতন মন্দিরে আসিবেন। সবই প্রস্তুত। মহারাজজীর দেরি দেখিয়া জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজজীকে ডাকিতে বলিলেন। খুবই ইতস্ততঃ করিতেছি। মহারাজ বাথরুমে, কিছুক্ষণ পরে প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। একখানি নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিলেন।

চেয়ারে বসিয়া মহারাজজী বলিলেন, "মন্দিরে ঠাকুরকে বসিয়ে বলব, 'স্বামীজী! আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আপনার পরিকল্পিত মন্দিরে বসেছেন। আপনি বলেছিলেন, ওপর থেকে দেখবেন। তাই দেখুন, ঠাকুর নূতন মন্দিরে আজ বসেছেন। আরো একটা কথা ঠাকুরকে জানাব।'"

শুভক্ষণ উপস্থিত। মহারাজজী নিচে আসিলেন। মোটর পুরাতন মন্দিরের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া। মহারাজজী মোটরে বসিলেন। পাশেই স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। পুরাতন মন্দির হইতে অনঙ্গ মহারাজ আত্মারামের কৌটা মাথায় করিয়া 'জয় গুরু মহারাজকী জয়' বলিয়া অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিলেন।

অনঙ্গ মহারাজ মোটরে উপবিষ্ট পূজ্যপাদ মহারাজজীর হাতে আত্মারামের কৌটা দিলেন; পরে শঙ্করানন্দজী হাত বাড়াইয়া ধরিলেন। মোটরের উপরে একটি লাল রঙের প্রকাণ্ড ছাতার আচ্ছাদন। সামনে একটি দুগ্ধবতী গাভি চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে চামর-ব্যজন হইতেছে, সাধু ও ভক্তগণ 'জয় গুরু মহারাজকী জয়' ধ্বনি করিতেছেন। মোটর ধীরে ধীরে শালুর উপর দিয়া চলিয়াছে।

সাধু ও ভক্তেরা মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিত্যপূজার পটটি লইয়া 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'—গানটি গাহিতে গাহিতে নূতন মন্দির পরিক্রমা করিতেছেন।

মোটর নূতন মন্দিরের পূর্বদিকের সিঁড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনঙ্গ মহারাজ আত্মারামের কৌটা মাথায় করিয়া গর্ভমন্দিরের বেদির পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী ধীরে ধীরে বেদির পার্শ্বে আসিলেন। আত্মারামের কৌটা বেদিতে রাখিয়া তিনি পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ও ভোগ নিবেদন করিলেন। তারপর নিজের ঘরে আসিলেন।

মহারাজজীর চা খাওয়া হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি যে বলেছিলেন,

ঠাকুর ও স্বামীজীকে কী বলবেন, বলেছিলেন?'' মহারাজজী বলিলেন, ''হ্যাঁ, বলেছি। স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী! আপনি ওপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন। এবারে দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আজ আপনার পরিকল্পিত নূতন মন্দিরে বসেছেন।' তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—স্বামীজী, রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও গঙ্গাধর মহারাজ সকলেই দাঁড়িয়ে দেখছেন (আঙুল দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে দেখাইলেন)।'' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ''ঠাকুরকে কী বলবেন বলেছিলেন?'' বলিলেন, ''হ্যাঁ বলেছি, তবে কাউকে বলব না।'' এই কথার ভাব তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পরবর্তিকালে তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।

ভোরবেলা হইতে নহবত বাজিতেছে। চারিদিকে কীর্তন হইতেছে। লোকে লোকারণ্য। কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, গীতা ও উপনিষদ্ পাঠ চলিতেছে। নূতন মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে একটি যজ্ঞমণ্ডপ তৈয়ার হইয়াছে—খড়ের ছাউনি। প্রায় এক হাত উঁচু গঙ্গামাটির ভিত। তাহাতে পাঁচটি হোমকুণ্ড হইয়াছে। পাঁচ জন পণ্ডিত কাশী হইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা সারাদিন হোম করিলেন। মণ্ডপের চারদিকে চারটি প্রবেশদ্বার নির্মিত হইয়াছিল। বেল, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও অশ্বত্থ কাঠের চারটি প্রবেশদ্বার তৈয়ার হইয়াছিল। এই মণ্ডপ হইতে মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত একটি সাদা থানকাপড় বাঁধা ছিল। ইহা স্পর্শ করিয়া মন্দির সমর্পণ করা হইয়াছিল। মণ্ডপের পিছনের চালাতে পূজার ভাণ্ডার—নানা রকমের ফুল, ফল, মিষ্টি ও বিভিন্ন জিনিসে পরিপূর্ণ ছিল।

গর্ভমন্দিরে বেদি ও ঠাকুরকে নানা রকমের ফুল ও মালা দিয়া সাজানো হইয়াছিল। গর্ভমন্দিরের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে চুনার পাথরের তিনটি করিয়া নয়টি জালি আছে, তাহাতে নবগ্রহের মূর্তি আছে। নন্দলাল বসু এইসবের নক্সা করিয়া দেন।

প্রথমে নিত্যপূজা হয়। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, দশাবতার ও অন্যান্য ধর্মাচার্যের পূজা, ভোগরাগ ও আরতি হয়। সন্ধ্যারতির পর বাজি পোড়ানো হয়। সারারাত দশমহাবিদ্যার পূজা, ভোগ ও হোম হয়। শেষরাতে মহারাজজী কয়েক জন ত্যাগি-কর্মীকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

প্রায় দশ হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সকলেই প্রসাদলাভে নিজেদের ধন্য মনে করেন। এই বিশেষ দিনে বহু ভক্ত মহারাজজীর দর্শনে আসিয়াছিলেন। বেশ ভিড় হইয়াছিল। অনেক ভক্তকে দীক্ষা দিয়া মহারাজজী ক্লান্তি বোধ করেন,

ইচ্ছা—একটু চুপচাপ বিশ্রাম করেন; কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। তিনি বরাবরই অধিক লোকসমাগম পছন্দ করিতেন না। নিরিবিলিতে থাকাই তাঁহার স্বভাব, এলাহাবাদেও অধিকাংশ সময় নিজের ভাবেই থাকিতেন।

মাঝে মাঝে বলিতেন, "এলাহাবাদই ভাল। লোকজনের হাঙ্গামা নেই। বেলুড় মঠে বড় লোকজন, ভিড় লেগেই আছে—নিঃশ্বাস ফেলবার জো নেই। লোকেরা আমার কী দেখতে আসে? আমার চেহারা ভাল নয়, কোনো রূপ নেই, তবুও লোকেরা ভিড় করে আছে।"

বলিলাম, "আপনি ঠাকুরের সন্তান। ঠাকুরের প্রতিনিধিরূপে আছেন—আপনাকে দর্শন করে শান্তি পায়। তাই দর্শনের জন্য ভিড় করে।"

মহারাজজী বলিলেন, "আগে যা পছন্দ করতাম না, আজকাল তা করতে হচ্ছে। কেন জানি না! মহাপুরুষ মহারাজ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁর শরীর যাবার পর থেকেই যেন মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। এখন মনে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে একটু শক্তি বা একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যে-কেউ আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে দেব।" পরবর্তিকালে দেখা গিয়াছে, মহাসমাধির ছয় দিন পূর্ব পর্যন্ত দীক্ষা দিয়া এই কথা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সময় মহারাজজী সপ্তাহকাল বেলুড় মঠে ছিলেন। একদিন সকালে তিনি তালের রস খাইতে চাহিলেন, রস আনা হইল। সেইসময় ভক্তি ও অন্নপূর্ণা মহারাজজীকে প্রণাম করিতে আসিল। মহারাজজী নিজে রস খাইলেন এবং তাহাদেরও খাইতে দিলেন।

একদিন শ— মহারাজ বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মহারাজজী প্রথমে বলিলেন, "দু-মিনিট।" পরে বলিলেন, "এবারে আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করুন।" শ— মহারাজ তখনই বাহিরে চলিয়া যান, আবার সেইমুহূর্তেই ফিরিয়া আসেন। মহারাজজী তাকাইয়া রহিলেন। শ— মহারাজ বলিলেন, "আপনি তো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বলেছিলেন, তাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছি।" মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন।

সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সকালে প্রণাম করিবার পর বিজ্ঞান মহারাজ সকলকেই ফল ও মিষ্টি দিতেন। একদিন বলিলেন, "আজ আর ওসব দিয়ে কাজ নেই, লোভ বেড়ে যাচ্ছে। সব গঙ্গায় ফেলে দাও।" ফল-মিষ্টি নিচে প্রসাদি ভাণ্ডারেই রাখা হইল, কিছু ফল-মিষ্টি গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। সাধু বা অন্যেরা তখন

গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কেহ ফল, কেহ মিষ্টি, যে যেমন পারেন ধরিয়া ধরিয়া খাইতে লাগিলেন। মহারাজজীকে বলিলাম, ‘‘সাধুরা গঙ্গায় স্নান করছেন, জল থেকে ফল-মিষ্টি ধরে ধরে খাচ্ছেন।’’ মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, ‘‘তাই নাকি!’’

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য শেষ হইবার পর কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া মহারাজ এলাহাবাদে চলিয়া যান। ৪ মার্চ, শুক্রবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব। এই উপলক্ষ্যে মহারাজ এলাহাবাদ হইতে মঠে শুভাগমন করেন। তখনও মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সাধারণ উৎসবের পর তিনি আবার এলাহাবাদে ফিরিয়া যান।

তিথিপূজার দিন ঠাকুরের নিত্যপূজা, বিশেষ পূজা, দশাবতার ও অন্যান্য ধর্মাচার্যের পূজা, ভোগ ও আরতি হয়। সারারাত দশমহাবিদ্যার পূজা ও হোম হয়। ঐ-দিনও মহারাজজী শেষরাতে কয়েক জন ত্যাগি-কর্মীকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই বিশেষ দিনে তিনি বহু ভক্তকে দীক্ষা দিয়া একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দলে দলে ভক্তগণ দর্শন করিতে আসিতেছেন। মহারাজ বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন না। কষ্ট হইতেছে দেখিয়া দরজা বন্ধ করিতেছিলাম, মহারাজ নিষেধ করিয়া বলিলেন, ‘‘আজ বিশেষ দিন। ভক্তেরা কত দূর দূর থেকে এসেছে, দর্শনে একটু শান্তি পাবে বলে—তা আসুক, এক দিন আমার বিশ্রাম নাই বা হলো।’’ সত্যই সারাদিন বিশ্রাম না করিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। এই শুভদিনে বহু ভক্ত মহারাজজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

(উৎস ঃ দিব্যপ্রসঙ্গে)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথাসংগ্রহ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

এলাহাবাদে অবস্থানকালে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর পুত্র শ্রীযুক্ত আনন্দনারায়ণ সাপ্রু মহাশয়ের (আই.সি.এস.) মোটরকারে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বেড়াইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "দেখো, এত মোটরকারে চড়েছি কিন্তু এমন আরামদায়ক কারে কখনো চড়িনি।" সেই দিন সন্ধ্যায় সাপ্রুর বাড়িতে যাইবার কথা উঠিলে তিনি তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মতি জানাইলেন। যখন তিনি সাপ্রু-ভবনের ফটকে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের গৃহবধূগণ পুষ্পমাল্যশোভিত বরণডালা লইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে সংবর্ধনা ও ভূ-নত প্রণাম করিলেন। স্যার তেজবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহার দর্শনলাভের আশায় সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজের প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্তি দর্শনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশান্তে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ সাপ্রু তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রাঞ্জল ইংরেজিতে ঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছু বলিলেন। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন ঃ "Oh! He was a very simple and plain man. He used to be constantly immersed in the thought of the Divine Mother." (আহা! তিনি খুব সরল ও সাদাসিধা ব্যক্তি ছিলেন। জগন্মাতার চিন্তায় তিনি সর্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন।) বিজ্ঞান মহারাজের কথা শেষ হইলে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "এঁর এত বয়স হয়েছে, কিন্তু মস্তিষ্ক সতেজ ও চিন্তাশক্তি এখনও অক্ষুণ্ণ।" তাঁহার পূত সঙ্গলাভে তাঁহারা পরম তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। বিদায়ের পূর্বে সাপ্রু-ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্য সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "Be happy in life. Be prosperous in life." (জীবনে তোমরা সুখী ও সমৃদ্ধ হও।)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কোনো মাদ্রাজি মন্ত্রশিষ্য নানা দার্শনিক প্রশ্ন তুলিয়া স্বীয় সংশয় প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহার উত্তরে তিনি অতি

অল্পকথায় এইভাবে লিখিয়াছিলেন ঃ "The mantras themselves will throw light in you. You need not be anxious. Repeat them daily morning and evening; all your doubts will be cleared as mists are cleared on the sun rising and you are certain to be happy." (তোমাকে যে মন্ত্রগুলি দিয়াছি, সেগুলি তোমার অন্তরে আলোকসম্পাত করিবে। তোমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্ত্রজপ করিও। সূর্য উঠিলে যেমন কুয়াশা অন্তর্হিত হয় সেইরূপ তোমার চিত্ত হইতে সংশয়গুলি দূর হইয়া যাইবে ও নিশ্চয়ই তুমি আনন্দলাভ করিবে।) সিদ্ধগুরুর এই কয়েকটি বাক্যে শিষ্যের মনের অন্ধকার অচিরেই কাটিয়াছিল।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার। বিন্ধ্যাচলে গঙ্গাতীরে কোনো সাধু তপস্যা করিবার সময় নিম্নোক্ত অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঃ তাঁহার ঘরের দরজার পার্শ্বে রাত্রি তিনটার একটু পূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ হঠাৎ সূক্ষ্মদেহে আসিয়া বসিলেন। সাধুটি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিতে পাইলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। বিজ্ঞান মহারাজ অতি করুণার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার অশুভ বাসনা কিছু রয়েছে।" দৃঢ়তার সহিত দুই বার বলিলেন, "কেটে যাবে, কেটে যাবে। একদিন আমার কাছে এসো, বলে দেব। দুই-এক বার আসবে।" সাধুটি স্বীয় অশুভ বাসনার কথা ভাবিয়া এবং মহারাজের অহেতুকী কৃপা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন বিজ্ঞান মহারাজ অন্তর্হিত হইলেন।

এই ঘটনার পর সাধুটি বিন্ধ্যাচল হইতে চলিয়া যান। কিন্তু এলাহাবাদে গিয়া এই বিষয়ে বিজ্ঞান মহারাজকে কিছু বলিতে পারিলেন না বলিয়া মনে মনে আপশোস করিলেন। কর্মোপলক্ষ্যে সাধুটির দাক্ষিণাত্যে যাইবার কথা হয়। পাছে মহারাজজীর সহিত জীবনে আর সাক্ষাৎ না হয়, এই আশঙ্কায় তিনি চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু সেই বৎসর ২৭ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির পূর্বদিন মঠে আসিয়াই শুনিলেন, বিজ্ঞান মহারাজ অপ্রত্যাশিতভাবে মঠে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া সাধুটি অবাক হইলেন। কিন্তু স্বীয় সমস্যা-সমাধানের সুযোগ পাইয়াও ঐবিষয়ে প্রশ্ন করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন। ৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার ঘটনাক্রমে সাধুটি একান্তে তাঁহাকে দর্শন করিবার সময় পাইলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক সাধুটি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের যে ফটো দুটি দিয়েছেন তা ধ্যান করি, কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে।" স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী, বলো।" সাধুটি বিনম্র বাক্যে নিবেদন করিলেন, "আমার অশুভ বাসনা কেমন করে কাটবে?" বিজ্ঞান মহারাজ তৃপ্তি ও শুভেচ্ছার সহিত স্নেহপূর্ণনেত্রে বলিলেন, "ও চলে যাবে। ওদিকে মন না দিলেই হলো।"

সাধু ঃ ঠাকুর ও মায়ের ধ্যান এবং নামজপ করলেই যাবে?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ হ্যাঁ, ওতেই যাবে, ঐ করলেই যাবে।

এই কথার পর তিনি গান করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। এখন আমি শোব, তুমি এসো।" এই বলিয়া তিনি শয়ন করিলেন।

পূর্বোক্ত সাধু একদিন সকালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে এলাহাবাদে দর্শন করিতে যান। সাধুটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে তিনি তাঁহার সম্মুখে একটি চেয়ারে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ তখন তাঁহার নিকটে তুলসীদাসের প্রেতদর্শন এবং রামায়ণ-পাঠান্তে হনুমানজীর সহিত সাক্ষাৎ ও বিন্ধ্যাচলে রামলীলাদর্শন প্রভৃতি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তুলসীদাসের সম্বন্ধে বলিলেন, "একবার হনুমান তাঁকে রামায়ণ লিখতে আদেশ করেন। তুলসীদাস উত্তর দেন, 'আমি যে রামায়ণ লিখব, আমার সে রামভক্তি কই?'" এই কথা বলিয়াই বিজ্ঞান মহারাজ ভাব-গদগদচিত্তে অজস্র অশ্রুবিসর্জন করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ ভক্তিবিহ্বল দেখিয়া সাধুটিও আত্মহারা হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তখন বিজ্ঞান মহারাজ স্বীয় ভাব সম্বরণ করিয়া সাধুটিকে হাত তুলিয়া শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রথম দীক্ষাদানের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বারকাধাম দর্শনান্তে রাজকোট আশ্রমে এক দিন থাকিয়া বোম্বাই আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দজী তখন অন্যত্র গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামী জপানন্দজী বিজ্ঞান মহারাজের সেবার তত্ত্বাবধানের জন্য বোম্বাই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বোম্বাইতে কালেকর নামক একজন তরুণ মারাঠি-ভক্ত ছিলেন। তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার বৃদ্ধ পিতাও ছিলেন পরমভক্ত। তিনি বিজ্ঞান মহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন স্বামী গুণাতীতানন্দজীর নিকট। বিজ্ঞান মহারাজের অনুমতি না লইয়াই গুণাতীতানন্দজী তাঁহার দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বৃদ্ধকে কথা দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তদনুযায়ী প্রস্তুত হইলেন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া ফেলিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ যে-দিন বোম্বাই আশ্রমে পৌঁছিলেন, সে-দিন সন্ধ্যায় স্বামী গুণাতীতানন্দজী বৃদ্ধকে পরদিন দীক্ষাদানের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান। তিনি ইতঃপূর্বে

দীক্ষা দেন নাই; তাই গুণাতীতানন্দজীর অনুরোধে ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং দীক্ষা দিতে অস্বীকার করিলেন। স্বামী জপানন্দজী আশ্রমবাসী সাধুদের অনুরোধে বিজ্ঞান মহারাজকে সম্মত করাইবার জন্য গেলেন। প্রথমে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন জপানন্দজী তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "আপনি ঠাকুরের সন্তান। আপনি ঠাকুরের নাম শুনিয়ে দেবেন, তাতেই দীক্ষা হবে।" তাঁহার অনুনয়-বিনয়ে মহারাজ কিঞ্চিৎ সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, "আমি কিন্তু সকালে স্নান করতে, ঠাকুরঘরে যেতে, বিছানা ছেড়ে অন্য আসনে বসতে বা চা খাওয়া বন্ধ করতে পারব না।" স্বামী জপানন্দজী বলিলেন, "আপনি সদা শুদ্ধ। আপনার স্নান করা, কাপড় ছাড়া বা অন্য আসনে বসার প্রয়োজন নেই। আপনি যেখানে বসবেন সেখানেই ঠাকুরঘর। আপনি বিছানায় বসেই দীক্ষা দেবেন।" বালকবৎ তিনি রাজি হইলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি কাপড় ছাড়িলেন এবং চা-ও খাইলেন না। দীক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার পদতলে বসিলেন এবং বিজ্ঞান মহারাজ বিছানায় বসিয়াই তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। এই তাঁহার প্রথম দীক্ষাদান। দীক্ষাদানের পর গুরু শিষ্যকে স্বীয় জপমালা দিয়াছিলেন। উক্ত মালা তিনি নিজে প্রায় চল্লিশ বৎসর জপিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি স্বামী জপানন্দজীকে একটি মালা আনিয়া দিতে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "পনেরো বছর আগে কোনো জৈন সাধুর জপমালা দেখেছিলাম। তখন থেকে ঐরকম মালা নেবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি সেরকম একটি মালা এনে দাও।" ঐপ্রকার জপমালা রেশমি সুতায় তৈরি করেন জৈন সন্ন্যাসিনীগণ। এইসকল বাজারে পাওয়া যায় না, জৈন সাধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। স্বামী জপানন্দজী বোম্বাই শহরে গিয়া একজন জৈন স্ত্রী-ভক্তের নিকট হইতে অতিকষ্টে সেই মালা জোগাড় করিলেন। একজন জৈন সাধু চল্লিশ দিন উপবাসান্তে উক্ত স্ত্রী-ভক্তের নিকট হইতে আহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আশিস-রূপে দুইটি মালা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। সেই মালা দুইটি আনিয়া স্বামী জপানন্দজী বিজ্ঞানানন্দজীর হাতে দিতেই তিনি বালকবৎ আহ্লাদিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার পনেরো বছরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে!"এই বলিয়া তিনি মালা হাতে লইয়া তৎক্ষণাৎ জপ করিতে লাগিলেন।

ইউরোপের প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক সি. জে. ইয়ুং কলকাতায় আসিয়া বেলুড় মঠে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ ইয়ুং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মন্দিরের পরিকল্পনা কি আপনাকে স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন?" তদুত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, "হ্যাঁ, তিনি আমাকে ideas (ভাব) দিয়েছিলেন এবং নক্সা করতে বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি

তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। ঐটি তিনি পছন্দ করলেন না। এভাবে দুই-তিন বার নক্সা করে তাঁকে দেখানো হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, 'অনেকটা হয়েছে।' মূলত তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে এই মন্দির নির্মিত।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলিতেন, "স্বামীজী যখন বেলুড় মঠে থাকতেন তখন মঠটি আমার কাছে জ্যোতির্ময় প্রতীত হতো, দূর থেকে তা আমি বেশ টের পেতুম। তিনি মঠে না থাকলে মঠটি নিষ্প্রভ দেখাত! বাইরে থেকে এসে মঠে ঢুকলেই বুঝতে পারা যেত, স্বামীজী মঠে আছেন কি নেই।"

বিজ্ঞান মহারাজ বেলুড় মঠের দোতলায় একটি ছোট ঘরে থাকিতেন, যেটিকে 'খোকা মহারাজের ঘর' বলা হয়। উহার দক্ষিণেই স্বামীজীর ঘর। একরাতে বিজ্ঞান মহারাজ ঘরের বাহিরে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারের বারান্দায় গিয়া তিনি শুনিলেন, স্বামীজীর ঘর হইতে করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে। ইহা শ্রবণে তাঁহার মনে হইল, স্বামীজীর শরীর বোধ হয় অসুস্থ। তাই তাঁহার মুখ হইতে এই ব্যথিতস্বর আসিতেছে। তিনি স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিলেন, স্বামীজী মেঝের উপর পড়িয়া করুণস্বরে কাঁদিতেছেন! বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী, আপনার কি শরীর খারাপ?" তখন স্বামীজীর চেতনা হইল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে পেসন? আমি ভেবেছিলাম, তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছ।" তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী ব্যথিতচিত্তে সজলনয়নে বলিলেন, "দেশের দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার কথা ভেবে ভেবে আমি ঘুমুতে পারছি না, মনটা বেদনায় ছটফট করছে। তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, এদেশের সুদিন আসুক, দুর্দিন চলে যাক।" বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়া বিছানায় শোয়াইলেন; দেশের দুঃখ-দারিদ্রে স্বামীজীর প্রাণ শেলবিদ্ধ হইত।

হলিউড বিবেকানন্দ হোমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সারনাথ মিউজিয়ামে অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত অলৌকিক অনুভূতির কথাটি বলিয়াছিলেন। এক শিবরাত্রির দিনে কাশী অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধুগণ বিশ্বনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজকে কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন, "মহারাজ, আপনি যাবেন কি?" তিনি কৌতুক করিয়া বলিলেন, "ঐ পাথরখানা দেখতে আর কী যাব!" কিন্তু পরে তিনি বিশ্বনাথদর্শনে গিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার এক অলৌকিক অনুভূতি হয়। তিনি দেখেন—মন্দিরে শিবলিঙ্গ

অন্তর্হিত। ক্রমে মন্দির ও দৃশ্যমান বিশ্ব কোথায় মিলাইয়া গেল। বিশ্বনাথের বিরাট বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ অনুভূত হইল। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আশ্রমে ফিরিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী যখন এলাহাবাদে ছিলেন, তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী অন্যত্র যাইবার পথে তথায় একবার উপস্থিত হন। তিনি বলিতেন, "বিজ্ঞান মহারাজ গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি ধরা দিতে চান না।" বিজ্ঞান মহারাজও ঠাকুরের এই মানসপুত্রকে কত ভক্তি করিতেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়। একজন ভক্ত এলাহাবাদ মঠে আসিয়া বিজ্ঞান মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সঙ্ঘাধ্যক্ষ এখানে উপস্থিত। তাঁর কৃপা পেলে ঠাকুরের কৃপাই পাওয়া হবে।" তদনুযায়ী ভক্তটি ব্রহ্মানন্দজীর নিকট গেলেন। ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "বিজ্ঞান মহারাজ স্থানীয় মঠের অধ্যক্ষ। তিনি গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। আপনি তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হোন।" ভক্তটির পুনঃপুন প্রার্থনায় এবং ব্রহ্মানন্দজীর অনুরোধে বিজ্ঞান মহারাজ নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যান এবং কিছু উপদেশ দেন। পরে ব্রহ্মানন্দজীর একটি ফটো তাঁহাকে উপহার দিয়া বলিলেন, "এই মূর্তির পূজা ও ধ্যান করলেই আপনার সব হবে। ইনিই আপনার গুরু।" ঠাকুরের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের গুরুগিরির বাসনা আদৌ ছিল না। পরদুঃখে কাতর হইয়া মানুষের ভবরোগ দূর করিবার জন্য কৃপাবশে তাঁহারা দীক্ষাদি দিতেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের যে সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এলাহাবাদ পাণিনি অফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদিশাস্ত্র। অনুবাদের নানা স্থানে অনুবাদক যেসকল সারগর্ভ মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলিতে সাধনরহস্যের সুগূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একটি মন্তব্যে লিখিয়াছেন ঃ "মনোভূমি ও বুদ্ধিভূমিতে দেবগণ কারণদেহে পূর্ণরূপে বিরাজিত। যখন তাঁহারা নিম্নভূমিতে নামিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেন, তখন আংশিকভাবে তাঁহারা আবৃত হন। কিন্তু তখনই আমরা তাঁহাদের মধ্যে অধিকতর শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। দেবগণ সকলেই বাস্তব ও সত্য। তাঁহাদের আকৃতি আছে। যদি মানব বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের রূপ দর্শনের ইচ্ছা করে তবে দেবরূপ দৃষ্টিগোচর হয় হৃদয়ে বা আজ্ঞাচক্রে। মন মস্তিষ্কে স্থিত সহস্রারে উত্থিত হইলে দেবরূপ জ্যোতিতে বিলীন হয়। সহস্রারে যে দিব্যজ্যোতি বিরাজিত, তাহাই নিম্নলোকে নামিয়া রূপ ধারণ করে। দেবগণ ইচ্ছামতো আকৃতি পরিগ্রহ করিতে পারেন। বহির্জগতের বস্তুসমূহ আমরা যেভাবে

দেখি সেভাবেই দেবমূর্তি দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে—দেবগণ মানুষ, পশু, বৃক্ষ বা প্রস্তরাদি জড়বস্তুর মূর্তিও ধারণ করেন। ভক্তগণ যে ইষ্টদেবতার আরাধনা করেন ফটোতে, প্রতিমায়, প্রস্তরে, বায়ুতে, জলে বা অগ্নিতে—তাঁহার অস্তিত্ব অনেকসময় অনুভূত হয় অদ্ভুতভাবে লীলায়মান জ্যোতীরূপে। এমনকী, ভক্তগণ দেবগণকে মৃদু অস্ফুটস্বরে কথা বলিতেও শোনেন।

"শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়-বৃন্দাবনে বাস করেন। তিনি আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারেও থাকেন। ঊর্ধ্বে দেবলোকেও বৃন্দাবনধাম আছে। শ্রীমহাদেব কৈলাসবাসী। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়িত্রয় যেখানে আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারে মিলিত, সেখানে কৈলাসধাম অবস্থিত। ব্রহ্মা নাভিদেশস্থ মণিপুরচক্রে থাকেন। নিম্নস্তরের কয়েক জন দেবতা ও ভক্ত দেবগণের পার্ষদরূপে আছেন। মৃত্যুর পর মানবগণ পিতৃলোকে গমনপূর্বক পরমানন্দে পিতৃগণের সহিত বাস করেন, কিংবা তাঁহারা দেবলোকেও যান এবং বিশেষ বিশেষ দেবতা ও দেবলোকের প্রতি আকর্ষণ অনুসারে স্ব স্ব ইষ্টদেবের সেবকরূপে থাকেন। যাঁহারা স্বর্লোকে যান তাঁহারা ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণাদি দেবগণের সহচররূপে অবস্থান করেন। দুষ্কৃতির ফলে কেহ কেহ প্রেতলোকে বা অন্য নিম্নলোকে বা নরকেও গিয়া থাকেন। সেইসকল লোকেই পাপক্ষয় করিতে হয়।

"দেবগণের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আছে। তাঁহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সৃজনক্ষম। তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহুদূরে প্রসারিত বা বিন্দুতে সঙ্কুচিত করিতে সমর্থ। তাঁহারা যে জ্যোতির্মণ্ডলে বেষ্টিত থাকেন তাহা বিবিধ বর্ণযুক্ত ও বহুদূর বিস্তৃত। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ আছে। ইহাদের কার্য অতিসূক্ষ্ম কারণরাজ্যে বা ভাবলোকে প্রকটিত হয়। সেইগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিন্তু যখন ইহলোকে আমাদের অবস্থা সূক্ষ্মতর হইয়া সূক্ষ্মতম কারণভূমিতে যায়, যেমন সুষুপ্তিতে, তখন আমরা তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ বা কারণশরীর দেখিতে পাই। দেবগণ স্থূলদেহ ধারণেও সমর্থ।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদে নিম্নোদ্ধৃত তিনটি সুচিন্তিত মন্তব্যে পূজাতত্ত্ব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ "পূজার উদ্দেশ্য দেহ, মন ও বাক্যের অশুদ্ধি দূর করা এবং অমরাত্মা বা পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। প্রধানতঃ, আমাদের দেহবুদ্ধি প্রবল বলিয়া দেহ হইতেই আরম্ভ করা উচিত। পূজায় বা জপে ভক্ত দেহের যে যে অঙ্গ বা করাংশ

স্পর্শ করেন, সেইগুলি অদ্ভুতভাবে সুষুম্না নাড়ীর তিনটি কেন্দ্রে—নিম্নে মূলাধার, মধ্যে হৃদয় এবং ঊর্ধ্বে মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অপর চারটি আঙুলের উপর সেইরূপ বারো বার জপ করিতে হয়। প্রত্যেক কেন্দ্রে এইরূপ তিন বার জপ করিলে আমরা জপের পূর্ণ সংখ্যা ৯×১২=১০৮ পাইব। অতএব, জপ ও পূজা বিশুদ্ধ এবং আত্মস্থ হইবার উপায়মাত্র। বিশুদ্ধ সাধক জীবাত্মার দ্বারা পরমাত্মার প্রকৃত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার বাহ্যপূজার প্রয়োজন নাই।

"শ্রীহরির নিত্যপূজা শালগ্রাম শিলায়, দুর্লভ রত্নে, মূল্যবান প্রস্তরে, যন্ত্রে ও মণ্ডলে করিতে হয়, কখনও ভূমিতে করিতে নাই। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে সুনীচ ও সুনম্র হইলে এবং বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গের পাপ নষ্ট হয়। শালগ্রাম পূজা করিলে ভবিষ্যৎ-জীবনের কামনাও পূর্ণ হয়।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

দ্বিতীয় পর্ব

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ তাঁর পূর্বাশ্রম-জীবনের একটি ঘটনা

জ্যোতির্ময় বসুরায়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জীবনচরিতে দেখি, তিনি কয়েক বছর সসম্মানে উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের (তখনকার North Western Province) পূর্তবিভাগে কাজ করার পর চাকরিতে ইস্তফা দেন, অতঃপর যোগ দেন আলমবাজার মঠে। তখন তিনি পরিচিত তাঁর পূর্বাশ্রমের 'হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়' নামে। তাঁর ঐ পদত্যাগ-প্রসঙ্গ বর্তমান নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সরকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে হরিপ্রসন্ন কতকাল কাজ করেছিলেন? ঠিক কতকাল বলা কঠিন। কারণ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রম-জীবনের অনেক ঘটনা যেমন অজ্ঞাত, তেমনই অজ্ঞাত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্ভুল সন-তারিখও। দুঃখের বিষয়, যথাসময়ে এসব লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়নি। সে যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুধাবন করে বলা যেতে পারে, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে তাঁর কর্মকাল আনুমানিক পাঁচ-ছয় বছর (১৮৯২-৯৩—১৮৯৭ খ্রিঃ)। গাজীপুর হরিপ্রসন্নের প্রথম কর্মস্থল। গাজীপুরে যখন তিনি সরকারি ইঞ্জিনিয়ার, সেইসময়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। স্বামী অভেদানন্দজীর সূত্রে আমরা এই তথ্য পাই।[১] হরিপ্রসন্নের জীবনচরিতে তাঁর কয়েকটি কর্মস্থলের নাম দেওয়া হয়েছে, যথা—গাজীপুর, মীরাট, বুলন্দশহর এবং এটা (মতান্তরে এটাওয়া)। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, তিনি ভারত সরকারের অধীনে মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলেরও কয়েকটি স্থানে কর্মরত ছিলেন। পদত্যাগের সময়ে হরিপ্রসন্ন ছিলেন এটাওয়া জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকের কোনো এক সময়কে এই পদত্যাগ-ঘটনার কাল হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন তারিখে ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা একটি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। স্বামীজী লিখেছেন ঃ "যেসব ছেলে [আলমবাজার মঠে] শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতে এটি

---

১ আমার জীবনকথা, ১ম সংস্করণ (১৯৬৪ খ্রিঃ), পৃঃ ১৫০

একটি উচ্চপদ। সে খড়কুটোর মতো ঐ-পদ পরিত্যাগ করেছে।"[২] 'তাদের একজন' বলতে স্বামীজী অবশ্যই তাঁর স্নেহের গুরুভাই 'পেসন' তথা হরিপ্রসন্নের কথাই বলেছেন। স্বামীজীর পত্রে উক্ত ঘটনার উল্লেখ এই প্রথম। মনে হয়, যেসময়ে তিনি ঐ চিঠি লিখেছেন, তার খুব বেশি আগে ঘটনাটি ঘটেনি।

হরিপ্রসন্ন এটাওয়া শহরে উক্ত সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে স্বামী প্রেমানন্দজী বৃন্দাবন থেকে পীড়িত কালীকৃষ্ণ মহারাজকে (স্বামী বিরজানন্দ) তাঁর কাছে পাঠান। কিছুদিন পরে স্বামী প্রেমানন্দজী নিজেও গুরুভাইয়ের কাছে উপস্থিত হন। দু-জনে হরিপ্রসন্নের গৃহে প্রায় এক মাস ছিলেন। হরিপ্রসন্নের সেবাযত্নে কালীকৃষ্ণ মহারাজের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। স্বামী প্রেমানন্দজী ও কালীকৃষ্ণ মহারাজ এটাওয়া থেকে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার অল্পকাল পরে হরিপ্রসন্ন চাকরিতে ইস্তফা দেন।

তাঁর এই পদত্যাগ সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের জন্য—ঈশ্বরসাধনায় জীবন সম্পূর্ণ নিবেদনের জন্য। তিনি চাকরি করেছেন কিছু দায়িত্ব পালনের তাগিদে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় মাতৃঋণ ইত্যাদি কয়েকটি ঋণশোধের জন্য। জননী নকুলেশ্বরী দেবীর ভরণপোষণ এবং ছোট ভাই হরিকমলের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য তাঁর কিছু অর্থ উপার্জন করার প্রয়োজন ছিল—এছাড়া জ্যাঠামশায়ের সংসারের প্রতিও তাঁর কর্তব্য ছিল, কারণ বাল্যকাল থেকে পিতৃহীন হরিপ্রসন্ন বড় হয়েছিলেন জ্যাঠামশায়ের অভিভাবকত্বে।

হরিপ্রসন্ন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিহ্নিত ত্যাগি-সন্তানদের অন্যতম। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন হরিপ্রসন্নকে (তখন তিনি কলেজের ছাত্র) বিশেষ কৃপা করে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর সাধনপীঠ পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে পাঠিয়েছিলেন। ধ্যানান্তে হরিপ্রসন্নকে নিজের ঘরে ফিরিয়ে এনে তাঁকে সাধনভজন সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের গতি সম্পর্কেও স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, "দেখ, মেয়েমানুষের দিক মাড়াসনি। খুব সাবধানে থাকবি। সংসারের আঁচটিও যেন গায়ে না লাগে। সোনার মেয়েমানুষ ভক্তিতে গড়াগড়ি দিলেও সেদিকে ফিরে তাকাবিনি। তোকে একথা কেন বলছি জানিস? তোরা হলি মায়ের লোক; তাঁর অনেক কাজ তোদের করতে হবে। ...তাই বলছি খুব সাবধানে থাকবি।"[৩] তিনি ঠাকুরের উপদেশ-নির্দেশ সর্বদা

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪

৩ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, এলাহাবাদ, (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৪

অক্ষরে অক্ষরে, নিঃসংশয়ে মেনে চলতেন—একথা আমরা জানি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বৃত হওয়ার কয়েক বছর আগে পর্যন্তও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করার সুযোগ স্ত্রী-ভক্তেরা পেতেন না। এলাহাবাদ মঠে তাঁর অবস্থানকালে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্ত্রীলোকের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকী, তাঁর নিকটতম আত্মীয়ার পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছিল। প্রশ্ন হতে পারে, হরিপ্রসন্নর চাকরি করা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল? আলাদা করে এবিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কোনো কথা হয়েছিল কি না আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, সাংসারিক দায়দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি বারবার মাতৃঋণ শোধ করবার কথা বলেছেন; অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের কথাও বলেছেন। হরিপ্রসন্নের প্রতি ঠাকুরের উপদেশের মূলকথাটি হলো ঃ "সংসারের আঁচ যেন গায়ে না লাগে।" সেবিষয়ে হরিপ্রসন্ন খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি যে 'মায়ের লোক' সেকথা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। আমরা অনুমান করতে পারি, চাকরি করতে করতেও তিনি চাকরিতে ডুবে থাকেননি, বরং সংসারত্যাগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। চাকরির একান্ত প্রয়োজন দূর হয়নি বলে সরকারি কর্মটি ছাড়তে পারছিলেন না এবং কবে সেই প্রয়োজন মিটে যাবে, কবে সেই প্রার্থিত দিনটি আসবে—তার দিকে নিশ্চয় তিনি সাগ্রহে তাকিয়ে থেকেছেন।

তাই, স্বামী প্রেমানন্দজী এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজ এটাওয়া থেকে বিদায় নেওয়ার অল্পকাল পরে হরিপ্রসন্নের পদত্যাগ অপ্রত্যাশিত নয়। তবুও ঘটনাটা যেন ঈষৎ আকস্মিক মনে হয়। প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত—পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যেই কি তিনি তাঁর মা, ভাই এবং জ্যাঠামশায়ের সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? সেকালে কোনো জেলার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের বেতন তিন-চারশো টাকার বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না—বিশেষত, যদি তিনি ভারতীয় হন। তাছাড়া, তাঁর কর্মজীবনের প্রথমেই নিশ্চয় তিনি কোনো জেলায় ভারপ্রাপ্ত Executive Engineer ছিলেন না, তাঁকে সম্ভবত তা শুরু করতে হয় Assistant Engineer হিসাবে এবং সেই পদের বেতনও অনেক কম হওয়ার কথা। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, বেতনের টাকা থেকে প্রতি মাসে তিনি আলমবাজার মঠে ষাট টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এই সংবাদ তাঁর প্রকাশিত জীবনবৃত্তান্তে দেওয়া হয়েছে। নিজের খরচের ব্যবস্থা রেখে কিছু টাকা তিনি প্রতিমাসে অবশ্যই মা ও জ্যাঠামশায়কে পাঠাতেন। সেক্ষেত্রে পাঁচ-ছয় বছরে মা ও ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ-প্রয়োজন মেটানোর জন্য কত টাকাই বা তিনি জমিয়ে

রাখতে পারেন? স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে দেখা যায়, তাঁর মনে কোনো ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলে সেটা কাজে পরিণত করবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠতেন, তখন বিলম্ব সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু, সাধারণত তিনি পূর্বাপর বিবেচনা করে শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজে অগ্রসর হতেন। এটাওয়াতে স্বামী প্রেমানন্দজী এবং কালীকৃষ্ণ মহারাজ তাঁর গৃহে অতিথি হওয়ার আগে হরিপ্রসন্নের চিত্তে আশু চাকরিত্যাগের পরিকল্পনা দানা বেঁধেছে, এমন কোনো ইঙ্গিত আমরা কোথাও পাই না। তবে তাঁরা বিদায় নেওয়ার অনতিকাল পরে তিনি পদত্যাগ করলেন কেন? যা আগেই বলা হয়েছে, কতকটা আকস্মিক মনে হয়! ইতিমধ্যে এমন কিছু কি ঘটেছিল, যা তাঁর চিত্তে সংসার সম্পর্কে বৈরাগ্য অত্যন্ত তীব্র করে তোলে? এবিষয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-সম্বন্ধে প্রকাশিত জীবনচরিতের অন্তর্ভুক্ত দুটি তথ্য অনুধাবনযোগ্য—

(১) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে স্বামী অপূর্বানন্দ বলেছেন : "এটাওয়াতে বাবুরাম মহারাজের সঙ্গ পেয়ে হরিপ্রসন্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও গুরুভাইদের নানা প্রসঙ্গ হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত কী যেন এক নেশার ঘোরে। হরিপ্রসন্ন প্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক শুনতে পেলেন। ...তিনি ক্রমে অস্থিরপ্রাণ হয়ে পড়লেন। চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না।"[৪]

(২) স্বামী জগদীশ্বরানন্দের লেখা বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনীগ্রন্থে বলা হয়েছে : "তিনি (হরিপ্রসন্ন) যখন চাকরি ত্যাগ করেন তখন উপরিস্থ কর্মচারী তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে প্রমোশন দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার জ্যাঠামহাশয় বিবাহ দিবার জন্য তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। সেই জন্য তিনি বিরক্ত হইয়া চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।"[৫]

এই দুটি সংবাদ মিলিয়ে দেখলে হরিপ্রসন্নের চাকরিত্যাগের তাৎক্ষণিক হেতু কতকটা উপলব্ধি করা যায়। পদত্যাগ তিনি অবশ্যই করতেন—তবে যখন চাকরি ছাড়লেন, এমনিতে হয়তো তার দু-এক বছর পরেও ছাড়তে পারতেন। দেখা যাচ্ছে, সিদ্ধান্তটি ত্বরান্বিত হয়েছে—প্রথমত, প্রেমানন্দজীর মাসব্যাপী সঙ্গের প্রভাবে এবং দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের দিক থেকে তাঁকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করার বিরক্তিতে।

৪ সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ৪

৫ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, এলাহাবাদ (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২

বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি সম্বন্ধে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ যা বলেছেন, সেপ্রসঙ্গে বর্তমান নিবন্ধকার একটি অতিরিক্ত তথ্য লাভ করেছেন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে। সেটি জানা গিয়েছে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বাশ্রমের ছোট ভাই হরিকমল চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে। বারুইপুর শহরের নিকটবর্তী দক্ষিণ গোবিন্দপুরে শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন প্রায়-অশীতিবর্ষীয়া) তাঁর সাংবাদিক-পুত্র জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে সে-দিন যা বলেছিলেন, সেই কাহিনি বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিছু আলোকপাত করবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যে-ঘটনা বর্ণনা করেন, সেটি তিনি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুমা অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দজীর জননী নকুলেশ্বরী দেবীর কাছে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণিত কাহিনির মর্মকথা এই ঃ

সরকারি কর্মে নিযুক্ত হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই হরিপ্রসন্নের অভিভাবকদের দিক থেকে তাঁর বিবাহের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু বিবাহে হরিপ্রসন্নের ঘোর আপত্তি। এব্যাপারে তিনি কোনোমতেই রাজি নন। কিছুকাল পরে তাঁর জ্যাঠামশায় একটি কৌশল করেন। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী, নকুলেশ্বরী দেবী অর্থাৎ হরিপ্রসন্নের মাতৃদেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত—এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেওয়া হয় হরিপ্রসন্নর কর্মস্থলে (এটাওয়া)। ইতিপূর্বে পাত্রী মনোনীত করে রাখা হয়েছিল। তারবার্তায় হরিপ্রসন্নকে অবিলম্বে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল বেলঘরিয়ায় তাঁদের গৃহে। যে-দিন বেলঘরিয়ায় তাঁর এসে পৌঁছানোর কথা, পাত্রীকে সে-দিন পূর্বাহ্ণে ঐ বাড়িতে আনিয়ে একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। হরিপ্রসন্ন গৃহে পদার্পণ করে প্রথমেই 'মা কেমন আছেন' জানতে চাইলেন। দেখলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা কী, তিনি তখনো অনুমান করতে পারেননি। বিস্মিত, বিভ্রান্ত পুত্রের হাত ধরে নকুলেশ্বরী দেবী তাঁকে বিশেষ ঘরটির সামনে নিয়ে এলেন। অতঃপর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা কন্যাটিকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটিকে বধূরূপে তাঁর পছন্দ হয় কি না। হরিপ্রসন্ন কন্যাটির পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁকে মাতৃসম্বোধন করেন এবং ঘরের বাইরে থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। পরক্ষণেই তিনি নিজের মায়ের দিকে ফিরে তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর কালবিলম্ব না করে জননীকে বলে ওঠেন, "মা, আমি চললাম।" কিন্তু সামান্য অগ্রসর হয়ে তিনি দেখলেন, ইতিমধ্যে সদর দরজা কুলুপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি বাগানে এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে গৃহত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে আবার তিনি

গুরুজনদের উদ্দেশে প্রণাম জানান।[৬] এভাবে তিনি একবস্ত্রে ফিরে যান কর্মস্থল এটাওয়ায়। এই ঘটনার পরেই তিনি চাকরি ছেড়ে মঠে যোগ দেন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনীতে তাঁর পূর্বাশ্রমের জীবনবৃত্তান্তে যে-ফাঁক বা শূন্যস্থান ছিল, শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণিত উক্ত কাহিনি সেটি পূরণ করেছে বলে মনে হয়। বাল্যকাল থেকেই হরিপ্রসন্নের চরিত্রে ছিল একটি লক্ষণীয় দৃঢ়তা। কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল অবিচল আদর্শনিষ্ঠা। 'প্রাণে প্রাণে ঠাকুরের ডাক' শুনতে পেয়েও যে তিনি চাকরিত্যাগ করতে পারছিলেন না, তার মূলে ছিল কর্তব্যবোধ। কিন্তু, টেলিগ্রাম-ঘটিত ব্যাপারে তিনি যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারপর সংসারের প্রতি তাঁর আর কী দায়িত্ব, কী কর্তব্য থাকতে পারত! শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবশ্যই তাঁর উপদেশে পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যপালনের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪/২৩৮) বলেছেন, "...সংসারে বাপ-মা পরম গুরু; যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়...।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ১৩৫) সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি বলেছেন, "...কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ-মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায়, তাতে দোষ হয় না।" (তদেব) বস্তুত, ধর্মজীবনের পক্ষে যা বাধা, সেই প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিতে তিনি কখনও উপদেশ দেননি, বরং তা অতিক্রম করতেই বলেছেন। হরিপ্রসন্নের ধর্মজীবনের পথে যে-ভয়ঙ্কর বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটি শাপে বর হয়ে ওঠে তাঁর ক্ষেত্রে। ঘোর বিপদে তিনি ঠাকুরের উপদেশ ক্ষণমাত্রের জন্যও বিস্মৃত হননি। অভিভাবকদের মনোনীত কন্যাকে তিনি মাতৃজ্ঞান করেছেন, প্রণাম করেছেন তাঁকে। তারপর অবিলম্বে কর্মস্থলে ফিরে নিজের করণীয় স্থির করে ফেলেছেন। সংসারের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের প্রশ্ন, তখন ঘটনার প্রবাহে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, সংসারকে (মায়ের ভরণপোষণ ইত্যাদির

---

৬ শ্রীমতী প্রমীলা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণিত কাহিনির পরবর্তী অংশটুকু এখানে যোগ করা যেতে পারে। যে-কন্যাকে বেলঘরিয়ায় তাঁদের বাড়িতে আনা হয়েছিল, হরিপ্রসন্ন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে সঙ্কট উপস্থিত হয়। কন্যাপক্ষকে শান্ত করবার জন্য তখন হরিপ্রসন্নের অনুজ হরিকমলের সঙ্গে সেই পাত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা হয়। যথাসময়ে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয়নি। বিবাহের পর কন্যাকে তাঁর পিতা নিজগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তিনি পিতৃগৃহে ব্রহ্মচারিণীর মতো অবশিষ্ট জীবন কাটান। শুধু সামাজিক দিক দিয়ে কন্যাপক্ষের মুখরক্ষার জন্যই যেন পূর্বোক্ত বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। যাহোক, হরিকমলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয়। হরিকমল চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তান শ্রীমতী প্রমীলা দেবী।

জন্য) যা তিনি দিতে পেরেছেন, তা-ও নিতান্ত সামান্য নয়। তাঁর মূল্যবান জীবনের কয়েকটি বছরই তো সংসারের সেবায় অতিবাহিত হয়েছিল। সে যাহোক, আর চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) তাঁকে খুব উৎসাহিত করেন। তাছাড়া ঐসময়ে হরিপ্রসন্ন অতীন্দ্রিয় অনুভবে কর্মত্যাগের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশও লাভ করেন। অতঃপর আর একমুহূর্তও বিলম্ব করতে পারেননি তিনি। কর্তৃপক্ষকে চাকরিত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন একটি তারবার্তার মাধ্যমে।[৭] অতএব, পদোন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে তখনকার দিনের বিশেষ সম্মানজনক পদটি তিনি স্বামীজীর ভাষায় 'খড়কুটোর মতো' ত্যাগ করে চলে এসেছেন আলমবাজার মঠে।

ওপরের আলোচনায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের জননী নকুলেশ্বরী দেবী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। এই সূত্রে নকুলেশ্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর এই সন্ন্যাসি-পুত্রের সম্পর্কটিও সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

নকুলেশ্বরী দেবীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। পুত্রও ছিলেন ঠিক তেমনই দৃঢ়চেতা; তদুপরি ধর্মনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ। হরিপ্রসন্ন তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ও সাধনার ক্ষেত্রে জননীর আনুকূল্য লাভ করেননি। দক্ষিণেশ্বরে কখনো কখনো পুত্রের রাত্রিবাস যে মায়ের মনঃপূত হতো না, সেকথা বলাই বাহুল্য। পরে পুত্রকে সংসারে বদ্ধ করার চেষ্টাতে ছিল জননীর বিশেষ ভূমিকা। জননীর কাছ থেকে তাই হরিপ্রসন্নকে বিদায় নিতে হয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

শিশুকাল থেকে তিনি মাকে যতটা ভালবাসতেন, ততটাই ভয় করতেন। বস্তুত, জননী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ভয় মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকত। মঠে যোগ দেওয়ার পর তিনি মায়ের সম্মুখে কিছুতেই উপস্থিত হতে চাইতেন না—সম্ভবত, পাছে মা তাঁর সন্ন্যাসজীবনে কোনো বাধার সৃষ্টি করেন, অথবা নতুন করে তাঁকে সংসারে টানবার চেষ্টা করেন। বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে যখন মঠের অবস্থান, সেসময়ে একদিন নকুলেশ্বরী দেবী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রথমে দেখা করতে রাজি হননি। গুরুভাইরা অনেক বুঝিয়ে বলার পরে তিনি এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন—তাঁকে প্রণাম ও দু-একটি বাক্যবিনিময় করে কোনোরকমে এই সাক্ষাৎকার-পর্ব সম্পন্ন করেন।

---

৭ দ্রষ্টব্য ঃ Swami Nirmalananda—His Life and Teachings, by His Disciples, Devotees and Admirers, Malabar Sri Nirmalananda Temple Committee, 1943, p. 35

এরপর দীর্ঘকাল মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। একদা যেমন পরমহংসদেবের কাছে পুত্রের যাতায়াত নকুলেশ্বরী দেবীর ভাল লাগত না, পরবর্তিকালে তেমনই পুত্রের সন্ন্যাসজীবন বরণ করে নেওয়ার ব্যাপারটিও তিনি প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। এই নিয়ে একটা ক্ষোভ তিনি বহুদিন ধরে অন্তরে লালন করেছিলেন। শেষজীবনে তাঁর এই মানসিকতার পরিবর্তন হয়। তখন তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন।

এরপর মাতা-পুত্রের মিলন হয় ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে, নকুলেশ্বরী দেবীর মনোভাব তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। প্রয়াগে তখন কুম্ভমেলা। নকুলেশ্বরী দেবী কুম্ভস্নানের জন্য ঐসময়ে এলাহাবাদে এসে বিজ্ঞানানন্দজীর মুঠিগঞ্জ আশ্রমে উঠেছিলেন এবং সেখানে বাস করেছিলেন মাসাধিককাল। ইতিপূর্বে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কোনো স্ত্রীলোককে মঠে বাস করার অনুমতি দেননি। একবার তাঁর পূর্বাশ্রমের ভগিনী এলাহাবাদে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। নিজের ভগিনীর ক্ষেত্রেও মহারাজজী তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাননি, তাঁর নির্দেশে নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায় ভগিনীর থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এবার মায়ের বেলায় আর সেই নিয়ম খাটেনি। নকুলেশ্বরী দেবীর এলাহাবাদ মঠে অবস্থানকালে মহারাজজী তাঁর সেবাযত্নের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ) বলেছেন ঃ "এবার দেখিলাম, মায়ের কত সেবাই তিনি নিজে করিলেন। বহুকাল পরে সর্বত্যাগি-সন্ন্যাসী জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট থাকিবার সুযোগ পাইয়া জননীও পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বন্ধু সচ্চিদানন্দ মিত্রের উপর মহারাজজী তাঁহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরানিকে ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করাইবার দায়িত্ব দিয়াছিলেন। বন্ধুবর বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত তাঁহার এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন। ...

"মাতৃদেবী যতদিন আশ্রমে ছিলেন, আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইতাম, মহারাজজী যেন ছোট একটি শিশুর মতো তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিতেন। ...মহারাজের সন্ন্যাসজীবনে তাঁহার অপূর্ব নিষ্ঠা ও তিতিক্ষা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া জননী বলিয়াছিলেন, 'বাবা, তুই ঠিক পথই বেছে নিয়েছিস, ভগবান তোর মনের বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন।'"[৮]

মায়ের মনোভাবের এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েক জন ভক্তকে বলেন, "মা আমাকে এবার খুব আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা দিয়ে গেলেন। মা সংসারের জ্বালায় এতদিন ভুগে এখন বুঝেছেন, আমি

৮ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় সঙ্কলিত, কলকাতা, (১৯৭৭ খ্রিঃ), পৃঃ ৩০১-৩০২

যে পথে চলেছি, সেটাই পরম শান্তির পথ। তাই মা এবার খুব প্রাণখুলে আশীর্বাদ করেছেন...।”[৯]

এলাহাবাদ থেকে বেলঘরিয়ায় প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে, সম্ভবত ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে নকুলেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর চিত্তে তখন অশান্তির লেশমাত্র ছিল না।

জননীর দেহত্যাগের সংবাদপ্রাপ্তির পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কয়েক জন ভক্তকে বলেন, “দেখো, আমার মা স্বর্গে গেছেন। তিনি এখান (এলাহাবাদ মঠ) থেকে যাবার দিন আমাকে অনেক আশীর্বাদ করে গেলেন, সেই থেকে আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।”[১০]

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯০তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

৯ প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসুরায় সঙ্কলিত, কলকাতা (১৯৭৭ খ্রিঃ), পৃঃ ৩০২

১০ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, পৃঃ ৮৬-৮৭

এলাহাবাদে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শিউগোলাম

(১)

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের বিষয়ে অনেক কথাই উদ্বোধন পত্রিকাতে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এলাহাবাদে তিনি কীভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন ও কীরূপ কঠোর জীবনযাপন করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ সেই সম্বন্ধে আমি এইখানে আলোচনা করিব।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বেলুড় মঠে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় মঠ হইতে যাত্রা করেন ও নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ঐ বছরেরই শেষভাগে জৌনপুরে আগমন করেন। তাঁহার পূর্ববন্ধু শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় তখন জৌনপুরের সাব-জজ পদে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। মহারাজ তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরবর্তিকালে শ্রীশবাবু 'বিদ্যার্ণব' ও 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সুবৃহৎ পাণিনীয় ব্যাকরণ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া 'সেক্রেড বুক অব হিন্দুজ' নামে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বজীবনে মহারাজ যখন গাজীপুরে কর্ম করিতেন, সেইসময় শ্রীশবাবু সেইখানে মুন্সেফ ছিলেন। সেইখানেই উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হন। শ্রীশবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার বামনদাস বসু মহাশয়ও (মেজর আই.এম.এস.) মহারাজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে ইঁহাদের গর্ভধারিণীও মহারাজকে পুত্রবৎ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। ঘটনা-পরম্পরায় ইঁহাদের কথা অনেক স্থানে পাওয়া যাইবে।

মহারাজ যখন গাজীপুরে কর্ম করিতেন সেইসময় তিনি কয়েক বার মহাত্মা পওহারীবাবার সঙ্গ করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা তাঁহার নিজমুখ হইতেই অনেক বার শুনিয়াছি। একবার ঐ স্থানেই পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পরিব্রাজক অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন এবং মহারাজের নিকটে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় ও ভগবৎ-চর্চায় কয়েক দিন যাপন করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। মহারাজের তখনকার নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

পরিব্রাজক অবস্থায় নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাজ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের

শরৎকালে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে আগমন করেন। তাঁহার বন্ধু, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয় (অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন) তখন এলাহাবাদেই বাস করিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া মহারাজ কয়েক দিন তীর্থবাস করিতে মনস্থ করিলেন।

শ্রীভগবানের কী ইচ্ছা, সাধারণ মানব তাহা কীরূপে বুঝিবে! শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁহার নাম ও ভাব প্রচার করাইয়া জীব উদ্ধারের জন্য এবং নিজ লীলাসহচরের দ্বারা এই প্রাচীন তীর্থ ও তাঁহার পূর্ব অবতারের লীলাস্থল পুনঃসংস্কার করিবার অভিপ্রায়েই কি পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন? ঐ মহাতীর্থে মঠ স্থাপন করিয়া সাধনভজন করিতে তিনি কোথা হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে! প্রয়াগে তাঁহার কতই না অলৌকিক দর্শন ও উপলব্ধি হইয়াছে! সেইসকল কথা যখন তাঁহার মুখে শুনিতাম তখন লিখিয়া রাখি নাই, এই জন্য আজ অনুশোচনার অন্ত নাই। কত কঠোর তিতিক্ষায়, তপস্যায়, গভীর সাধনভজনে ও অধ্যয়নে তিনি জীবনযাপন করিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গে মঠ ও মিশনের বহু স্থানে আশ্রম, বাড়ি প্রভৃতির নক্সা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ি তৈরি করানো প্রভৃতি সমস্তই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্পাদন করিতেন।

কীভাবে তিনি প্রয়াগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে একটু পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে বি.এ. পড়িবার সময় শরচ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় বায়ু পরিবর্তনের জন্য এলাহাবাদে আগমন করিয়াছিলেন। কলকাতায় থাকিবার সময় হইতেই তিনি বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে যাতায়াত করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলকাতার বিবেকানন্দ সোসাইটি এবং পার্সিবাগান শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির স্থাপয়িতা ও অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়াও তিনি একটি শিবমন্দিরের ছোট ঘরে ঠাকুরের পট রাখিয়া পূজা ও কথামৃতাদি পাঠ করিতেন। তাঁহার সাহচর্যে স্থানীয় বাঙালি তরুণদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঐ-ভাব বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ঐ বৎসরেরই কোনো একসময়ে উক্ত তরুণদের মধ্য হইতে কয়েক জন শুভসংস্কারবিশিষ্ট তরুণ একত্রে মিলিয়া শরৎবাবুর সহায়তায় একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া লইলেন ও 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব' নাম দিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিলেন। সানন্দচিত্তে শরৎবাবু ইহার সকল কার্যভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে কলকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইল। শরৎবাবু চলিয়া

যাইবার পর ক্লাবের ভার যাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল, তাঁহাদের সকলেই তখন তরুণ। ক্লাব চালাইবার ও ঠাকুরসেবাদির ব্যয় বহন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কাহারো ছিল না। ধীরে ধীরে ক্লাবের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

ক্লাবের এইসকল তরুণেরা শুনিতে পাইলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ-শিষ্য ও বেলুড় মঠের একজন বিশিষ্ট সাধু এলাহাবাদে পদার্পণ করিয়া মুঠিগঞ্জে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহাশয়ের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ তাঁহাদের নিকট দৈবাদেশের মতোই মনে হইল। কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সাধুদর্শনে উক্ত ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে, মহারাজ তখনো ধ্যানভজনে নিজ আসনে বসিয়া আছেন। কয়েক দণ্ড পরে আসিলে তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে।

এইখানে একটি কথা বলা দরকার। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কথা বলিতে গিয়া আরো অনেকের কথা আমাকে বলিতে হইবে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। যাঁহাদের অথবা যেসকল ঘটনার সহিত পূজনীয় মহারাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত হইয়াছিলেন, একটু দূরের হইলেও সেইসকল বিষয় বর্ণনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তখন ক্লাবের তরুণেরা নিকটস্থ কীটগঞ্জে পরম ভাগবত মাধোদাস বাবাজী মহারাজকে ইত্যবসরে দর্শন করিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। বাবাজীর বয়স তখন ৭৫/৮০ বৎসর হইবে। তাঁহার আখড়ায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহের নিত্যসেবা ছিল। বার্ধক্যবশতঃ বাবাজী নিজে আর শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে পারিতেন না। সেই জন্য ঐ কাজে তিনি একজন ব্রাহ্মণ-পূজারি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কোনো শিষ্য করেন নাই, একান্তে থাকিয়া সাধনভজন ও ভাগবতাদি গ্রন্থ আলোচনায় দিন কাটাইতেন। বিজ্ঞান মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, তিনি নিজেও মাঝে মাঝে ঐ বাবাজীকে দর্শন করিতে যাইতেন।

ক্লাবের তরুণগণকে দেখিয়া বাবাজী অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বাবা, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ব্রাহ্মণ থাক, তাহলে দয়া করে আমার রাধাগোবিন্দের এবেলার সেবাটি চালিয়ে দাও। অন্যদিন এসময় সেবা-পূজা সবই হয়ে যায়। আজ না জানি ব্রাহ্মণের কী হয়েছে! এখনো তাঁর দেখা নেই।"

তরুণদের মধ্য হইতে একজন যথাবিহিত সেবা-পূজাদি সম্পাদন করিলে বাবাজী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সকলকে প্রচুর আশীর্বাদ করিলেন। এইভাবে বাবাজীর আশীর্বাদ লাভ করাতে তরুণদের মনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইল।

অন্তরে যে-উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে—এইপ্রকার একটি ভাব প্রত্যেকের মনেই উদিত হইল। যথাসময়ে তাঁহারা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মহারাজের দর্শন লাভ করিলেন ও তাঁহার নিকট ক্লাবের অবস্থা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা মহারাজকে বলিলেন, "যদি কৃপা করে মহারাজ এক বার আমাদের ক্লাবে পদার্পণ করেন এবং কয়েক মাস সেখানেই বাস করেন, তাহলে আমরা আপনার পূতসঙ্গ ও উপদেশাদি লাভ করে ধন্য হতে পারি। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, সেবাদি ও সৎ-আলোচনায় কাটিয়েছি। তাতে আমাদের বিশেষ উপকার হচ্ছে। আমরা অনেকেই সৎ-ভাবে জীবনগঠনের অনুপ্রেরণা এখান থেকেই পাচ্ছি।"

তরুণদের ঐ আন্তরিক আবেদন মহাপুরুষের কোমল অন্তঃকরণ স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তরুণগণ তাঁহাদের ক্লাবের বর্তমান অচল অবস্থার কথাও নিবেদন করিলেন। মহারাজ বলিলেন, "আমি শিগ্‌গিরই এক বার তোমাদের ক্লাবে গিয়ে দেখব। যদি আমার মনোমতো হয় আর অনুকূল বুঝি, তাহলে সেখানে থেকেও যেতে পারি।"

মহারাজের ঐকথায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া তরুণেরা প্রস্থান করিলেন। কয়েক দিন পর মহারাজও তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য ক্লাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লাবের বাড়ি-ঘর, পূজার ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল এবং দিন কয়েক পরেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি হইতে তথায় চলিয়া গেলেন।

যে ভাড়াবাড়িতে ক্লাবটি অবস্থিত ছিল এবং যেখানে পূজনীয় মহারাজ একাদিক্রমে দশ বৎসর কঠোরভাবে কাটাইয়াছিলেন, তাহার একটু বিস্তারিত বর্ণনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা একটি কাঁচা গাঁথনির ত্রিতল বাড়ি। ইহার দ্বিতল ও ত্রিতল মাত্র লইয়া প্রথম হইতেই ক্লাব স্থাপিত হয়। বাড়িটি অধুনালুপ্ত গুড্‌স্‌শেড রোড বা বর্তমান লিডার রোডের উপর উত্তরমুখে রাস্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। দোতলায় দুইটি ঘর। একটি বড়, আন্দাজ ১৮ ফুট × ১০ ফুট এবং ছোটটি ১০ ফুট × ১০ ফুট মাপের হইবে। ছোট ঘরটিতে ঠাকুরপূজা এবং বড় ঘরটি ক্লাবের পুস্তকাগার, বৈঠকখানা ও কীর্তনাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। ঘর দুইটির সম্মুখে উত্তরদিকে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা আন্দাজ ২৮ ফুট × ৮ ফুট একটি দালান এবং রাস্তার উপর ঐ প্রকার লম্বা ও তিন ফুট চওড়া

একটি ছাদবিহীন বারান্দা। ঐ বারান্দা হইতে তেতলায় যাওয়ার সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ছাদে পৌঁছানো যায়। ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট একটি খোলার রান্নাঘর, আর উত্তর-পূর্ব কোণে ছাদ-খোলা পায়খানা। এছাড়া, খানিকটা ছাদ গরমকালে শোয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। সেইখানে মহারাজ প্রায় দশটি গ্রীষ্ম ঋতুর রাত্রি কাটাইয়াছেন। একেবারে রাস্তা হইতে অপ্রশস্ত ও পশ্চিমা ধরনের উঁচু ধাপওয়ালা সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিতে হয়। ঐ সিঁড়িটি দোতলার দালান পর্যন্ত আসিয়াছে। উক্ত সিঁড়ি দুইটি দিয়াই মেথর পায়খানা সাফ করিতে যাইত। এই বাড়িতে জলের কল না থাকায় রাস্তার কল বা প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে জল আনিতে হইত। যে অংশটি ক্লাবের জন্য লওয়া হইয়াছিল, তাহার জন্য মাসিক ভাড়া মাত্র তিন টাকা দিতে হইত এবং উহার মালিক ছিলেন একজন নিম্নজাতীয় পশ্চিমা লোক।

পূজনীয় মহারাজ যে-দিন ক্লাব দেখিয়া আসেন, তাহার পরের রবিবারেই তিনি তাঁহার ব্যবহার্য অতি অল্প জিনিস ও পুস্তকাদি লইয়া ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্লাবের বড় ঘরটিকে তিনি পঠনপাঠন, উপবেশন ও রাতে শয়নের জন্য ব্যবহার করিতেন এবং ঠাকুরপূজার ছোট ঘরখানিতেই ধ্যানভজনাদি করিতেন। ক্লাবের কাজও পূর্ববৎ ঐ দুইটি ঘরেই চলিত। তেতলার রান্নাঘরে রান্না ও খাওয়া হইত। রান্না, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজ মহারাজ নিজেই করিতেন। এছাড়া সকালের ঠাকুরপূজাও প্রায়দিন তাঁহাকেই করিতে হইত। ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্ব হইতেই তিনি রোজ ধ্যানে বসিতেন এবং সকাল আটটার আগে উঠিতেন না। বিকালের পূজা, আরতি, সন্ধ্যা দেওয়া প্রভৃতি ক্লাবের তরুণেরাই করিতেন। মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, একবার বাসন মাজিবার সময় তাঁহার হাত কাটিয়া যায় এবং তজ্জন্য কয়েক দিন তাঁহাকে খুব কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঐসময় হইতেই ঐসকল কাজের জন্য একটি ঠিকা-চাকর নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ও তরুণেরা সকলে অধিকাংশ সময় বিকালের দিকেই আসিতেন এবং সন্ধ্যারতি, স্তবপাঠ প্রভৃতি শেষ করিয়া রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেন। ঐ সময়ের পর মহারাজ আর কাহাকেও ওখানে থাকিতে দিতেন না। ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি গীতার অধ্যাপনা করিতেন এবং স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যাহার যাহা বুঝিয়া লইবার থাকিত, বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, ঐসময় তিনি খুব প্রাণায়াম করিতেন; এছাড়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ব্যায়ামও করিতেন। অনেক দিন অভ্যাসের পরও প্রাণায়াম তাঁহার পক্ষে উপযোগী হইতেছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করেন।

শুনিয়াছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত মহাশয় প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন এবং সাধনে খুব উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাই মনে হয়, মহারাজও হয়তো তাঁহার পূর্বাশ্রম হইতেই প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য সকালে সাড়ে আটটায় পড়িতে বসিতেন এবং এগারো বা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত পড়াশোনা করিতেন। পড়াশোনার ব্যাপার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং উহাতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, রান্না-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুল হইয়া যাইত। কোথা দিয়া যে সময় চলিয়া যাইত তাহার খেয়াল থাকিত না।

ক্লাবের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রবাবু বলেন, "আমরা ক্লাবে গিয়ে দেখতাম, মহারাজ তখনো নিবিষ্টমনে পাঠে রত আছেন। আমাদের উপস্থিতিতে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হতো। তখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাঁর ভোজনাদি হয়নি। তখন বলতেন, 'ওহে, তোমাদের কারো বাড়ি থেকে কয়েকখানা রুটি ও একটু তরকারি এবেলার মতো আমাকে এনে দিতে পার?' আমরাও তাঁর আদেশমতো খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর খাবার এনে উপস্থিত করতাম।"

(২)

ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকিবার সময় পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রত্যহ সকালে সাধারণতঃ এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত লেখাপড়াদি করিতেন। অতঃপর রান্না ও আহার করিয়া কিছুসময় বিশ্রাম করিতেন। অপরাহ্ণ দুইটা আড়াইটার সময় তিনি ধ্যানে বসিতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত ধ্যান করিতেন।

ক্লাবে যখন তাঁহার প্রায় তিন বৎসর বাস হইতে চলিল, সেইসময় শুনিতে পাওয়া গেল যে ক্লাবের বাড়িটি বিক্রয় হইয়া যাইবে। ক্লাবের সভ্যেরা সকলেই এই সংবাদে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অবিলম্বে ঐ সংবাদ মহারাজকে জানাইলেন। বাড়ির নূতন মালিক যদি বাড়িটি আর ক্লাবকে ভাড়া না দেন, তাহা হইলে অন্য বাড়ি ভাড়া করিতে হয়তো বেশি টাকার দরকার হইবে। এদিকে ক্লাবের আয় বিশেষ কিছুই নাই। এইসব নানা কথা ভাবিয়া মহারাজও একটু উদ্বিগ্ন হইলেন।

অবশেষে তাঁহার অনুরোধে ও চেষ্টায় তাঁহার বন্ধু বামনদাসবাবুই ঐ বাড়িটি ক্রয় করিয়াছিলেন। বাড়ির মালিক হইয়া বামনদাসবাবু ক্লাবকেই আবার ভাড়া দিলেন, উপরন্তু জলের কল আনাইয়া দিলেন। সেই জন্য অবশ্য তিনি ক্লাবের

নিকট বেশি ভাড়া দাবি করিলেন না। বাড়িতে জলের কল আসাতে মহারাজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

মহারাজের সময়ানুবর্তিতা সত্যই আশ্চর্যজনক ছিল। তাঁহার সকল কাজই ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে চলিত। আমরা কখনোই তাহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। বালকেরা পর্যন্ত বুঝিত, ঠিক সময়ে তাঁহার নিকট পৌছিতে পারিলে তবেই তিনি তাহাদের পাঠ বুঝাইয়া দিবেন, একটু দেরি করিয়া পৌছিলে আর সেই দিন তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে না। ইহাতে বালকদের মধ্যেও সময়মতো কার্য করিবার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মহারাজ নিজে যেমন সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করিতেন, সকলকে তেমনই সময়ানুবর্তী হইতে অনুরোধ করিতেন। অযথা কালক্ষেপ করিতে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া কখনও তিনি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধবদের নিকট যাইতেন না অথবা গল্পগুজবে সময় নষ্ট করিতেন না। এলাহাবাদের পাবলিক লাইব্রেরি অথবা শ্রীশবাবুর গ্রন্থাগার হইতে কখনো কখনো পুস্তকাদি আনাইবার প্রয়োজন হইলে ক্লাবের ছেলেদের দিয়াই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতেন। বন্ধু বা আগন্তুক যদি কেহ কখনো তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাহা হইলে অল্পকথায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের বিদায় দিতেন। নচেৎ তাঁহাদের নিকট চুপ করিয়া থাকাই ছিল তাঁহার অভ্যাস।

কেহ তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিলে বলিতেন, "ছোটবেলায় বর্ণপরিচয় পুস্তকে যা যা পড়েছ, তা-ই জীবনে সাধন করো, অর্থাৎ 'সদা সত্যকথা বলিবে, কাহারো দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়'—এই দুটি যদি সাধন করতে পার, আর সবই তাহলে সহজ হয়ে যাবে।"

সবসময় সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর যেমন তাঁহার নজর থাকিত, অসাধারণ নিয়মনিষ্ঠাপূর্বক তপস্যা ও শাস্ত্রপাঠাদিতে তেমনই তিনি মগ্ন হইয়া যাইতেন। তাঁহার সেইসময়কার অবস্থার কথা ক্লাবের সভ্যগণ ও প্রতিবেশীরা আজও বলিয়া থাকেন, "এরকম আদর্শপুরুষের জীবনযাপন সবসময়ে সামনে দেখে আমরা যে কী পরিমাণ ধন্য ও উপকৃত হয়েছি, তার সীমা নির্ধারণ করা সাধ্যাতীত। এমন উচ্চশিক্ষিত, বৈরাগ্যবান, ধ্যান ও তপস্যাপরায়ণ সন্ন্যাসজীবন এবং এত নিবিষ্টভাবে শাস্ত্রালোচনাদি করা প্রকৃত মহাপুরুষ ছাড়া অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ তিনি আমাদের ভেতর থাকতেন—যেন আমাদেরই মতো একজন এবং দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমাদের সকল অপরাধ ও উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করতেন।"

তাঁহারা আরো বলেন, "সাধারণত লোকের যেমন থাকে, আমাদেরও সেরকম ধারণা ছিল যে, যোগি-তপস্বীরা বনে-জঙ্গলে থাকবেন এবং সংসারের সকল সম্বন্ধ, দয়া-মায়া ত্যাগ করে ছাই মেখে উলঙ্গ হয়ে কোনো গাছতলায় বাস করবেন, তবে তো ভগবানলাভ হবে। কিন্তু দেখলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ যথার্থই অসাধ্যসাধন করলেন এবং এটিই তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

তরুণগণকে লেখাপড়ায় এবং চরিত্রগঠনে তিনি কীভাবে সাহায্য করিতেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কাশী বাঙালিটোলা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন ঃ "পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ আমাকে বিজ্ঞান ও গণিতে প্রায়ই সাহায্য করিতেন। তাঁহার আদেশেই আমি গীতা পড়িতে আরম্ভ করি। মনে আছে—উহার অর্থ অতি সামান্যভাবে বুঝিয়া লইয়া গীতার কয়েক অধ্যায় মুখস্থ করিতে হইয়াছিল এবং কণ্ঠস্থ হইলে তাঁহাকে উহা শুনাইতে হইত। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা খুব ভাল জানিতেন। গ্রহ-তারকাদির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় তিনিই করাইয়া দেন। পরিশ্রম করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যখন তিনি বাংলাতে 'জল সরবরাহের কারখানা' ও 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' লিখিতেন, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও শক্তি দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইত। এলাহাবাদের গরমে দ্বিতলে একটি ঘরে বসিয়া এত কঠিন বিষয় ঐরূপ মেধা ও মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন করা যে কীরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা ধারণা করা সহজ নহে।

"এই 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' লিখিবার সময় পূজনীয় মহারাজ প্রায়ই শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন মিত্র নামক একজন ডি. এস. সি. ক্লাসের (সেইসময় অন্য প্রকার ক্লাস ও উপাধি বলা হইত) ছাত্রের সহিত ভরদ্বাজ আশ্রমের নিকটে সরকারি ছাত্রাবাসে যাইয়া আলোচনা করিতেন। আমাদের মতো ছোট ছেলেদের সহিত হাসি ও খেলা করিতেন, সময় সময় নানারকম তামাশাও করিতেন। ছেলেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত ও নিজের বলিয়া মনে করিত। সদাই তিনি সহাস্যবদনে থাকিতেন। আবার যখন গম্ভীর হইয়া আপনার নিয়মিত কার্যে রত থাকিতেন, তখন কাহারো সাধ্য হইত না যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হয় বা শব্দ করে। তাঁহাকে আমরা যেমন ভালবাসিতাম, তেমনি ভক্তি করিতাম, আবার ভয়ও করিতাম। অসময়ে তাঁহার নিকট আমাদের কাহারো যাইবার অনুমতি ছিল না। এই জন্য কখন যে তিনি সাধনভজন করিতেন, তাহা আমরা চোখে দেখি নাই। বিশেষত, তাঁহার যোগ-তপাদির সময় ক্লাবের ভিতর কাহারো যাইবার আদেশ ছিল না। আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে।"

'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' প্রণয়নকালে মিউয়র সেন্ট্রাল কলেজের (বর্তমান এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) গণিতশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে অনেক পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতে দিতেন এবং ঐবিষয়ে পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। এই কথা আমি তাঁহাদের দুই জনের মুখেই অনেক বার শুনিয়াছি। আরো দেখিয়াছি, উমেশবাবু এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ এলাহাবাদের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মহারাজের ত্যাগ-তপস্যা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। মহারাজের ব্যবহৃত জলের পুরাতন কুঁজোটি দেখিয়া মালব্যজী বলিতেন, "এটি শীঘ্রই বদলানো দরকার।"

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহারাজ সর্বদাই অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেন। শুনিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ দরকার। যদি সোনার প্রতিমা হয় এবং ভক্তিতে গড়াগড়ি যায় আর তা স্ত্রী-শরীর হয়, তাহলে সেদিকে ফিরেও চাইবি না।"

বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। ক্লাবে থাকিবার সময় কোনো স্ত্রীলোকের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না—এমনকী মেথরানি, গোয়ালিনি পর্যন্ত যাইতে পারিত না। শুনিয়াছি, তিনি যখন চাকরি করিতেন, সেইসময়ও এই বিষয়ে কড়া নিয়ম প্রতিপালন করিতেন।

কোনো একসময় তাঁহার একমাত্র জীবিতা সহোদরা বহুকাল তাঁহার দর্শন না পাওয়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পাটনা হইতে এলাহাবাদ মঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাও, এখনই একে ধর্মশালায় রেখে এসো। এখানে স্ত্রীলোকের থাকা হবে না।"

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণকুম্ভ-স্নান উপলক্ষ্যে যখন তাঁহার গর্ভধারিণী এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন, একমাত্র সেইসময় নিজ জননীকে এইখানকার মঠে রাখিয়া বহু ভক্তি সহকারে তাঁহাকে মাতৃসেবা করিতে দেখা গিয়াছিল। অন্যসময় একবার একজন ভক্তমহিলা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য মঠে আসিয়াছিলেন। মহারাজ আমাকে বলিলেন, "রাস্তার দিককার বারান্দায় একখানা চেয়ার দিয়ে মহিলাটিকে বসতে দাও।"

অতঃপর তিনি মহিলাটির সহিত মাত্র কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিয়াই মঠের ভিতর চলিয়া আসিলেন। সেবাশ্রমের জন্য খোলার চালের বহু

ঘরবিশিষ্ট একটা বড় বাড়ি খরিদ করা হইয়াছিল। উহাতে নিম্নশ্রেণির অনেক স্ত্রী-পুরুষ ভাড়া লইয়া বসবাস করিত। মেরামত করিবার জন্য ঐ বাড়িটির ভিতর যাইয়া মহারাজের একবার দেখিবার দরকার হইয়াছিল। বারবার চেষ্টা করিয়াও তিনি সেইখানে যাইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভেতরে যাবার জন্য আমি তো খুব চেষ্টা করছি, কিন্তু ফটকের কাছে গেলেই, কে যেন আমায় ভেতর থেকে ঠেলে বের করে দেয়। ঐ বর্জনীয় আবেষ্টনের মধ্যে যেতে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

সভ্যগণ ব্যতীত অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকও তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্বে ক্লাবে আসিতেন। এইসময় তিনি একজন অকৃত্রিম ভাগবত বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম গোবিন্দপদ বসু। প্রয়াগের আতর-সুইয়া মহল্লায় তিনি বাস করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় যখন তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়িতেন তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন এলাহাবাদ আসিয়াছিলেন তখন গোবিন্দপদবাবুর বাড়িতেই তিনি আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর জীবনী ও পত্রাবলির পাঠকগণ জানেন, স্বামীজীর এইসময়কার কয়েকটি ঘটনা গোবিন্দপদবাবুর সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

গোবিন্দপদবাবু সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি প্রায়ই ক্লাবে আসিতেন এবং মহারাজের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমরাও মাঝে মাঝে তাঁহার আবাসে যাইতাম। ক্লাবের কীর্তনাদিতে তিনি খুব আনন্দলাভ করিতেন। 'কীর্তনের সময় কেন খোল বাজানো হয় না?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে ক্লাবে কোনো খোল নাই, তখন তিনি কলকাতা হইতে একটি খোল আনাইয়া ক্লাবকে তাহা উপহার দেন।

যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, স্থানীয় সেবাশ্রমকে বহুরকমে সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ, স্বামীজীর জন্মোৎসবে ও তৎসংক্রান্ত দরিদ্রনারায়ণ সেবার অধিকাংশ ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন এবং নিজে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তিনি বলিতেন, "স্বামীজীর জন্মতিথি আমার মনে থাকে না, কিন্তু জন্মতিথির কিছুদিন আগে থেকেই স্বামীজীর দর্শন আমি ঘনঘন পেয়ে থাকি। কারণ কী, বোঝবার আগেই আপনাদের লোক গিয়ে স্বামীজীর জন্মোৎসবের খবর দেয়। তখনই ঐরকম দর্শনের কারণ বুঝতে পারি।"

গোবিন্দপদবাবুর নিয়ম ছিল—স্বামীজীর জন্মোৎসবের খবর পাইবার পর হইতে উৎসবের দিন পর্যন্ত তাঁহার ডাক্তারখানায় যাহা উপার্জন হইত, তাহার সমস্তই তিনি উৎসবে প্রদান করিতেন। তবে তাঁহার একটি বিশেষ অনুরোধ ছিল—তাঁহার ডাক্তারখানার প্রত্যেক দিনের উপার্জন আমরা যেন প্রত্যেক দিনই গিয়া লইয়া আসি। যদি কোনো বিশেষ কারণে কোনোদিন লোক পাঠানো সম্ভব না হইত, তাহা হইলে তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন।

গোবিন্দপদবাবুর অনাড়ম্বর ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। একবার তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার খবর আনিবার জন্য আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যই যাইতেন। একদিন একটু ভাল আছেন জানিয়া আমাদের একজন তাঁহাকে দেখিবার জন্য অন্দরমহলে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোবিন্দপদবাবু বলিলেন, "ভাই, তোমরা আমায় পায়ের ধুলো দাও। তোমরা ঠাকুরের নাম কর, তোমরা সাধারণ লোক নও।"

উৎসবাদিতে যখনই তিনি মঠে আসিতেন, অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তবে তাহা কণিকামাত্র; সঙ্গে প্রসাদ দিতে চাহিলে লইতেন না। বলিতেন, "না ভাই, বাড়িতে যদি কেউ প্রসাদের অমর্যাদা করে, তাহলে আমিই যে সে-অপরাধের জন্য দায়ী হব।"

বিজ্ঞান মহারাজ যতদিন ক্লাবে ছিলেন, প্রায়শই এক বার মাত্র আহার করিতেন। যদি কোনোদিন রাত্রিতে ক্ষুধার উদ্রেক হইত, তবে সামান্যমাত্র ওটমিল দুধে মিশাইয়া অথবা নামমাত্র একটু দুধ খাইয়া সেই রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। পশ্চিমাঞ্চলে তখনো কোক কয়লা বা পাথুরে কয়লা রান্নার কার্যে ব্যবহৃত হইত না বলিয়া ক্লাবে মহারাজের রান্নাবান্নার অত্যন্ত অসুবিধা হইত। সকলেই কাঠে রান্না করিত; তিনিও বাধ্য হইয়া তাহাই করিতেন। মহারাজের ঐরকম অসুবিধার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশবাবু প্রত্যেকটি আঠারো টাকা মূল্যের দুইটি প্রাইমাস স্টোভ ক্রয় করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এবং তাঁহার পরিবারের সকলেই মহারাজের সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকল সময়ে তৎপর থাকিতেন। শ্রীশবাবু ও তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের পুত্রেরাও খুব শ্রদ্ধার সহিত মহারাজের সেবা করিতেন। বাড়িতে কোনো বিশেষ রান্না বা খাবার তৈরি হইলে সর্বাগ্রে মহারাজের নিকট তাহা পাঠানো হইত। তাঁহারা মহারাজের সেবার জন্য প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে অর্থাদিও প্রদান করিতেন। বেলুড় মঠ অথবা অন্য কোনো স্থান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের

সন্ন্যাসি-শিষ্য যখনই এলাহাবাদ আশ্রমে আগমন করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদেরকে নিজবাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া এবং শ্রদ্ধাপূর্বক ভোজন করানো শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবুর অবশ্য করণীয় ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "শ্রীশবাবুরা এলাহাবাদে না থাকলে আমার এখানে থাকা অসম্ভব হতো।"

বিজ্ঞান মহারাজও তাঁহাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কষ্টসাধ্য হইলেও তাঁহাদের অনেক কাজ করিয়া দিতেন। প্রয়াগস্থ তাঁহাদের বিরাট বসতবাটিটি মহারাজের আঁকা নক্সা অনুযায়ী এবং তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইয়াছিল। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সকল সময়ই তাঁহারা মহারাজের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে মহারাজ যতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, সেইখানকার সমস্ত ব্যাপারই তিনি তত্ত্বাবধান করিতেন। নিজের ভিক্ষালব্ধ অর্থে তিনি ক্লাবের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যখন ক্লাবে ছিলুম তখন বড়ই আনন্দে ও নিশ্চিন্ত-মনে থাকতুম। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সামান্য যা-কিছু পেতুম—তাতেই বাড়িভাড়া, ঠাকুরসেবা ও নিজের খাওয়া-পরা চলে যেত।"

পূর্বজীবনে উচ্চ সরকারি চাকরি করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিলেও অর্থের উপর তাঁহার কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিবার অল্প কয়েক দিন পর, তাঁহার কয়েক জন মাদ্রাজি ভক্তকে কলকাতার মিউজিয়াম দেখাইয়া আনিবার জন্য বিজ্ঞান মহারাজকে আদেশ করেন। ইহার মাত্র অল্পদিন পূর্বে বিজ্ঞান মহারাজ সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণপূর্বক আলমবাজার মঠে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন। স্বামীজীর আদেশ পালন করিবার জন্য তিনি মাদ্রাজি ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে মিউজিয়ামে গমন করিলেন। সেইসময় তাঁহার পকেটে উপার্জিত অর্থের শেষ কুড়ি টাকা ছিল। মিউজিয়ামে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার পকেট খালি—কখন যে টাকা কয়টি চুরি হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শেষ সম্বলটুকু এইভাবে চুরি হইয়া যাওয়াতে ঠাকুরের উপর তাঁহার নির্ভরতা আরো বাড়িয়া গিয়াছিল।

যেসময় হইতে তিনি এলাহাবাদ ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে সেইখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সূত্রপাত

হইয়াছিল। সেইখানেই তিনি সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ হিন্দিতে ছাপাইয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাংলা গ্রন্থখানিকেই তিনি হিন্দি ভাষাতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকটির প্রকাশে স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোক মহারাজকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

ক্লাবে অবস্থানকালে ভগবৎ দত্ত নামক একজন পণ্ডিতের নিকট তিনি কিছুকাল নিয়মিতভাবে শাস্ত্রপাঠও করিয়াছিলেন। যেসময় পণ্ডিতজী মহারাজকে বেদ পড়াইতেন, সেসময়ে সেইখানে কোনো অব্রাহ্মণ আসিলে অধ্যাপক পাঠ বন্ধ করিয়া দিতেন। তজ্জন্য শাস্ত্রপাঠের পূর্বে মহারাজ সকলকে বিদায় দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠ লইতেন। তাঁহাকে তিনি গুরুর মতোই সর্বদা মান্য করিতেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪২তম বর্ষ, ৭ম ও ১১শ সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি

শৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে, এলাহাবাদে, বাবা-মায়ের সঙ্গে। তখন আমার বয়স মাত্র চার বছর। কাজেই ঐ দর্শনের স্মৃতি বিশেষ কিছু আমার মনে নেই। তাঁকে সজ্ঞানে দর্শন করলাম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। কানপুর 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' তখন ছিল 'রজা মঞ্জিল'-এ; রামনারায়ণ বাজারের পথের মধ্যে একটা সরু গলির একপ্রান্তে; পাশেই 'সর্বজনীন দুর্গাপূজা'র ক্লাব এবং আশ্রমের ব্যায়াম সমিতি। যে-ঘরে তিনি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, তার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দেখি—ঘরে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তিনি চারিদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুঁ দিচ্ছেন। আমায় দেখে মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, "কী করছি, জান? bacteria ছড়িয়ে দিচ্ছি; সব জায়গায় তো যেতে পারি না, কিন্তু সর্বত্র তাঁর (ঠাকুরের) নাম ছড়িয়ে দিচ্ছি। নামের bacteria।"

রুণু বিশ্বাস নামে একটি ছেলের ওপর পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের সেবার দায়িত্ব ছিল। তার বয়স ষোলো কি সতেরো বছর হবে। মাস্টারমহাশয় বা নেপাল মহারাজ (পরে স্বামী নিত্যানন্দ) এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও তাঁর সহযোগী দুটি ছেলে—অলোপী (পরে স্বামী চিদাত্মানন্দ) ও বসন্ত, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের 'সেবা'র সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজজী আমাকে পরদিন সকালে আসতে বললেন; রুণুকে নিয়ে 'বিঠুর' যাবেন। যথাসময়ে পরদিন উপস্থিত হলাম। তিনি এক্কায় করে যাচ্ছেন, আর আমি সাইকেলে চড়ে তাঁর পাশে পাশে চলেছি। পথে তিনি খুব হাসিখুশি মেজাজে ছিলেন। সারা পথ নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে গিয়েছিলেন। মহাপুরুষরা বালকবৎ আচরণ করেন, একথা শুনেছিলাম—এবার স্বচক্ষে তা দেখলাম। দেবতাজীর আশ্রমে গিয়ে আমরা থামলাম। তাঁর বাড়ি তালাবন্ধ ছিল, তিনি অন্যত্র গিয়েছিলেন। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ এক্কা থেকে নামলেন না। রুণুকে একদিকে পাঠালেন, আমাকে আর একদিকে; বললেন, "কোথায় গেছে, কবে আসবে খোঁজ নাও।" পরে জানলাম—দেবতাজী তীর্থে গিয়েছেন, কবে ফিরবেন তা নিশ্চিত জানা নেই। দেবতাজী দীর্ঘকাল স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কাছে এলাহাবাদে সেবাকার্য

করেছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর নিঃস্বার্থ সেবায় লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক নাম দিয়েছিল 'দেবতাজী'। কিন্তু কয়েক বছর আগে তিনি কানপুরে পালিয়ে আসেন এবং জানান, "আর এলাহাবাদ যাব না।" তারপর বিঠুরে তিনি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে বসেন। আসবার পথে বিজ্ঞানানন্দজী বলেছিলেন, "এই আঁকশি দিয়ে (লাঠি দিয়ে ঘাড়ে) ধরে নিয়ে যাব", কিন্তু তা আর হলো না। নীরবে আট মাইল পথ ফিরে চললেন। তিনি যে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তা বুঝতে পারলাম। দীর্ঘপথে আর একটি কথাও বলেননি।

তার পরদিন মহারাজজী এলাহাবাদে ফিরবেন। আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে বললেন। রুণু ও আমি ঠিক তিন ঘণ্টা আগে তাঁকে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছালাম। স্টেশনে একটি পিঠ-দেওয়া কাঠের বেঞ্চিতে আমরা বসেছিলাম। নানা কথার অবসরে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ! এত তাড়াতাড়ি স্টেশনে কেন এলেন?" তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "পৌঁছে গেলাম, এখন নিশ্চিন্ত! ট্রেন আমাকে ফেলে দিয়ে পালাবে না!" এই তিন ঘণ্টার মধ্যে বহুবার তাঁকে অনুরোধ করলাম, "কিছু উপদেশ দিন, মহারাজ", কিন্তু তিনি সেকথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। আমারও মনে দারুণ অভিমান হয়েছিল; শেষের দিকে আমি গুম হয়ে বসেছিলাম। তিনি ট্রেনে উঠলেন, রুণু সঙ্গে গিয়ে তুলে দিল; আমি কিন্তু চুপ করে বসে রইলাম। এমনকী, প্রণাম করার কথাও মনে হয়নি। তিনি হাসতে হাসতে প্রসন্নমনে উঠে গেলেন। ট্রেন ছেড়ে দিল; দেখি, পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ দরজার কাছে দু-পাশের রড ধরে ঝুঁকে রয়েছেন, কাছে আসতেই খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, "মাথা তো ঠুকতে পারো, মাথা তো ঠুকতে পারো।" ট্রেন চলে গেল।

মনে মনে ভাবলাম—হ্যাঁ! এ কাজটি তো করেই থাকি, কিন্তু এতেই কি সব হবে? তাঁর মুখে একথাটি দু-বার শুনেছিলাম। তখন জানতাম না, আমাকে তিনি মহামন্ত্র দিলেন। সেকথা বুঝতে বহু বছর লেগেছিল।

আবার দর্শন পেলাম ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। আশ্রম তখন উঠে এসেছে, 'আগা কোঠি'র বাড়িতে। আমি শুনলাম, বিজ্ঞান মহারাজ আশ্রমে এসেছেন। পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতির পর হলঘরে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ একটা হাতল-দেওয়া চেয়ারে উপবিষ্ট। তাঁর মাথায় কানঢাকা গেরুয়া টুপি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা ও পরনে গেরুয়া ধুতি, পায়ে ডবল মোজা ও জুতো। তিনি হাত নেড়ে কথা বলে যাচ্ছেন; তাঁর দিকে

সকলে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছেন, এ যেন অন্য কোনো জগতের কথা হচ্ছে। সে-দিন তিনি অনেক কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমার এখন আর সব মনে নেই। শুধু একটি কথা স্মরণে আছে। কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন মৃত্যুর কথা [ইঙ্গিতে (শরীর গেলে)], "থাকব মায়ের মধ্যে। কোথায় আর যাব?"

১৯৩৫ বা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগে অর্ধকুম্ভ ছিল। আমার মামা স্নান করতে প্রয়াগে যাবেন। স্থির হলো সঙ্গে যাব আমি ও শ্রী অলোপী বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঠিগঞ্জ মঠে আমরা সকালেই পৌঁছালাম। বিজ্ঞান মহারাজ অন্য সকলকে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে আশ্রমেই থাকতে বললেন। আরো বললেন, তিনি আর আমি যাব না। আমার তো খুব আনন্দ। কারণ তাঁকে একা অনেকক্ষণ কাছে পাব। সে-দিন তাঁর মেজাজ খুবই ভাল ছিল। 'বেণী' তার গ্রাম থেকে ফিরল একটু বেলায়। বাইরের বারান্দায় বিজ্ঞান মহারাজ একটা চেয়ারে বসেছিলেন। বেণীকে নানা প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। সে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু যেতে পারছিল না। বিজ্ঞান মহারাজের লাঠি তার ঘাড়ে আঁকশি হয়ে তাকে টেনে রেখেছিল। খানিক পরে তাকে ছেড়ে দিলেন, তখন সে নিজের কাজে গেল। একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ রান্নাঘরে তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং রান্নার তদারক করতে লাগলেন। চাল ফোটাবার জন্য কতটা জল দিতে হবে, ফুট ধরলে তাতে দু-পলা ঘি দিতে হবে, চালে দুটো আলু সেদ্ধ করতে দিতে হবে...ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি বলতে লাগলেন।

তারপর তিনি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-দিন তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হলো। অনেকগুলি বই লিখেছিলেন, তা জানালেন। আমি শুধু 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত'-এর কথাই জানতাম—এক কপি আমার বাবাকে দিয়েছিলেন। 'ইঞ্জিনিয়ারিং' সম্বন্ধে একটি বই ও 'হাত দেখা'র একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছিলেন, তা শুনেছিলাম। হস্তরেখা-সম্বন্ধে পুস্তিকাটি দেখতে চাইলাম। তিনি বললেন, "যদি থাকে তো তোমাকে দেব।" রামায়ণ ইংরেজিতে অনুবাদ করছিলেন, জানতাম—জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ও হয়ে গেছে, আর লিখছি না।"

কথায় ছেদ টেনে তিনি বললেন, "স্নান করে নাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।" স্নানের জন্য প্রস্তুত হতেই কাছে এসে দাঁড়ালেন ও বললেন, "তেল মাখতে হয়।" তাঁর সামনেই খালি গায়ে তেল মাখতে হলো। আমার মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, "ও বাঁদর! কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?" তাঁর চোখের ইঙ্গিতে বুঝলাম, তিনি রহস্যচ্ছলে জিজ্ঞাসা করছেন, আমি ঠাকুরের বাঁদর হয়ে জগতের নাথকে দর্শন করতে চাই

কি না। খুব আনন্দের সঙ্গে আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। মনে হলো, রহস্যটা বুঝতে পেরেছি জেনে প্রসন্ন হলেন।

স্নান করে এসে তাঁর কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করেছ?" আমি মাথা নেড়ে জানালাম—'হ্যাঁ', কিন্তু তিনি খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "কিছু হয়নি।" আমি ত্রস্ত ও ভীত; কী অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারলাম না। অল্পক্ষণ পরেই বললেন, "চলো।" তাঁর সঙ্গে আবার ঠাকুরঘরে গেলাম। তিনি অঙ্গুলিনির্দেশে ভিতরে যেতে আদেশ করলেন। ভিতরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে দক্ষিণ দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে তিনি ঢুকলেন। হাঁটু ভেঙে মেঝের ওপর মাথাটি ছোঁয়ালেন, সেই মুদ্রায় কিছুক্ষণ রইলেন। তারপর কোনোদিকে না চেয়ে বাইরে চলে গেলেন। সেই যে বলেছিলেন, 'মাথা তো ঠুকতে পারো'—তার অর্থবোধ তখন হয়নি; এখন মনে হলো, ঠাকুর সামনে রয়েছেন, তাঁর শ্রীচরণে দেহে-মনে-প্রাণে আত্মসমর্পণ করছি—এটি অনুভব করতে হবে।

হায়! সেরকম প্রণাম আজও হলো না। শিক্ষা পেলাম; রাস্তাও অতি সহজ। কিন্তু অন্তর ও বাহির সব ঠাকুরকে দেওয়া কী কঠিন, তা যতই দিন যাচ্ছে ততই বুঝছি।

পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর ব্যক্তিগত কোনো সেবা করার অধিকার সহজে কাউকে দিতেন না। অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর হাতে জল দিতে তিনি অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তবে শেষকালে তাঁর স্নানান্তে বস্ত্র ও কৌপীন ছাদে শুকোতে দিয়েছিলাম। আমাকে আহার করিয়ে নিজে ঘরের মধ্যে একাকী অন্নগ্রহণ করেছিলেন। বেণী তাঁর জন্য অন্য হাঁড়িতে অন্নভোগ প্রস্তুত করেছিল। তিনি ঘরের মধ্যে চেয়ারে একা বসে আছেন, হঠাৎ গাইতে লাগলেন—

কোই কাহু মেঁ মগন, কোই কাহু মেঁ মগন
হম্ ওহি মেঁ মগন, হম্ ওহি মেঁ মগন।

এটির ভাবার্থ ঃ এ-জগতে কেউ কিছু নিয়ে মেতে রয়েছে, আমি ঈশ্বরে ডুবে আছি; আমি তাঁরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে মেতে আছি।

দুপুরবেলা আবার নানা কথা হলো। রামায়ণ-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "হনুমানের কি লেজ ছিল?" হেসে তিনি বললেন, "থাকলই বা?" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কী মনে হয়?" আমি কোথাও শুনেছিলাম, 'a tail of light' হয়তো ছিল—তা-ই বললাম। তিনি হাসলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

তারপর হাতদুটি সামনে প্রসারিত করে বললেন, "কত আয়ু বলো দেখি?" তাঁর হাতদুটি রক্তিমাভ, গ্রহস্থানগুলি উচ্চ, রেখাগুলি অভগ্ন ও গভীর। মনে মনে ভাবলাম, 'অতি চমৎকার হাত। রাজার হাত এমন হয়।' মুখে বললাম, "আশির ওপর।" তিনি হেসে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, "তুমি জান না, যোগীর ইচ্ছামৃত্যু? কখনো সাধুর আয়ু গণনা কোরো না।" তারপর বলেছিলেন, "হাতদেখা ভাল নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা। তুমি ছেড়ে দাও, একদম ছেড়ে দাও।"

বিকাল চারটার সময় বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "চলো, ক্যাম্পে যাই।" এক্কা করে আমরা যাত্রা করলাম। সমগ্র এক্কা জুড়ে তিনি সহজাসনে বসলেন। তাঁর মাথা প্রায় এক্কার ছাদে ঠেকছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথায় বসবে?" আমি চালকের একপাশে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। এক্কার ভারসাম্য বজায় থাকবে না বলে এক্কা-চালক আমাকে পিছিয়ে বসতে বলল। যাহোক, কোনোরকমে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে এক্কায় বসলাম।

ক্যাম্প ত্রিবেণীর চরে। সেখানে সকলেই জানতেন, পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ ক্যাম্পে আসবেন না। হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে কয়েক জন দ্রুত কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটি চেয়ার ক্যাম্পের মাঝখানে পাতা হলো। অনেকে তাঁকে প্রণাম করে নিজ নিজ কাজে চলে গেলেন। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ কিছুক্ষণ একাকী নিস্তব্ধভাবে বসে রইলেন। খানিকক্ষণ পরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে খুব কাতরভাবে অনুনয় করে বলতে লাগলেন, "মহারাজ, কৃপা করুন।" তিনি উদাসীনবৎ বসে রইলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বললেন, "সারাজীবন সংসারে দিয়ে শেষকালে মনে পড়লে কী হয়? যাও, যা করছ তা-ই করো।" সেবার ঐ ব্যক্তিকে তিনি আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে জেনেছি, তাঁকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। আমি ঐ-রাতে ক্যাম্পে রইলাম। পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ মঠে ফিরে গেলেন।

সম্ভবত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ। সংবাদ পেলাম, পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজ মৃন্ময়ীমূর্তি গড়িয়ে শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা করবেন। সংবাদ পেয়ে পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজকে চিঠি লিখলাম, এলাহাবাদ মঠে থেকে চণ্ডীপাঠের অনুমতি যেন দেন। তিনি ইংরেজিতে একটি পোস্টকার্ডে লিখে পাঠালেন—'না'। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়িতেই চণ্ডীপাঠ সাঙ্গ করলাম। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের দ্বিতীয় পোস্টকার্ড পেলাম, যাতে তিনি লিখেছেন, "তুমি আসতে পারো।" সে-দিনই বন্ধুবর 'অলোপীকে দশমীর দিন দীক্ষা দেওয়া হবে'—এই মর্মে এক পত্র

পেলেন শ্রদ্ধেয় নেপাল মহারাজ। ইতিমধ্যে অলোপী এসে জানাল, "আমাকেও যেতে হবে।" যথাসময়ে মুঠিগঞ্জ মঠে উপস্থিত হলাম দু-জনে। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ খুব খুশি। বললেন, "এসে গেছ?" বললাম, "হ্যাঁ, মহারাজ! কয়েক দিন আগে এ চিঠি পেলে আরো ভাল হতো!" তিনি হেসে বললেন, "তা এলেই পারতে!" বললাম, "আসব কেমন করে? আপনি তো বারণ করেছিলেন।" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি কে? এ ঠাকুরের স্থান! তুমি নিজের জায়গা ভাবলে, এসে পড়লেই পারতে!" তারপর বললেন, "তুমি লিখলে চণ্ডীপাঠ করবে; কী সঙ্কল্প করবে কে জানে!—এখানকার সঙ্কল্প 'বিশ্বহিতায়'। তোমার যদি অন্য কিছু থেকে থাকে!" বুঝতে পারলাম, তাঁর কোনো কাজই খেয়ালখুশিমতো নয়; প্রত্যেক কথার গভীর অর্থ আছে, যা আমরা বুঝতে পারি না।

দশমীর পূজা সম্পন্ন হলো। অলোপীর দীক্ষাও হয়ে গেল। তার কাঁধে মহারাজের হাতখানি। দেখে মনে হলো, 'কাচপোকা কুমুরেপোকাকে ধরেছে।'

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাবার কাছে বিজ্ঞান মহারাজের পত্র এল—ছোট বোনকে নিয়ে যেতে হবে দীক্ষার জন্য। কোনো কারণে কয়েক দিন বিলম্ব হলো। এলাহাবাদ মঠে গিয়ে জানলাম মহারাজ বেলুড় গিয়েছেন। তাই সেবার দর্শন হয়নি। তবে জীবনে বহুবার তাঁকে দর্শন করেছি, তাঁর শ্রীমুখের কথা শুনেছি। সে-ও কম ভাগ্য নয়। সেকথা স্মরণে বারবার প্রণাম করি তাঁর শ্রীচরণে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৮৯তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পদপ্রান্তে

প্রতিভা বসু

১৩৩২ বঙ্গাব্দের (১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ) ১০ বৈশাখ বারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়। স্বামী সাধনচন্দ্র বসুর বয়স তখন একুশ বছর। আমার পিতৃকুল ও পতিকুল উভয়ই শ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত। বিয়ের আগে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যেতাম। তখনকার প্রশান্ত-গম্ভীর দক্ষিণেশ্বরের রূপ আজ বহু লোকের কোলাহলে যেন অনেকটা হারিয়ে গিয়েছে। ঠাকুরের ঘরখানি, মায়ের নহবত, ফুলের বাগান, পাখির ডাক, সুরধুনী গঙ্গা, মহাপবিত্র পঞ্চবটী—সব মিলিয়ে দক্ষিণেশ্বর আমার শিশুমনকে বিস্ময়ে অভিভূত করত।

যেসময়ের কথা বলছি সেসময় ঠাকুরের ঘরটিতে কালো সিমেন্টের মেঝে ছিল। ঘরে ছিল ঠাকুরের দুটি তক্তপোশ—একটি বড় ও অন্যটি ছোট। দুটি তক্তপোশেই ধবধবে সাদা বিছানা পাতা থাকত এবং বিছানার ওপর থাকত ঠাকুরের দুটি প্রতিকৃতি। দেওয়ালে স্বামীজীর নানা রকমের ছবি একটি বড় ফ্রেমে টাঙানো থাকত। মাতাঠাকুরানির ছবিও ছিল। বাবা-মায়ের সঙ্গে বহুবার আসা এই অমৃততীর্থের হারানো-দিনের স্মৃতিসৌরভটুকু আজও মনের মণিকোঠায় অম্লান!

পঞ্চবটীর বাঁধানো স্থানটি আমি শিশুকালে ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখেছি। দু-এক ধাপ সিঁড়ি—তা-ও ভাঙা-অবস্থায়, এদিকে-ওদিকে বড় বড় ফাটল। মনে হতো, শ্রীশ্রীঠাকুরের পদরজ যেন তখনো ছড়িয়ে আছে ওখানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনভজনের রেশ তখনো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিয়ের পর স্বামীর কাছেও শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমায়ের অনেক কথাই শুনেছি। সম্ভবত ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমার স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বড় প্রতিকৃতি এনে ঠাকুরঘরে বেদির ওপর শালুতে সুন্দর করে সাজিয়ে বসিয়েছিলেন। সে-ছবি আজও আমাদের ঠাকুরঘরে আছে।

আমার স্বামীর সহপাঠী বন্ধু, পরবর্তিকালে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সংশুদ্ধানন্দ মহারাজ (ভবতারণ মহারাজ) তাঁকে একদিন বললেন, "এলাহাবাদ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য মস্তবড় ব্রহ্মজ্ঞ এক সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে এসেছেন। তাঁকে ধরো, তাহলে দীক্ষা হয়ে যাবে। বাইরে তিনি যেমন কঠোর

ও গম্ভীর, ভেতরে তেমনই নরম ও কোমল।” ঘটনাটি ১৯৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দের। তারপরেই আমার স্বামীর দীক্ষা হয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে। দুঃখের বিষয়, সেবার কোনো কারণে আমার দীক্ষা হলো না। পরে অবশ্য স্বামীর চেষ্টায়, মনে হয় ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপুজোর আগে আমি বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের চরণাশ্রিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করি।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আজও আমার কাছে চির-উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অপার কৃপায় এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় তাঁদের শ্রীচরণে স্থান পেলাম। দীক্ষার দিন কিছু ফল, ফুল ও সামান্য প্রণামির টাকা নিয়ে মঠে যাই। মহারাজজী আমাকে এককভাবে মন্ত্র দেন। একটি চেয়ারে তিনি বসেছিলেন। আমি একটি আসনে বসি। উনি বেশ স্পষ্ট করে মন্ত্র বললেন এবং অন্যান্য করণীয় সব বলে দিলেন। একটি বড় মন্ত্র ও একটি ছোট মন্ত্র। একটি কাগজে মন্ত্র-দুটি নিজের হাতে লিখে দিলেন এবং করজপ করার প্রণালী দেখিয়ে দিলেন। একটি ছোট রুদ্রাক্ষের মালা নিজে শোধন করে আমার হাতে দিয়ে মালাজপের বিধিও বলে দিলেন। দীক্ষার সময় যে-ফুলগুলি তাঁর চরণে নিবেদন করি, প্রণাম করে সেগুলি তুলে এনে বাড়িতে রেখে দিই। স্বামীজী মহারাজের ঘরের পশ্চিমদিকের ঘরে (যে-ঘরে স্বামী নির্বাণানন্দজী পরে থাকতেন) আমার দীক্ষা হয়েছিল।

শ্রীশ্রীগুরুদেব যখনই বেলুড় মঠে আসতেন, আমার স্বামী তখনই ছুটে যেতেন তাঁর দর্শনমানসে—তাঁর পুণ্যসান্নিধ্যলাভে তিনি ধন্য হতেন। মহারাজের বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি আমাদের গাড়িতে যেতেন। স্বামীর আন্তরিক প্রার্থনায় তিনি এই কৃপাটুকু আমাদের করেছেন।

একদিন আমার স্বামী মহারাজজীকে দর্শন করতে মঠে গিয়েছেন। তিনি তখন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ উঠলেন। অপেক্ষমাণ ভক্তদের ডাক পড়ল। সকলে চরণধূলি মাথায় নিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে বসলেন। শিষ্যদের সঙ্গে কথা শুরু হলো। বেশি ভক্ত জমায়েত হলে একসঙ্গেই কথা হতো। অল্প ভক্ত থাকলে একা-একাও আলাপ হতে পারত। সে-দিন ভক্তের ভিড় বেশি না থাকায় আমার স্বামী প্রণাম করে বললেন, “বাবা, আপনি শুয়ে ছিলেন, তাই বাইরে বসে ছিলাম।” উত্তরে মহারাজজী বললেন, “হ্যাঁ, আমি জানি আপনি এসেছেন।” (বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ সকলকে ‘আপনি’ সম্বোধন করতেন।) আমার স্বামীর মনে বিস্ময় জাগল, কেমন করে গুরুদেব তাঁর আসার

কথা জানতে পারলেন। পরে তাঁর মনে হয়েছিল, মহারাজজীর মতো উচ্চস্তরের মহাপুরুষের কাছে কোনো কিছুই অজানা থাকে না।

সে-বছর দুর্গাপুজোর সময় মহারাজ মঠে এসেছেন। মহাষ্টমীর দিন মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এবং মহারাজকে প্রণাম করতে মঠে গেলাম। মঠে অনেক ভক্তের ভিড়। প্রণাম নিবেদনের পর মেঝেতে বসে আছি। সকলের মনেই তাঁর উপদেশ ও বাণী শোনার আগ্রহ। তিনি সকলকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, জপ-ধ্যান ঠিকমতো হচ্ছে কি না জানতে চাইলেন। আমার কাছে জপ-ধ্যানের বিষয় জানতে চাইলে আমি বললাম, "এক-একদিন বেশ মনঃসংযোগ হয়, মনটা স্থির হয়ে থাকে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই মনটা চঞ্চল হয়ে যায়—জপ করতে বসলেই সংসারের নানা চিন্তাভাবনা এসে জপ থেকে মনকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।" শুনে মহারাজ বললেন, "এরকম মনের চাঞ্চল্য আসবে। সেজন্য মন খারাপ করবেন না। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন জপ করবেন। চেষ্টা করতে করতেই মন ক্রমশ শান্ত হবে।"

আরেক দিনের কথা। মহারাজ মঠে এসেছেন। মঠে গিয়েছি মহারাজকে দর্শন করতে। সে-দিন উপস্থিত ভক্তসংখ্যা অল্প থাকায় একাই তাঁর ঘরে যাই। তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে বসে 'ক-দিন থাকবেন', 'কেমন আছেন' ইত্যাদি ছোটখাটো দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করার পর ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অমৃতসঙ্গের স্মৃতি এবং ঠাকুরের বিষয়ে কিছু বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। মহারাজজী সহাস্যে বললেন, "আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেছি। আমায় দেখে ঠাকুর বললেন, 'ওহে, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি কুস্তি লড়। এসো তো দেখি তুমি কেমন পালোয়ান!'" হাসিমুখে মহারাজ বললেন, "কুস্তি লড়তে গিয়ে ঠাকুরকে দেয়াল-ঠাসা করে ফেলেছিলাম।" তারপরই গম্ভীরমুখে বললেন, "কুস্তি লড়তে লড়তে আমার কী যে হলো বুঝতে পারলাম না, শেষে নিজেই হেরে গেলাম। হঠাৎ যেন আমার শরীরের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে গেল। আমি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম।" একথা বলে মহারাজজী বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "আজ আসুন।" আমিও কিছুসময় স্তব্ধভাবে বসে থেকে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সে-দিনের ঘটনা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। দেখেছিলাম, এই মহাযোগীর মধ্যে পূর্ণভক্তির কী অপূর্ব সামঞ্জস্য! সেই দিব্য ঘটনার বর্ণনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদ বিজ্ঞানানন্দজী মনের অতীত বিজ্ঞান-ভূমিতে অবগাহন করেছিলেন।

খুব বেশিদিন মহারাজের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যতটুকু হয়েছে, তাতে পিতার স্নেহময়স্পর্শই আমি অনুভব করেছি। একদিনের কথা মনে পড়ে—সে-দিনও একান্তে তাঁর শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। সে-দিন আমি একটি প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কিছু গঙ্গামাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর চরণে ঐ মাটি স্পর্শ করিয়ে আমার ঠাকুরঘরে রেখে দেব—এই আশায়। চরণামৃত করে সেটি বাড়ির সকলের মুখে দেব—এই বাসনা। মহারাজজীকে বললাম মনের কথাটা। তিনি বললেন, "আপনি পায়ে মাটি ছোঁয়াবেন কী করে? পায়ে যে মোজা আছে।" আমি বললাম, "বাবা, মোজা খুলে মাটি ছুঁইয়ে নিয়ে মোজা আবার পরিয়ে দেব।" উনি বললেন, "বেশ তো, তাহলে মাটি ছুঁইয়ে নিন।" আমি মোজা খুলে ঐ মাটি তাঁর শ্রীচরণে বুলিয়ে নিয়ে আবার মোজা পরিয়ে দিলাম। তিনি যে আমার এই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন, তা মনে হলে আজও হৃদয়ে পরম শান্তি আর আনন্দ পাই।

আরেক বার মঠে স্বামীজী মহারাজের পশ্চিমদিকের ঘরটিতে উত্তরাস্য হয়ে মহারাজ চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশে সে-দিন অনেক ভক্ত। তাঁর বাঁ-দিকে পুরুষভক্তরা এবং ডান দিকে স্ত্রীভক্তরা বসে আছেন। মহারাজজী একজন পুরুষভক্তকে বললেন, "দিন ও রাত্রি কাকে বলে জানেন? দিন হচ্ছে জ্ঞান, রাত্রি মানে অন্ধকার—অজ্ঞান। মানুষ জ্ঞান দিয়ে কাজ করলে ভাল হবে, অজ্ঞান দিয়ে কাজ করলে তা ভাল হয় না।"

আরেক বার বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে গিয়েছি; স্বামী, পুত্র-কন্যারা সঙ্গে। মহারাজজী মঠে এসেছেন, ছেলে-মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করে একটু দূরে দাঁড়াল। গুরুদেব ওদের নাম জানতে চাইলেন। তারপর ডান হাতটি মুঠো করে হাসিমুখে বললেন, "তোমরা কী নেবে?" ওদের বয়স চার-পাঁচ বছরের মধ্যে। ওরা বলল, "গাড়ি নেব।" মহারাজজী বললেন, "ধরো, ধরো।" ওরা এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই উনি বললেন, "ধরতে পারলে না তো, কোথায় উড়ে গেল!" সে-দিন বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি প্রফুল্লমনে অনেক আহ্লাদ করলেন। ঘরে দু-জন সেবক-ব্রহ্মচারী ছিলেন। একজনকে সন্দেশ এনে ছোটদের দিতে বললেন। সন্দেশ দিয়ে সেবক-ব্রহ্মচারী কাচের গ্লাসে জল দিলেন। মহারাজজী বললেন, "বাচ্চাদের কখনো কাচের গ্লাসে জল দেবে না, ভেঙে ফেলতে পারে।"

আমার স্বামী অল্পবয়সেই ব্লাডপ্রেসারে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেজন্য আমার শ্বশুরমশায় ও শাশুড়ি-মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকতেন। তাঁরা একদিন গুরুদেবের কাছে গিয়ে আমার স্বামীর অসুখের কথা জানিয়ে তাঁর সুস্বাস্থ্যের

জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে ওঁদের সব কথা শুনে পরম স্নেহভরে বললেন, "আমার আশীর্বাদ সততই আছে। করুণাময় ঠাকুর আপনাদের ছেলেকে রক্ষা করুন।" উপদেশ দিলেন, "সাধনবাবুকে দুধভাত খেতে বলবেন। নুন খেতে মানা করবেন।" বলা বাহুল্য, মহারাজের সেই উপদেশ আমার স্বামী মেনেছিলেন এবং সে-যাত্রায় কঠিন অসুখ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। গুরুর আশীর্বাদ কখনো বৃথা যায় না—এ অমোঘ সত্য আমার জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখেছিলাম ও উপলব্ধি করেছিলাম।

স্বামীর অসুস্থতাকালীন অন্য একদিন মহারাজজীকে আমার সেসময়কার মানসিক অবস্থার কথা বলেছিলাম। পুত্র-কন্যারা ছোট, সংসারের নানা ভাবনায় জপ-ধ্যান সাধ্যমতো করতে পারি না। সে-দিন আমার মনোব্যথা শুনে পরম স্নেহমাখাস্বরে তিনি বললেন, "দেখুন, আপনার সুবিধামতো জপ-ধ্যান করবেন। যে-দিন সুযোগসুবিধা পাবেন না, সে-দিন শুধুমাত্র ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করবেন, তাহলেই হবে।"

মহারাজজীর কাছে একবার স্বামীজীর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "স্বামীজীকে আমি একটু ভয় পেতাম। তবে তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন সহজভাবেই কথা বলতাম। একদিন মঠে বড় মন্দিরের সামনের মাঠে অর্থাৎ পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যার সময় স্বামীজী ও আমি বেড়াচ্ছিলাম। স্বামীজী বর্তমান মন্দিরের মাঠটি দেখিয়ে বললেন, 'দেখ পেসন, এই জায়গাটায় নূতন মন্দির করতে হবে। তখন অবশ্য আমি থাকব না, তবে ওপর থেকে দেখব।'"

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমরা গিরিডিতে ছিলাম। আমার দ্বিতীয় পুত্র কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে কয়েক মাস গিরিডিতে চলে যাই। ওখানে হরিদাস মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। তাঁরা সস্ত্রীক শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাঁদের কাছে জানতে পারলাম, বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

আমার স্বামীকে মহারাজ কিছুদিন আগে বলেছিলেন, "আমার একটি রঙিন ছবি করিয়ে দেবেন।" তাঁর যেসব ছবি প্রচলিত রয়েছে সেসব ছবি আমার স্বামী তাঁর অনুমতি নিয়ে আলোকচিত্রী হরিচরণ পালের মাধ্যমে তুলিয়েছিলেন। কয়েকটি ভঙ্গিতে পূজনীয় মহারাজের ফটো তোলা হয়েছিল। সোজাভাবে মাটিতে বসা একটি, অন্য একটি পাশ ফিরে বসা। এরকম বসা ছবির সামনে একটি

কমণ্ডলু রাখা ছিল—সেটি পিতল বা কাঁসার নয়, সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত কাঠের কমণ্ডলু। আরেকটি ফটো তোলা হয়—স্বামীজী যে-বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির গঙ্গার দিকে যে-বারান্দা আছে, সেখানে বেঞ্চিতে মহারাজ বসে আছেন। তাঁর রঙিন ছবি এযাবৎকাল হয়ে ওঠেনি। আমার স্বামী ব্যস্ত হয়ে তৎপরতার সঙ্গে হরিচরণ পালের সঙ্গে যোগাযোগ করে রঙিন ছবি করালেন এবং আমার দেবরকে দিয়ে সেটি শীঘ্র গিরিডিতে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। সাত-আট দিনের মধ্যে সেটি গিরিডিতে এসে পৌঁছাল। তারপর আমরা অর্থাৎ স্বামী, দেবর, আমি ও বাড়ির পুরানো কর্মচারী মতিকে নিয়ে গিরিডি থেকে হাজারিবাগ রোড স্টেশনে গিয়ে রাতে তুফান এক্সপ্রেসে মহারাজজীর দর্শনমানসে এলাহাবাদ রওনা হলাম।

এলাহাবাদ পৌঁছে জিনিসপত্র 'ফ্রেন্ডস বোর্ডিং' নামে এক হোটেলে রেখে টাঙায় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পথে রওনা হলাম। মহারাজকে দর্শন করে তাঁর রঙিন ছবিখানি হাতে দেব—এই আনন্দে চলেছি। রাস্তার ধারেই একতলা আশ্রমবাড়ি। দু-পাশে রোয়াক—মাঝখানের রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে মহারাজের ঘরের দরজা পর্যন্ত। সামনের দরজায় পর্দা ঝুলছে। দরজায় কয়েকটি মৃদু টোকা দিতে সম্ভবত বেণী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কোথা থেকে এসেছি, কী দরকার...ইত্যাদি। মহারাজের অসুস্থতার খবর পেয়ে হাওড়া থেকে এসেছি বলাতে বেণী ভিতরে নিয়ে গেল। ঘরের ডান দিকে গুরুদেব একটি চেয়ারে বসে আছেন, সামনের টেবিলে কিছু বই ও ফাউন্টেন পেন রাখা আছে। শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করে পদপ্রান্তে বসলাম।

অসুস্থতার জন্য মহারাজজীর শরীর অনেক রোগা হয়েছে। চোখের কোলটিও বসা-বসা। শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে মন ভারাক্রান্ত হলো। আমাদের দেখে কিন্তু মহারাজজী উৎফুল্ল হলেন। দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জন দেখলে মানুষ যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, মহারাজজী স্নেহসিঞ্চিত হৃদয়ে আমাদের দেখে তেমনি আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এই অহেতুকী কৃপা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, এটি অনুভব করার বস্তু। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান তিনি, সৌভাগ্যক্রমে সেই সন্তানের শ্রীচরণ স্পর্শ করতে পেরেছি—ধন্য আমরা। তাঁর সস্নেহ সম্ভাষণে আমাদের মন আনন্দে ভরে গেল। গুরুদেব আমার স্বামীকে দেখে খুব খুশি। স্বামীর অতিরিক্ত রক্তচাপ ও অসুস্থ শরীরের কথা তিনি মনে রেখেছেন; বললেন, "কেমন আছেন এখন? দেখে তো আপনাকে ভালই মনে হচ্ছে। আপনি ভাল থাকুন।" আমাকে দেখে বললেন, "মা তো দেখছি ভালই আছেন, চেহারা বেশ মোটাসোটা হয়েছে।"

গিরিডিতে আসা, হরিদাস মিত্রের কাছে মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া ইত্যাদি পূর্বাপর সব কথা আমার স্বামী তাঁকে নিবেদন করলেন। প্রসঙ্গত, মহারাজের একটি রঙিন ছবি, যেটি দেওয়ার দুর্বার আকর্ষণে আমরা এসেছি—সেটিও তাঁকে বলা হলো। ভয় ছিল, ছবিটি মহারাজজীর পছন্দ হবে কি না। মহারাজের কাছে ছবিটি দিয়ে আমার স্বামী বললেন, "দেখুন বাবা, আপনার পছন্দ কি না।" ছবিটি দেখে শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল। বললেন, "বাঃ! বাঃ! ভারি সুন্দর হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু ট্রেনে কেমন করে আনলেন? খুব সাবধানেই এনেছেন, একটুও দাগ লাগেনি।"

আমরা এলাহাবাদে থাকার সময়েই, যতদূর মনে হয়, স্বামী সত্যাত্মানন্দ মহারাজ একদিন বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে গাড়ি নিয়ে এলেন। আগামী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে ওখানে কোনো একটা বাড়ি বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিজ্ঞানানন্দজীকে তিনি নিয়ে যাবেন শুভ উদ্বোধনের জন্য। যাত্রার দিন মহারাজ বেণীকে নিয়ে বেশকিছু রঙ্গ-তামাশা করছিলেন। বললেন, "বাবা বেণী, ভাল ছড়ি তুলে রাখ, পুরানো ছড়ি লে চল। ছড়ি ভক্তলোগ মুঝে দেঙ্গে।" শিশুর মতো ছড়ি হাতে নিয়ে তিনি আনন্দ করছিলেন। মহারাজ কাশী থেকে এলাহাবাদে ফিরলে আবার তাঁকে দর্শন করে বাড়ি ফিরব—এই আশায় ক-দিন আমরা এলাহাবাদে থেকে গেলাম।

তখন তিন-সিটের ছোট এরোপ্লেন যমুনা নদীর ওপারে ওঠানামা করত। এলাহাবাদ শহর দেখানো হতো এই প্লেনে। সামনে একটি এবং পিছনে দুটি সিট। স্বামী, দেবর ও আমি একদিন ঐ প্লেনে চড়ি। সেই আমার প্রথম ও শেষ প্লেনে চড়া। এক দিন সঙ্গমে স্নান এবং দেবদেবী দর্শন করাও হয়েছিল। অতীত দিনের এসব মধুময় স্মৃতিকথা আজও মনকে আপ্লুত করে।

দু-চার দিন বারাণসীতে থেকেই মহারাজজী এলাহাবাদে ফিরে এলেন। আসার দিন ক্লান্ত থাকায় পরদিন সকালে তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। দেখলাম, গুরুদেব তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছেন। সামনের টেবিলে কাগজ, পেন, পেন্সিল। প্রণাম করে দাঁড়াতেই বললেন, "আপনারা ফিরে যাননি? আছেন এখনো?" আমার স্বামী বললেন, "আপনি ফিরে এলে দর্শন করে বাড়ি ফিরব—এই আশায় ক-দিন এখানে থেকে গেলাম।" আমি বললাম, "আমরা সংসারী মানুষ, এমন পুণ্যসুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। আবার কতদিন পরে দর্শন হবে শ্রীঠাকুরই জানেন।" অল্প কিছু কথাও সে-দিন হয়েছিল—প্লেনে চড়া, পুণ্যস্নান, কেল্লাদর্শন ইত্যাদি। মহারাজজীর জন্য আমার স্বামী কিছু কচুরি নিয়ে যান। তিনি তা থেকে অল্পই মুখে দেন। কোন্ দোকান থেকে খাবার আনলে তাঁর ভাল লাগবে সেকথাও

তিনি বলে দিলেন। এরপর আমার স্বামী সেই দোকান থেকে খাবার এনে তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁর অহেতুকী কৃপায় কয়েক দিন আমাদের দেওয়া সেসব জিনিস তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বিকালে পুনরায় আসব বলায় মহারাজজী বললেন, "সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আসবেন।" দুঃখের কথা, সে-দিন পৌঁছাতে আমাদের একটু দেরি হয়ে যায়। শীতকাল, বেশ ঠান্ডা। মঠে যখন পৌঁছালাম তখন ছটা বেজে গিয়েছে। ভিতরে যাওয়ার সময় বেণী বলল, "এখন বাবার সঙ্গে কোনো কথা হবে না। তিনি এখন ধ্যানে বসেছেন। আপনারা আস্তে আস্তে ঘরে গিয়ে প্রণাম করে চলে আসুন।" ঘরে গিয়ে দেখলাম, মহারাজজী ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। পায়ে মোজা, হাতে উলের গ্লাভস্, গায়ে লম্বা কোট, মাথায় টুপি। পায়ের কাছে একটা উঁচু গোল বালিশ। মাথার কাছে একটা ছোট চিমনিতে মৃদু আলো জ্বলছে। শান্ত-পবিত্র স্থান। দিব্য-মনোহর মূর্তি! গুরুদেবের এই মূর্তিখানি আজও আমার মানসপটে একইরকম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সে-দিন সন্ধ্যাবেলা দর্শন হলেও কথা হলো না বলে পরদিন সকালে আবার আশ্রমে গেলাম। আমরা প্রণাম করে তাঁর চরণপ্রান্তে বসলাম। কথাপ্রসঙ্গে হরিদ্বারে আগামী কুম্ভমেলার কথা উঠল। আমরা কুম্ভযোগে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। মহারাজজী বললেন, "বেশ তো, ঘুরে আসুন। এসব তীর্থ দর্শন করা ভাল। স্থান পরিবর্তনে মানুষের মন প্রফুল্ল হয়।" স্বামীর শরীর ভাল নয় বলে তাঁর যাওয়া সমীচীন কি না—সেকথা মহারাজের কাছে নিবেদন করলাম। শুনে মহারাজ বললেন, "ঠাকুর-মায়ের নাম করে বেড়িয়ে পড়ুন, কোনো ভয় নেই।" তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মার্চ মাসে দোলপূর্ণিমার দিন কুম্ভস্নানের উদ্দেশ্যে আমরা হরিদ্বার-যাত্রা করলাম। পরবর্তী চৈত্রসংক্রান্তির মহাযোগে আমরা খুব ভালভাবে পুণ্যস্নান সমাপন করেছিলাম।

সেবার মহারাজজী বারাণসী থেকে ফেরার দু-তিন দিনের মধ্যে, কিছু দূষিত খাবার খেয়ে আমার দেবরের পেটের কঠিন অসুখ হয়। স্বামীর ইচ্ছা, বারাণসীতে গিয়ে আশ্রমের হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন। তিনি মহারাজের কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। মহারাজ সে-প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। আমার স্বামী সে-দিন মহারাজের একটা ফটো তুলতে চাইলেন। উনি আনন্দের সঙ্গে সম্মত হয়ে বললেন, "বেশ তো, এখানেই তুলে নিন।" বারান্দার একটি চেয়ারে সামনের টেবিলে কিছু লেখার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি তখন বসেছিলেন। ফটো সেখানেই তোলা হয়েছিল। যাত্রার দিন আমারও সাধ ছিল তাঁর চরণপ্রান্তে

বসে একটি ছবি নেব। দেবরের অসুস্থতাহেতু আমার সে-দিন আশ্রমে যাওয়া হয়নি। ফলে সেই সৌভাগ্য আর হয়নি। বিদেশে দেবর অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য আমরা দু-জনেই চিন্তিত ছিলাম। গুরুদেব আশীর্বাদ করেছিলেন, "ঠাকুর-মা আছেন, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। ঠাকুর-মাকে ধরে থাকুন, তাঁরা সতত আপনাদের দেখবেন।" তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, ব্রহ্মজ্ঞানী এই জীবন্ত দেবতার এই-ই শেষ দর্শন।

জীবনসন্ধ্যায় যখন ভূমাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিতর্পণ করতে বসেছি, তখন আনন্দে মন কানায় কানায় ভরে উঠছে। দু-চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। সে-দিনের মতো এমন মধুর করে আর তো জীবনকে পাওয়ার জো নেই। তবে আমি কৃতার্থ যে—নিজের সম্বন্ধে, নিজের জীবন সম্বন্ধে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব 'বোধ' জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯৪তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা[১]

রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বেলুড় মঠে আমার যাতায়াত শুরু ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে। স্বামী শিবানন্দজীর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর মহাপ্রয়াণের কারণে তা আর হলো না; মন ভেঙে গেল। দুর্ভাগ্যবশত, আমার তখন ধারণা জন্মেছিল—শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তানগণের আর কেউ স্থূলশরীরে নেই। সেজন্য, স্বামী শিবানন্দজীর দেহত্যাগের পর বছরখানেক আমি আর মঠে যাইনি। শুধু তা-ই নয়, অন্যত্র দীক্ষালাভের জন্য চেষ্টাও করি। একজন দীক্ষা দিতে রাজি হলেন এবং তখনই একটা নাম বলে দিয়ে সেটা জপ করতে বললেন। আরো বললেন যে, তিনি কাশীধামে যাচ্ছেন, ফিরে এসে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দেবেন।

আমি সেই নাম জপ করতে থাকলাম। তবে মনে প্রবল বাসনা জাগল—শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের ছবি ঘরে রাখব এবং নিত্য প্রণাম করব। এই ছবি কেনার জন্যই একদিন আবার বেলুড় মঠে গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের মন্দিরে প্রণাম করার পর স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরে খুব ভিড়। শুনলাম—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ভাইস-প্রেসিডেন্ট, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী এসেছেন। শোনামাত্রই মনে যেন আগুন ধরে গেল—এ কী করেছি! শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য কোনো সন্তান তখনো স্থূলশরীরে আছেন কি না, খোঁজ না করেই বাইরে দীক্ষা নিয়ে বসলাম। মনে ঝড় বইতে লাগল—সেই ঝড় মনে নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। একটা অব্যক্ত মানসিক যন্ত্রণায় সাত দিন কাটল।

এই অবস্থার মধ্যেই একদিন, যিনি দীক্ষা দেবেন বলেছিলেন, তিনি কাশী থেকে ফিরে ডেকে পাঠালেন। আমার মনের অবস্থা তখন আরো সঙ্গিন হয়ে উঠল—বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম। আমার মা একদিন সব টের

---

১ শ্রী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ডায়েরি আকারে লেখা পুরানো খাতা থেকে সঙ্কলিত। লেখকের বয়স যখন আঠারো-উনিশ বছর, সেইসময় বিজ্ঞানানন্দজীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। এই বয়সের যুবকদের সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দজী কীরূপ ব্যবহার করতেন—সহানুভূতিতে, চিন্তায় কৃপা করে তাদের স্তরে নিজেকে নামিয়ে এনে শিষ্যের চিত্ত ভরপুর করে দিতেন—লেখাটিতে তার কয়েকটি চিত্র পাওয়া যাবে। যাঁরা তাঁর এরূপ সংস্পর্শে এসেছেন, স্মৃতিকথাটি তাঁদের কাছে বিশেষ করে খুবই উপভোগ্য হবে।

পেয়ে বললেন, "ভাবনাচিন্তা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরকে ডাক। তাঁকে বল, তিনি একটা উপায় ঠিক করে দেবেন।" শুনে সাহস পেলাম। তারপর বেলুড় মঠে আবার একদিন গেলাম।

মঠে গিয়ে স্বামী অভয়ানন্দের কাছে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন, "বিজ্ঞান মহারাজ তো মঠে এসেছেন। ঐ সামনে ঠাকুরের মন্দিরের ভিত খোঁড়া হচ্ছে, ওখানে চেয়ারে বসে আছেন—কাজ দেখছেন। তবে ওখানে যেয়ো না, ঘরে ফিরে এলে ওঁর কাছে গিয়ে নিজেই সব বোলো।" অভয়ানন্দজীকে সঙ্গে যেতে বললাম, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না, বললেন, "একা গেলেই ভাল হবে।" স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ঘরে ফেরার মিনিট পনেরো পরে অভয়ানন্দজী আমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। ঘরে সাহস করে ঢুকে প্রণাম করার পরই বললেন, "কী খবর?" এমনভাবে বললেন, যেন আমি কতদিনের পরিচিত। শুনে সাহস বাড়ল। সব কথা জানিয়ে প্রার্থনা করলাম, "মহারাজ, আপনার কাছে আমি দীক্ষাপ্রার্থী। যে মন্ত্রটি আগে পেয়েছি, সেটি নিত্য জপ করি।" শুনে বললেন, "বেশ তো, ঐটাই বছর আষ্টেক জপ করুন।" বললাম, "মহারাজ, আপনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার আমার একান্ত ইচ্ছা।" তবু বললেন, "বিশ্বাস করে লেগে থাকুন।" হঠাৎ বলে ফেললাম, "মহারাজ, ঠাকুরকে আমার খুব ভাল লাগে।" মহারাজ আর দ্বিরুক্তি করলেন না—একদৃষ্টে আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দীক্ষা দিতে রাজি হলেন। বুধবার সকালবেলা মঠে আসতে বললেন। তারপর বললেন, "আমার কাছে দীক্ষা নিচ্ছেন, কিন্তু যাঁর কাছে নাম নিয়েছেন তাঁকে আগে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, ঠিক তেমনি করবেন। আপনার বাড়িতে এলে আগে যেমন যত্ন করতেন, ঠিক তেমনি করবেন। তাঁর দেওয়া নাম প্রত্যহ যেমন জপ করতেন তেমনি করবেন, কখনও যেন অশ্রদ্ধা করবেন না।" তারপর তাঁর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললেন, "আপনারা মনে করেন, মন্ত্র নেওয়া একটা ছেলেখেলা; আমরা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মন্ত্র দর্শন করেছি—জীবন্ত মূর্তিতে।"

ফেরার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ দীক্ষা নিতে গেলে কী কী লাগবে?" তিনি বললেন, "কী আর লাগবে—একটা হরতুকি।"

নির্দিষ্ট দিনে, বুধবারে তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হলাম। দীক্ষান্তে, কীভাবে কী করব—সব দেখিয়ে দেওয়ার পর বললেন, "সময় থাকলে বেশি করে (জপ) করবেন। ...হাঁটতে হাঁটতে, গাড়িতে যেতে যেতে করলেও চলবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "আর গায়ত্রী জপ করব কি?" বললেন, "হ্যাঁ, গায়ত্রী খুব ভাল।"

তারপর বললেন, “মন্ত্রদীক্ষা তো হলো। ...এর মধ্যে সবই আছে।” আবার বললেন, “আগের মন্ত্রও জপ করবেন এবং যিনি দিয়েছিলেন তাঁকেও শ্রদ্ধাভক্তি করবেন। নতুন মন্ত্র লিখে নিন, নয়তো ভুলে যাবেন। আজ থেকে জানবেন, আপনি আর একা নন। আপনার পেছনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা আছেন—কোনো ভয় নেই, বিপদ থেকে তাঁরাই রক্ষা করবেন; অন্তিম সময়ে তাঁরা এসে হাত ধরে নিয়ে তাঁদের কাছে রেখে দেবেন। ঠাকুর আবার আসছেন—এবারে বেশ শক্ত শরীর নিয়ে।”

পরে আরো বললেন, “কারো সঙ্গে তর্ক করবেন না। সকলের মতকেই শ্রদ্ধা করবেন। আমার ধর্মটাই ঠিক, অন্যেরটা ঠিক নয়—এরকম বুদ্ধি করবেন না; সব মতকেই শ্রদ্ধা করবেন। অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতে চেষ্টা করবেন। অন্তিমকালে ঠাকুর ও মা এসে হাত ধরে নিয়ে যাবেন।

“ঠাকুরের সমস্ত পার্ষদদের ছবি ঘরে রাখবেন এবং প্রণাম করবেন; আমারও রাখবেন। এখন বাইরে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গিয়ে একটু জপ-ধ্যান করে নিন এবং নিচে গিয়ে মঠে যেখানে যত মহারাজ আছেন সকলকে প্রণাম করুন।”

বিকালে মহারাজের ঘরে গিয়ে দেখি, সেবক কফি তৈরি করছেন। খাওয়ার পরই বাইরে যাবেন, নিচে গাড়ি প্রস্তুত; শুনলাম, ঠাকুরের মর্মরমূর্তি যেখানে গড়া হচ্ছে, সেখানে তা দেখতে যাবেন।

* * *

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বেলুড় মঠে গিয়ে তৃতীয়বার স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দর্শন লাভ করি। ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, “বসুন, কী খবর? কেমন আছেন?” বললাম, “ভালই আছি।” শুনে হাসতে হাসতে বললেন, “আপনি তো খুব ভদ্রলোক!—দেখুন, এঁদের (সমবেত সকলকে দেখিয়ে) কেউ ভাল নেই—আপনি জিজ্ঞেস করুন এঁদের! আপনিই একমাত্র ভাল আছেন। খুব ভাল লোক আপনি।” সবাই হাসতে লাগলেন। তিনি আরো নানা কথা বলে, নানা রঙ্গরসের কথায় আমাদের সকলকে মাতিয়ে দিলেন। ...আজ তিনি এলাহাবাদ ফিরে যাবেন। একটু পরেই যতীশ মহারাজ, অনঙ্গ মহারাজ, ভরত মহারাজ প্রমুখ এসে পড়লেন। মহারাজ আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, “তোমরা ভাই আমাকে একটু সাহায্য করো—আমার একটু উপকার করো—এই ট্রাঙ্কটা মোটরে তুলে দাও।” আমরা তাঁর এরূপ কথায় মুগ্ধ, কৃতার্থ হলাম।

...মোটর ছাড়ার সময় আমরা সবাই বললাম, “আবার আসবেন।” বিজ্ঞানানন্দজী বললেন, “রামের ইচ্ছা।”

* * *

আজ বুধবার, ১০ এপ্রিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ। বাসন্তীপূজার সপ্তমী তিথি। বেলুড় মঠে বাসন্তীপূজা হবে, বিজ্ঞান মহারাজ তাই এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। মঠে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে, আনন্দিত মনে ফিরে এলাম। আবার গেলাম ১৪ এপ্রিল, একাদশীর দিন, বিকাল চারটায়। ভেবেছিলাম, ঘরে লোকের খুব ভিড় হবে—আশ্চর্য! একাই রয়েছেন। সেই সহাস্য জিজ্ঞাসা, “কী খবর?” দু-চার কথার পর বললাম, “মহারাজ, বড় বিপদে পড়েছি। হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে বার্ন কোম্পানিতে চাকরি করি, সকাল আটটায় হাজিরা দিতে হয়; কালীঘাটে থাকি, সাতটায় বেরোতে হয়। তার আগেই স্নানাহার সেরে নিতে হয়। সাইকেলে যাতায়াত করি। অতদূর গিয়ে অফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, আবার এতখানি সাইকেল চালিয়ে ফিরে এসে জপ-ধ্যান করে শুতে শুতে অনেক রাত হয়। আবার ভোর চারটায় ওঠা কষ্টকর হয়। আগের মন্ত্রটি খুব বড়, গায়ত্রীমন্ত্রও বড়; এরপর আপনার কাছে পাওয়া মন্ত্র জপ—তাও আবার আপনি বলেছেন, তাড়াহুড়ো করে যেন জপ না করি এবং জপের সঙ্গে ধ্যানও চলবে—কাজেই সবকিছু করতে যথেষ্ট সময় পাচ্ছি না। আপনি আগের মন্ত্রটি ত্যাগ করার অনুমতি দিন।”

সব শুনে মহারাজ কৃপা করে অনুমতি দিলেন। ...পরে বললেন, “যাঁর কাছ থেকে মন্ত্রটি নিয়েছিলেন, তাঁকে কিন্তু আগের মতোই শ্রদ্ধা করবেন।” পরে গায়ত্রীমন্ত্রও বাদ দেওয়ার কথা বললাম, মহারাজ তাতে অসম্মত হয়ে বললেন, “না, গায়ত্রী জপ করবেন।” আমি করুণনেত্রে চেয়ে আছি দেখে বললেন, “আচ্ছা, যখন সময়ের খুব অভাব হবে, মাঝে মাঝে না হয় বাদ দেবেন।”

* * *

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের এক রবিবার। মন্দিরের কাজ পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞান মহারাজ মঠে এসেছেন শুনে গিয়েছি। স্বামীজীর ঘরের সামনের বারান্দায় মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন, বহু ভক্তও সমাগত, সেখানেই দর্শন পেলাম। খুব হাসালেন সকলকে—আমাদের সঙ্গে এমন হই-হুল্লোড় করলেন, যেন তিনি আমাদের সমবয়সি—আমাদের ইয়ার-বন্ধু! কী আশ্চর্য ব্যবহার! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, ইনিই কী সেই গুরুগম্ভীর ব্যক্তি—যাঁর কাছে এগোতেই ভয় পেয়েছিলাম! কী বিমল আনন্দের স্রোতই না বইয়ে দিয়েছিলেন সে-দিন।

বিকালে ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি গম্ভীরভাবে বসে আছেন। ঘরে আরো কয়েক জন ছিলেন। আমাকে একবার বললেন, "ঐ টেবিলের ওপর আমার চশমাটা রয়েছে, দাও তো ভাই।" আমার এবং আরো দু-জনের ঠিকানা লিখে নিলেন। আর কোনো কথা হলো না। সকালে দেখেছিলাম আনন্দোজ্জ্বল সমুদ্র—এখন দেখছি অতি প্রশান্ত সমুদ্র—গম্ভীর (যা অধিকাংশ সময়ই দেখা যেত)। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলে মহারাজ বললেন, "আপনারা এবার আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।" আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎ ঐ-দিন কেন আমাদের নাম ঠিকানা ডায়েরিতে লিখে নিলেন, বুঝলাম না—জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি। পরে বুঝলাম—১ জুন তাঁর একখানি পত্র পেলাম, খুলে দেখি ভিতরে তাঁর ফটো! এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ মঠ থেকে পাঠিয়েছেন। ...অহেতুকী কৃপার কথা বইতে পড়েছিলাম, এবার প্রাণে প্রাণে তা অনুভব করলাম।

* * *

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর, বিজয়াদশমীর দিন মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে পত্র দিই। তাঁর মঠে আসার কথা শুনেছিলাম, কিন্তু পরে জানলাম, এলাহাবাদ মঠে তিনি দুর্গাপূজা করবেন, কাজেই আসা হবে না। উত্তরে তিনি অন্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন, "পুজোর সময় আমাদের এখানেই মায়ের প্রতিমা গড়ে পুজো হয়েছিল, সেই কারণে মঠে যেতে পারিনি।" আর স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"যতদূর সম্ভব অনাসক্তভাবে থাকতে চেষ্টা করবেন।"

* * *

১৮ নভেম্বর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার। বিশেষ কারণে, কোনো সংবাদ না পেলেও, মনে হলো—বিজ্ঞান মহারাজ মঠে এসেছেন। পরদিন বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি, সত্যিই এসেছেন। খুব আনন্দ হলো। দর্শনমাত্রেই সেই সহাস্য প্রশ্ন, "কী খবর?" ঐ-দিন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, কী কী দেখেছেন—মহারাজ সব গল্প করতে লাগলেন। প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টার সময় সবাই উঠে গেলাম, আবার বিকালে তাঁর ঘরে গিয়েছি। বহু ভক্ত মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে আছেন, আমিও বসলাম। অনেক রকম প্রসঙ্গ হতে লাগল। হঠাৎ এক ভদ্রলোক বিজ্ঞান মহারাজকে প্ল্যানচেট সম্বন্ধে নানা কথা শোনাতে লাগলেন। তারপর ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল। মহারাজ বললেন, "পাটনায় অমাবস্যার গভীর রাতে শ্মশানে

ভূত দেখবার জন্য সমস্ত রাত ছিলাম—কিছুই দেখিনি। তবে ঠাকুর ভূত সম্বন্ধে বলেছেন, তাই বিশ্বাস করি।” ভূতের গল্প খুব জমে উঠল। আমার মনে ভাবনা হচ্ছে—এখন তো বেশ সব শুনছি, রাত নটা-দশটায় একলা সাইকেলে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, তখন খুব ভয় করবে (আমার বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বছর হবে)। এরপর ইংরেজি বই-এর ভূতের গল্প শুরু হলো। হঠাৎ মহারাজ আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, “খুব ভয় করছে, না?” তখন রাত আটটা হবে। আমি চুপ করে আছি। হঠাৎ মহারাজের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, আমার মনে হলো—তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। আমার দিকে চেয়ে খুব জোর দিয়ে বললেন, “ভয় কী? কিছু ভয় নেই। মানুষ কী কম? মানুষকে দেবতারা পর্যন্ত ভয় করে, ভূত তো কোন্ ছার!” মহারাজের সেই গুরুগম্ভীর প্রদীপ্ত মূর্তি দেখে এবং কথা শুনে গল্প বন্ধ হয়ে গেল—সকলেই স্তব্ধ। নিমেষে আমার মন থেকে চিরদিনের মতো ভয় চলে গেল।

বৈশাখ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ। খুব ব্যাকুল হয়ে সকালে মঠে গিয়েছি—পরীক্ষা করে দেখতে, তিনি মঠে এসেছেন কি না। কারণ, গতরাতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। গত পাঁচ-ছয় মাস বিজ্ঞানানন্দজী এলাহাবাদে ছিলেন। কখন মঠে আসেন, কখন চলে যান, জানতেও পারি না—কাজের চাপে মাঝে মাঝে গিয়ে যে খবর নেব, তার সময় ও সুযোগ কোনোটাই আমার নেই। কাজেই মনে একটা অভিমান জমে উঠেছিল, যদি এমন হয়—এলেন, চলে গেলেন, খবর জানতেও পারলাম না—তাহলে...ইত্যাদি চিন্তায় মন আচ্ছন্ন ছিল (কম বয়সে যা সাধারণত হয়)। যে-দিন মঠে গেলাম, তার আগের দিন রাতে আমাদের ক্লাব 'বিবেকানন্দ ইউনিয়ন'-এ ব্যায়াম করে জনৈক আত্মীয়ের বাড়ি যাই। রাত বারোটায় সেখান থেকে বাড়ি ফিরছি। একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা জনশূন্য, দোকানপাট সব বন্ধ; চারিদিক জনমানবশূন্য, নিস্তব্ধ। একলা ফুটপাত ধরে চলেছি। হঠাৎ, একটা গাছের অন্ধকার ছায়া থেকে একটি অপরিচিত যুবক বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল, “উনি মঠে এসেছেন, আর আপনি দেখা করতে যাননি?” একথা বলেই আমার বিপরীত দিকে চলে গেল। আমি অবাক! 'কে যুবকটি?—কোনোদিন তো দেখিনি' ইত্যাদি ভেবে পিছন ফিরে তাকাতে আর তাকে দেখতেই পেলাম না; খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা—মনে নানা কথা জাগতে লাগল। তাই পরদিন থাকতে না পেরে বেলুড় মঠে গিয়ে শুনি, সত্যিই বিজ্ঞানানন্দজী এসেছেন। (ঘটনাটি আমার মনেরই প্রক্ষেপ হতে পারে। আবার কাকতালীয়বৎ-ও হতে পারে।) আনন্দে উন্মাদের

মতো হয়ে মঠবাড়ির দোতলায় উঠে দেখি—ঘর খালি, গঙ্গার দিকের (দোতলার) বারান্দার রেলিং ঘেঁষে একটা চেয়ারে দক্ষিণাস্য হয়ে তিনি বসে আছেন। দেখে এত আনন্দ হয়েছে যে প্রণাম করতেই ভুলে গিয়েছি। ভাবছি, ইনি করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণেরই আরেক মূর্তি। চিন্তায় বাধা পড়ল—হুঁশ ফিরে এল, 'কী খবর?' শুনে। একবার ভাবলাম তাঁকে আগের রাতের ঘটনাটা বলি—আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, ঘটনাটা যা-ই হোক, তাঁর কৃপাতেই ঘটেছে। কিন্তু ভয় হলো, তাছাড়া ভক্তেরাও সব বসেছিলেন। শুনলাম, আজই তিনি এলাহাবাদ ফিরবেন। একটু পরেই যাওয়ার তোড়জোড় চলতে লাগল দেখে ভাবলাম, আর একটু হলেই এবার আর দর্শন হতো না! মঠের মহারাজরা তাঁকে প্রণাম করতে এলেন। আমি কিছু টাকা কিছুদিন ধরে (বেশ কষ্ট করেই) সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। সামনে একটি তেপায়ার ওপর তা রেখে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কী?" আমি ভয়ে ভয়ে, লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বললাম, "মহারাজ, গুরুপ্রণামি।" মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "তোমরা এসব দিতে আস কেন? যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁরা এসব করবেন।" আমি চুপ করে রইলাম; ভয় হতে লাগল, যদি না নেন! অন্তর্যামী তিনি, যেমন আমার অভিমানের কথা টের পেয়েছিলেন, দারিদ্রের কথা টের পেয়েছিলেন, তেমনি তখনকার মনের ভাবও বুঝে কৃপা করে সেই সামান্য প্রণামি গ্রহণ করলেন।

মঠ থেকে গাড়ি ছাড়ার পর, আমি মঠে আরতি দেখে হাওড়া স্টেশনে গেলাম। সময় ছিল প্রচুর, ট্রেন ছাড়বে রাত্রি নটার কাছাকাছি। বিজ্ঞান মহারাজ স্টেশনে যেতেন গাড়ি ছাড়ার সময়ের অনেক আগে, প্রায় দু-তিন ঘণ্টা আগে। স্টেশনে গিয়ে দেখি, মহারাজ ট্রেনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বসে রয়েছেন ও ভক্তেরা সামনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। মহারাজ বললেন, "আপনারা যখন এসেছেন, আমার একটু উপকার করুন। আপনারা উঠে এসে কামরার মধ্যে বসুন, তাহলে ভিড় দেখে কেউ আর এ-কামরাতে উঠবে না। ট্রেন ছাড়ার সময় নেমে যাবেন। আমিও মজা করে ফাঁকা ট্রেনে যাব। কামরাতে ভিড় দেখলে, বিশেষ করে সাহেব-মেমগুলো উঠবে না—ওরাই সব থেকে বেশি জ্বালাতন করে।" তারপর তিনি নিজে কীভাবে একবার এদের সঙ্গে এক কামরাতে যাওয়ার সময় অসুবিধা বোধ করেছিলেন তা বললেন; মহাপুরুষ মহারাজেরও অনুরূপ একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। তারপর নানাভাবে আমাদের হাসাতে লাগলেন। উপস্থিত এক মহারাজের হাত থেকে বিজ্ঞান মহারাজ ছেলেমানুষের মতো মানিব্যাগ কেড়ে নিলেন। সেই মহারাজ বারবার ফেরত চাইছেন, কিন্তু তিনি দিচ্ছেন না। শেষে

যখন সেই মহারাজ বললেন, "ব্যাগ দিন, এখুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে"—তখন বিজ্ঞান মহারাজ হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "ভালই তো হবে। এই নাও তোমার পয়সা। ব্যাগটা খুব ভাল, আমার পছন্দসই, আমি আর দেব না।" এধরনের হাসাহাসি চলল—তিনি চলে যাবেন বলে আমাদের মনে যে ভারাক্রান্ত ভাব ছিল, তা এভাবে কাটিয়ে দিলেন।

* * *

২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার। কিছুদিন থেকে মনে একটা দারুণ হতাশার ভাব এসেছে—ধ্যান-জপ করে তো কিছুই হলো না। কোনো কিছু আর ভাল লাগছে না। এক-একবার মনে হচ্ছে, ভালভাবে ঠিকমতো সবকিছু করতে পারিনি, তাই হয়নি। আবার মনে হচ্ছে, একটু তো করেছি—তারও তো কিছু ফল হবে, কিছুই হলো না কেন? স্থির করলাম, এসব ছেড়ে দেব, কোনো লাভ নেই এসব করে। মনের এই অবস্থায় খুব ভয়ও পাচ্ছি। কোথায় ভক্তি-বিশ্বাস বাড়ার কথা—তা নয়, এই অধঃপতন! এইসময় শুনলাম, বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠে এসেছেন। ভাবলাম—ভালই হলো, তাঁর কাছে গিয়ে মন্ত্র ফেরত দেব।

যাহোক, মঠে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করলাম। মন তখনো ভীষণ অশান্ত। তিনি যথারীতি 'কী খবর?' জিজ্ঞাসা করলেও এ-দিন আর কোনো কথা বললাম না—মাথাটা শুধু একবার নাড়লাম। মেঝেতে বহু ভক্ত বসে ছিলেন—ঘরভর্তি লোক—মনের কথা বলার কোনো সুযোগ পেলাম না। ভাবছি—কী করে বলি; বললেও উনি হয়তো শুনে দারুণ বকুনি দেবেন। হয়তো বলবেন, জোর করে জপ-ধ্যান করো—যা তখন ভালই লাগছিল না। বসে বসে উসখুস করতে করতে শেষে উঠে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে শুধু বলতে পারলাম, "কই, কিছু তো হচ্ছে না!" তিনি মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "বিশ্বাস করে লেগে থাকুন, হবে বইকি। সময়ে হবে।" কথাটা আমার ভাল লাগল না, অসন্তুষ্টই হলাম। আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল—তিনিও যথারীতি বললেন, "এবার আপনারা উঠুন, আমাকে একলা থাকতে দিন।"

আরতিতে গেলাম কিন্তু মনে অশান্তির ঝড় বইছে। ভাবলাম, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। আরতির পর মহারাজের সঙ্গে একলা একটু কথা বলার প্রার্থনা জানালাম তাঁর সেবকের কাছে। মহারাজের অনুমতি পেয়ে ঘরে গেলাম—তিনি আর আমি। সেবক দরজা ভেজিয়ে দিলেন। মহারাজ গম্ভীর। বললাম, "মহারাজ, আমার অধঃপতন ঘটেছে। আমার ভক্তি-বিশ্বাস বৃদ্ধির পরিবর্তে একেবারে লোপ পেয়েছে। ধ্যান-জপ আর ভাল লাগছে না। ...আমার

দ্বারা আর কিছু হবে না। আমার আর কোনো আশাভরসা নেই। কী নিয়ে আমি জীবনে দাঁড়াব?” যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হলো না—বকুনিও দিলেন না, কোনো উপদেশও না। বললেন, “সেকী! কই দেখি!” একথা বলে আমাকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে বললেন। চার-পাঁচ মিনিট বড় বড় চোখ করে আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, আমার আপাদমস্তক খুব ভালভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তারপর দৃষ্টি স্বাভাবিক করে বললেন, “ও কিছু না। আপনার কোনো ভয় নেই। এবার যান।” নিমেষে আমার মনের অশান্তি কোথায় চলে গেল, নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা যেন ধুয়ে-মুছে গেল। তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে শান্তি ও আনন্দ-ভরা মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * *

বেলুড় মঠে অখণ্ডানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজী দু-জনেই রয়েছেন। বিকাল চারটায় মঠে গিয়ে বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম করতেই তিনি অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে প্রণাম করে আসতে বললেন; স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে তিনি ছিলেন। ঘরে সেবক ছাড়া কেউ ছিল না, দু-জনে কথা বলছিলেন—তার একটু আমার কানে এল, “তীর্থধর্ম নিজে করার চেয়ে পরকে করানো আরো ভাল।”

বিজ্ঞানানন্দজী সে-দিনই এলাহাবাদ ফিরবেন, একটু পরেই রওনা হবেন। কিছুক্ষণ পরে অখণ্ডানন্দজী ঘরে ঢুকে বললেন, “প্রসন্ন, তুমি এখনই যাবে?” বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, “হ্যাঁ মহারাজ, এবার বেরুব।” অখণ্ডানন্দজী বললেন, “এর মধ্যে যাবে কেন? এখনো অনেক সময় আছে!”

—সূর্য থাকতে থাকতে বেরুব।

—তোমার আবার এসব অত পালন করার দরকার কী? এখন যেয়ো না। আমি বেড়িয়ে আসি, তারপর যাবে।

একথা বলে হাসতে হাসতে অখণ্ডানন্দজী বাইরে গেলেন। সন্ধ্যার একটু আগে ফিরে বললেন, “প্রসন্ন, আমি এসেছি, তোমার একটু দেরি করে দিলাম।” বিজ্ঞানানন্দজী হাসতে হাসতে বললেন, “না, এমন কিছু না। এখন যাই?” অখণ্ডানন্দজী দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে মোটরে তুলে দিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, “আবার কবে আসছেন?” উত্তর গতবারের মতোই—“রামের ইচ্ছা।” অখণ্ডানন্দজীকে হাতজোড় করে প্রণাম করলেন, তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

* * *

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট-পদে বৃত হন। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে বেলুড় মঠে এসেছেন।

ঐসময় আমার মনে একটা সন্দেহ মাথা তুলেছিল। ঠাকুরকে যে পুজো করি, যা নিবেদন করি, তিনি কি তা সত্যিই গ্রহণ করেন? মনে হলো—সকলের না, হয়তো খুব শুদ্ধচিত্ত যাঁরা, তাঁদেরই পুজো শুধু গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানানন্দজীকেও ভক্তেরা যা ফল-মিষ্টি প্রভৃতি দেন, তা-ও তো দেখেছি, হয় তিনি ভক্তদের বিলিয়ে দেন, না হয় ভাঁড়ারে পাঠিয়ে দেন—নিজে তো কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনিও কি আমাদের পুজো গ্রহণ করেন?

একদিন তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি—কিছু নিয়ে যেতে ইচ্ছা হলো। দরিদ্র আমি—বেশি দাম দিয়ে ভাল কিছু কেনার সামর্থ্য নেই। রাস্তায় খুব বড় অথচ কচি ডাব দেখে দুটো কিনে নিলাম। বেলুড় মঠে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। এ-সময় কাউকে বিজ্ঞান মহারাজ ঘরে থাকতে দেন না, আরতির পর সাধারণত কারো সঙ্গে দেখাও করেন না। কাজেই দারুণ দুশ্চিন্তা হলো, আজ আর বোধ হয় দর্শনই হলো না! ওপরে উঠে দেখি, তখনো দরজা খোলা—মহারাজ উত্তরাস্য হয়ে ঘরে বসে আছেন। ঘরে আর কেউ নেই, কেবল সেবক দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসার জন্য তৈরি হচ্ছেন; তিনি বললেন, "আজ আর দেখা হবে না, নিচে যান।" দমে গেলাম—এত ছোটাছুটি সব বৃথা হলো! ডাব-দুটি সেবকের হাতে দিয়ে বাইরে থেকেই প্রণাম করলাম। মহারাজের দৃষ্টি পড়ল, বললেন, "কী খবর? আসুন, বসুন; কী?—ডাব এনেছেন? বেশ বেশ।" সেবককে বললেন, "ওহে, ডাব এনেছে। দেখো, আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছি ডাব খাব—আর ডাব এসে গেছে! কাটো তো একটা, খাওয়া যাক।" বললেন, "দেখো হে, সন্ধ্যার সময়, আবার হাত কেটো না! তাহলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। খুব সাবধান। বেশ ডাব হে!" ছেলেমানুষের মতো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেবক বললেন, "মহারাজ, আপনি তো বিকেল তিনটার সময় ডাব খান, সন্ধ্যার সময় খাবেন?" মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খাব। তুমি কাটো।" তাকিয়ে দেখি, মহারাজের ঘরেই সাত-আটটা ডাব মজুত আছে। সেবকের কাছে শুনলাম, বিকালে তাঁকে ডাব খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি খেতে চাননি।

ডাবের জল খুব আনন্দ করে খেলেন। দেড় গ্লাস জল—সবটাই খেয়ে ফেললেন। আমি আনন্দে অধীর হয়েছি—এঁরাও তাহলে পুজো গ্রহণ করেন!

মনের গোপন কথা সব জানতে পারেন—ছোটখাটো সব সন্দেহই সহানুভূতিমাখা কোমল স্পর্শে দূর করেন!

তারপর ডাবেরই গল্প চলল—মাদ্রাজে খুব ডাব খেয়েছিলেন, সিংহল না কোথায় 'গোল্ডেন কোকোনাট' খেয়েছিলেন ইত্যাদি। রাত প্রায় আটটা হলো। এর আগে কোনোদিনই আরতির সময় বা পরে তাঁকে এভাবে কারো সঙ্গে গল্প করতে দেখিনি। তাই খুব আশ্চর্যও হলাম এবং নিশ্চিত ধারণা হলো, এই দরিদ্র সন্তানটিকে কৃপা করার জন্যই এই ব্যতিক্রম করলেন।

* * *

মহারাজ মঠে এসেছেন, দেখা করতে গিয়েছি। কিছুকাল যাবৎ একটা কথা মনে প্রায়ই উঠছিল—মহারাজকে প্রণাম করেছি বহুবার, কিন্তু সোজাসুজি তাঁর পাদস্পর্শ করার সৌভাগ্য কখনো হলো না—পায়ে সবসময় মোজা পরে থাকেন। ঐ-দিন হঠাৎ আমায় বললেন, "আমার মোজাটা খুলে দেবেন?" আমি তো হাতে চাঁদ পেলাম! মোজা খোলার পর দেখি, হাসছেন। বললেন, "আমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবেন?" এত সৌভাগ্য কল্পনাও করিনি! কিছুক্ষণ পরে বললেন, "থাক, হয়েছে। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আপনি হাত বুলিয়ে দিতে আরাম হলো।" বুঝলাম, অন্তর্যামী তিনি—কেবল স্পর্শ নয়, সেবা করার অধিকারও একটু দিয়ে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

* * *

বর্ষাকাল। বিজ্ঞান মহারাজ মঠে এসেছেন। বিকালে গিয়েছি। একজন সাধু (বাইরের) সাত-আটটি কুমারীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজকে প্রণাম করে বললেন, "এরা ব্রহ্মচারিণী, মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন।" মহারাজ রাজি হলেন না। বললেন, "আমার কাছে স্পেশাল কেউ নেই, আমার কাছে সবাই সমান। আর আমার আশীর্বাদে কোনো কাজ হবে না; যদি হতো, তাহলে ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করার আগে নিজের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতাম। আমার আশীর্বাদ করবার কী অধিকার আছে, সবই সেই ঠাকুর, মা।" পরে, সবাই চলে গেলে যখন একা আছি, আমাকে বললেন, "মনের আশীর্বাদ চেয়ে নেবেন।"

* * *

জুলাই, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজ মঠে এসেছেন। দেখা করে বললাম, "মহারাজ, এলাহাবাদ যেতে ইচ্ছা হয়, সুযোগ হয় না।" বললেন, "দেখুন,

সুযোগ করে নিতে হয়। Where there is a will there is a way. একটা লোক সমুদ্রে স্নান করতে গেছিল। কিন্তু জলে নামতে যাচ্ছে, একটা বড় ঢেউ আসছে দেখে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল; আবার একটু পরে নামতে যাচ্ছে, আবার একটা বড় ঢেউ, আবার পিছিয়ে এল। সমুদ্রের ঢেউও থামল না, তার আর সমুদ্রস্নানও হলো না। তাই বলছি, সংসারসমুদ্রের ঢেউ সবসময়ই চলবে, ওরই ফাঁকে কাজ সেরে নিতে হবে। বিপদ-আপদ, বাধা-বিঘ্ন চলতেই থাকবে, ওসব উপেক্ষা করে ওরই মধ্যে কাজ সেরে নিতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে না, অপেক্ষা করলেও চলবে না। সবই একসঙ্গে চলবে—আপনার কাজও, আর বিপদ-আপদ বাধা-বিঘ্নও। তা না হলে বৃদ্ধার কাশীবাসের মতো হবে—শেষপর্যন্ত যার কাশীবাস আর হলো না।”

আরো সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমনসময় একজন পাশ্চাত্য মহিলা (বাঙালি মেয়েদের মতো শাড়ি-পরা) ঘরে ঢুকে মহারাজকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করলেন। খুব হাসি-খুশি, বয়স আন্দাজ চব্বিশ-পঁচিশ বছর। মহারাজের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। পরে শুনলাম, মহারাজের দীক্ষিতা। তিনি একটা বেল এনেছিলেন, মহারাজকে দিলেন। মহারাজ সেটি নিয়ে সমর মহারাজকে দুটি প্রসাদি আপেল দিতে বললেন। মেয়েটি খুব খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, “একটা দিলাম, দুটো পেলাম!” আরো কথাবার্তার পর তিনি চলে গেলেন।

*　　　*　　　*

নভেম্বর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ। মহারাজ সতেরো-আঠারো দিন বেলুড় মঠে ছিলেন। কিন্তু শরীর খুব খারাপ থাকায় দর্শনের সৌভাগ্য বহুজনের হলেও কথা বলা নিষেধ ছিল। এমনই একদিন লাইন দিয়ে আমরা অনেকেই পরপর ঘরে ঢুকে প্রণাম করে যাচ্ছি—কথা বলা নিষেধ। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, প্রণাম করে ‘মহারাজ, একটা প্রশ্ন’ বলতেই একটা আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, “এখানকার নিয়ম কি জানেন?” আমি বললাম, “কি?” মহারাজ বললেন, “এই যে একটা আঙুল তুলে দেখাচ্ছি, একটি কথাও নয়, আর দর্শন এই এক মিনিট!” তবু বললাম, “একটা প্রশ্ন ছিল।” কিন্তু মহারাজ বললেন, “একটিও কথা নয়—এই আমার একটা আঙুল দেখছেন—এক মিনিট!” কাজেই বাইরে গেলাম। আরতির পর, আরো কিছুক্ষণ মঠে কাটিয়ে রাত আটটায় বাড়ি ফেরার আগে বারান্দা থেকে মহারাজকে প্রণাম করে যাব ভেবে দরজার সামনে যেতেই, হাতের ইশারায় ডাকলেন; বসতে বললেন—ঘরে আর কেউ নেই। বললেন, “এত রাত্তির হলো, বাড়ি যেতে ভয় করবে না?” সেই ভয়ের কথা!

আমি বললাম, "না।" আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "কী আর করবেন! দিনান্তে এক বার তাঁকে ডাকলেই হবে, দয়াল ঠাকুর।" একটু চুপ করে থেকে ঘাড় নেড়ে হেসে আবার বললেন, "না ডাকলেও হবে!"

আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। দীক্ষার সময় থেকে আমার মনে ভয় ছিল—যদি সব ঠিকমতো না করতে পারি, কী হবে? বুঝলাম, সেই ভয় ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যই একথা বললেন।

এর আগে একদিন শ্রীশ্রীমাকে হাত তুলে প্রণাম করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "জগজ্জননী—মাথা নত করে বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবেন।"

এই সময়ের মধ্যে আর একদিনের ঘটনা। মহারাজের শরীর খারাপ, তাই বাইরে থেকে প্রণাম করে যাব ভেবে দরজায় দাঁড়াতেই, 'ঐ এসেছে, ঐ এসেছে আবার' বলে হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন, বাইরে কেন, আপনিও গুলজার করুন।" ঘরে ছ-সাত জন সাধু ছিলেন, একজন তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলেন। মহারাজ রামায়ণের কথা এবং শ্রীরামচন্দ্র, যিশুখ্রিস্ট ও মহম্মদের কথা বলতে লাগলেন—তাঁদের চেহারার বর্ণনা দিতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লোক-চেনার কথা বললেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "উর্বশী খুব ভাল নাচতে পারেন।" ঐকথা বলেই তার নাচের ভঙ্গি দেখাতে লাগলেন! সাধুরা ও আমি হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলাম। উচ্চহাস্যের শব্দে ততক্ষণে আরো দু-এক জন সাধু এসে গিয়েছেন—সবাই প্রাণ খুলে হাসছেন! ঘর ফাটিয়ে হাসির রোল উঠল। বহুক্ষণ পরে হাসি থামল। তখন আমাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন হলো?"

ঐ-দিনের আনন্দের রেশ আমাকে ছ-সাত দিন মশগুল করে রেখেছিল। এখনো মনে পড়লে হাসি পায়। অবাক হয়ে ভাবি—এত গুরুগম্ভীর তিনি, কী করে আমাদের মতো ছেলেমানুষ হয়ে এত আনন্দ দিলেন!

* * *

১৪ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, মকর সংক্রান্তি। বেলুড় মঠে বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন মন্দিরে বসালেন। সারাদিন প্রণাম করার সুযোগ পাওয়া গেল না, বিকালে ঘরে গিয়েছি। যথারীতি প্রশ্ন করলেন, "কী খবর? কখন এলেন?" বললাম, "সকালেই এসেছি।" মহারাজ বললেন, "ঠাকুরের নূতন মন্দির হলো, ঠাকুরও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। আমার কাজ শেষ হলো।

আপনাদেরই মঠ, আপনারা আসবেন এখানে। এবার আমি চললুম।" বললাম, "আবার কবে আসছেন?" বললেন, "আরেক বার আসব, আর আসব না। ঠাকুরের তিথিপুজোটা মন্দিরে করে যেতে হবে। সেইসময় আসব, আর আসব না।"

কথাটা তখন এমনি কথার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু তা-ই শেষে নির্মম সত্য হলো।

* * *

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার অপরাহ্ণ। এলাহাবাদ থেকে বিজ্ঞানানন্দজী বেলুড় মঠে এসেছেন শুনে দর্শন করতে গিয়েছি। দর্শনের সময় লক্ষ করলাম, মহারাজের পা-দুটো খুব ফুলেছে। সামনে দাঁড়াতেই ছেলেমানুষের মতো খুব জোরে বললেন, "এই যে, এসেছেন! কেমন আছেন? ওহে, আসছে শুক্রবার ঠাকুরের তিথিপুজো, রবিবার সাধারণ উৎসব—ঐ দু-দিনই আসা চাই। এখানকার পকেটমাররা আপনার পকেট মেরে নেবে—কেমন হবে?" এই বলে খুব হাসতে লাগলেন। সবাই হাসিতে যোগ দিলাম।

দু-দিনই এসেছিলাম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সাধারণ উৎসবের দিন সত্যিই আমার পকেটমার হলো।

এরপর তাঁর এলাহাবাদ ফিরে যাওয়ার আগে আরো দু-এক বার গিয়েছি। কিন্তু শরীর খুব খারাপ বলে দর্শন হয়নি। শেষে একদিন ঘর থেকে দর্শন দিলেন —জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সেই শেষ দর্শন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৭৮তম বর্ষ, ৮ম ও ১০ম সংখ্যা)

মহাপুরুষ প্রসঙ্গ

অমরেন্দ্রনাথ বসু

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রলয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে বিহারের কয়েকটি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অসংখ্য ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে এবং বহু প্রাণহানি ঘটে। আমি তখন মেডিক্যাল কলেজের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। পরীক্ষা সামনেই, তবুও বিবেকানন্দ সঙ্ঘের সভ্য হয়ে আর্তসেবায় মুজফ্‌ফরপুর ছুটে না গিয়ে পারলাম না। সেখান থেকে ফিরে এসে সেই ভূমিকম্পের ভয়াবহ ক্ষতির উপশমে সামান্য সেবা করবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিজস্ব সংস্থা থেকেও কিছু অর্থ সংগ্রহ করি এবং সেই অর্থ জমা দিতে আমি ও আমার বন্ধু মনোরঞ্জন একদিন বেলুড় মঠে উপস্থিত হই।

এর আগে ঠাকুর-স্বামীজীর বই কিছু কিছু পড়েছিলাম, তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাও ছিল; কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে মঠের সাধুসঙ্গ এর আগে কখনো হয়নি। তাই যখন বিকালে আমরা পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে (গঙ্গাধর মহারাজ) দর্শন ও প্রণাম করতে গেলাম, তখন তাঁর প্রসন্ন সহাস্যবদন, স্নেহময় দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে ফেলল। চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে মহারাজ বসেছিলেন—সাধারণত ছবিতে যেমন দেখা যায়। পূজনীয় ভরত মহারাজ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মনোরঞ্জন মঠের পরিচিত ভক্ত এবং হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর সহকারী ছিল। গঙ্গাধর মহারাজ তাকে কিছু কমিক করতে বললেন। সে কিছু কমিক করে দেখাল; তার অঙ্গভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তা শুনে পূজনীয় মহারাজ আনন্দ করতে লাগলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, ভূমিকম্পের ত্রাণের জন্য আমরা টাকা তুলে এনেছি, তখন খুব খুশি হয়ে বললেন, "এই তো চাই। আর্তসেবাই স্বামীজীর আদেশ—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। তোমরা যুবক, ডাক্তার হতে যাচ্ছ—ঠাকুর কিন্তু লোকের কষ্ট থেকে উপার্জন করে বলে ডাক্তার, উকিলের কাজ পছন্দ করতেন না। তবে নিঃস্বার্থ সেবা করলে তাতে দোষ হয় না। দেখো, জীবসেবা যেন সেভাবে করতে পারো।"

আশ্চর্য মহাপুরুষের কথা! সত্যিই, ডাক্তার হয়েও জীবনে অর্থের বিনিময়ে আর্তসেবা করতে হয়নি। গবেষণার কাজে নিযুক্ত থেকে সাধু-ভক্তদের সামান্য সেবা করার সুযোগ প্রভু এই জীবনে করে দিয়েছেন। পূজ্যপাদ

স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে দর্শনের পর তাঁর সেই ত্যাগদীপ্ত, তেজস্বী রূপটুকু আমার মনকে বারে বারে আকর্ষণ করতে লাগল—মনে যেন আগুন ধরে গেল।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকেই আমার মন দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু অখণ্ডানন্দজী তো বেলুড় মঠে থাকেন না, থাকেন সারগাছিতে! সংসারের কঠিন নিগড়ে বাঁধা মাতা-পিতৃহীন এক ছাত্র আমি। কেমন করে সেখানে যাব! তাছাড়া, মহাপুরুষদের জীবনীপাঠে জেনেছিলাম এবং মনেও এটা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে ছিল যে, সময় হলে গুরু আপনি এসে ডেকে নেবেন।

যাহোক, এরূপ মানসিক অবস্থায় একদিন মনোরঞ্জনের সঙ্গে বেলুড় মঠে উপস্থিত হলাম। পূজনীয় ভরত মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন, "যাও ওপরে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট—শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদ, এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। দর্শন-প্রণাম করে এসো।" ঠাকুরের পার্ষদ শুনে মনটা সহসা আনন্দে নেচে উঠল।

ওপরের ঘরে প্রবেশ করতেই মৃদুহাস্যময় প্রশান্তবদন মহাপুরুষের ওপর চোখ স্থির হলো। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে প্রণাম করলাম এবং কেন জানি না, মনে মনে প্রার্থনা করে ফেললাম, 'মহারাজ! আপনিই আমাকে কৃপা করুন।' ভুলে গেলাম—তিনি তো আমাকে কখনো দেখেননি, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু জানি না। আরো ভুলে গেলাম, দীক্ষার পূর্বে গুরু-শিষ্যের পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন। কেবল তাঁর গম্ভীর অথচ শান্তমূর্তি এবং আয়তনেত্রের ভিতর দিয়ে যে তন্ময় ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছিল, তা-ই যেন আমাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করল।

যথাসময়ে বাসন্তীপূজার মহাষ্টমীর পুণ্যদিনে আমার দীক্ষা হয়ে গেল। জানতামও না এবং কেউ বলেও দেয়নি, তাই দীক্ষার কোনো উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যাইনি। পুরানো ঠাকুরঘরের পাশে ঠাকুরের শয়নকক্ষে আমাদের দীক্ষা হলো। মনে আছে, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বললেন, "সাবধানে এসো, ঠাকুরের খাটে যেন কোনো স্পর্শ না লাগে।" মহারাজ বেশি কথা বললেন না। প্রার্থনা, ধ্যান-জপের পদ্ধতি দেখিয়ে এবং করজপ করিয়ে, মূলমন্ত্র বলে তাঁর সঙ্গে বারো বার জপ করালেন। তিনি যখন মন্ত্র জপ করছিলেন, তখন এমন এক অতলস্পর্শী মধুরঝঙ্কারের অনুরণন শুনেছিলাম, যা আজও ভুলতে পারিনি। শত চেষ্টা করেও সেই ঝঙ্কৃত-মন্ত্রের স্বরলহরি নিজকণ্ঠে তুলতে পারিনি। মনে হয়, শব্দ যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁর স্বরে যেন তা-ই প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাজ মন্ত্রজপের সঙ্গে ধ্যানের উপযোগিতাও বুঝিয়ে দিয়ে শ্রীভগবানই যে একমাত্র

আশ্রয়স্থল, তার একটি গল্প বলেছিলেন। আর জীবনে চলার পথে দুটি উপদেশ পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—"সদা সত্যরক্ষা করবে এবং কাম-ক্রোধাদির বেগ যথাসম্ভব ধারণ করবে।"

কথাগুলি সংক্ষিপ্ত ও সরল হলেও তাতেই যে ধর্মের চরমতত্ত্ব নিহিত আছে, তা কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। সে-দিন যে-কথাগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বলে পালন করা সহজ মনে করেছিলাম, আজ এই বার্ধক্যে জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝি, সেই উপদেশ-দুটি পালন করা তত সহজসাধ্য নয়। তবে এটুকু বুঝেছি যে, 'ভাবের ঘরে চুরি' না করে মন-প্রাণ দিয়ে যথাসাধ্য উপদেশগুলি পালন করবার চেষ্টা করলে আর ভয় নেই। দীক্ষান্তে মহারাজ বলেছিলেন, "আর কী! এই হলেই হলো।"

মহানবমীর দিন আবার মঠে গেলাম। মহারাজের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসলাম, ঘরে অনেকে ছিলেন। মহারাজের পায়ের কাছে একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখলাম। মহারাজ সহাস্যবদনে সকলের সঙ্গে আলাপ করার মাঝে মাঝে মার্কিন মহিলার সঙ্গেও কথা বলছিলেন। নিচে প্রাঙ্গণে তখন মহানবমী পুজোর বাজনা বাজছিল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের দর্শনলাভ হলো তমলুক রামকৃষ্ণ আশ্রমে। আমরা কয়েক জন বন্ধু আগের দিন আশ্রমে পৌঁছে শুনলাম যে, বিজ্ঞান মহারাজ পরদিন আসছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর দর্শনের সুযোগ হওয়ায় বড়ই আনন্দ হলো। নির্দিষ্ট দিনে সকালে শোভাযাত্রা করে মহারাজকে শহর-প্রদক্ষিণ করিয়ে আশ্রমে আনা হলো। পথে রোদের জন্য মহারাজের যে কষ্ট হচ্ছিল, তা অনুভব করছিলাম—কিন্তু তাঁর মুখে কোনোরূপ চাঞ্চল্য বা বিরক্তির ভাব দেখলাম না, অম্লানবদনে সব সহ্য করলেন। মঠে পৌঁছে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসার পর, একজন ব্রহ্মচারী একটি বড় পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। এক মিনিট যেতে না যেতেই মহারাজ পাখা বন্ধ করতে বললেন। সেবা গ্রহণ করতে তাঁর চিরকালের অনিচ্ছার কথা সকলেরই জানা ছিল। তাই পাখা বন্ধ হলো। মহারাজ সহাস্যে সকলের পরিচয় নিলেন।

এসময় মহারাজের আঞ্জনি হওয়ায় চোখটা ফুলে গিয়েছিল। মহারাজের সঙ্গে প্রিয় মহারাজ, জ্যোতিষ মহারাজ এবং স্বামী আদ্যানন্দ এসেছিলেন। জ্যোতিষ মহারাজ বললেন, "মহারাজ, অমর তো ডাক্তার; আপনার চোখে compress (সেঁক) দিয়ে দিক, আরাম পাবেন।" মহারাজও হেসে রাজি হলেন। যদিও আমি

তখনো ডাক্তারি পাস করিনি, শুধু ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি—তথাপি মহারাজের এই সামান্য সেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুবই কৃতার্থ বোধ করলাম। বিশেষত জানতাম যে, মহারাজ কারো সেবা গ্রহণ করেন না; বোধ হয়, আমাকে সেবার সুযোগ দেওয়া তাঁরই অযাচিত করুণা। দু-দিন (চার বেলা) তাঁর চোখে সেঁক দিয়েছিলাম—কিছু কমেও ছিল, কিন্তু সারেনি। তবু মহারাজ তৃতীয় দিনে বললেন, "থাক, আর দরকার নেই, কমে গেছে।"

এসময় মহারাজ আশ্রমের একটি বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাঠের মধ্যে দারুণ রোদে অনেকক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠান চলেছিল।

একদিন সকালে শহরের কয়েক জন ভদ্রলোক এসে মহারাজের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গের অবতারণা করেন। আমাদের জানা ছিল—মহারাজ বেশি কথা বলেন না, উপদেশও তিনি বড় একটা দিতে চান না। একজন ভদ্রলোক বারবার প্রশ্ন করায় আমাদের খুব বিরক্তি লাগছিল। মহারাজ কিন্তু কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে শুধু বলেছিলেন, "দেখুন, ধর্মজীবন পালন করতে হলে বেশি উপদেশের প্রয়োজন হয় না। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে যা পড়েছেন, 'সদা সত্যকথা বলিবে'—এই একটি উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলে জীবন সোনা হয়ে যাবে, আর উপদেশ বা আলোচনার প্রয়োজন হবে না।" ভদ্রলোক এবং উপস্থিত অন্য সকলে চুপ করে গেলেন।

তারপর মহারাজ নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু ঘটনা বললেন ঃ "আমি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। দেখলাম, ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। ভাবছি—'কী করব, ফিরে যাব কি?' তখন বাইবেলের কথাটা মনে পড়ল—'Knock and the door shall be opened unto you.' দরজায় টোকা দিলাম। তৃতীয় টোকায় দরজা খুলে গেল এবং শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই দরজার সামনে সহাস্যবদনে দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, বল তো, যদি একটা দেশলাই কাঠির আগুনে একগাদা খড় চাপানো হয়, তবে কী হবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'আগুন নিভে যাবে।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন, 'ঠিক, অর্থাৎ ভেতরে যে সামান্য জ্ঞানাগ্নি জ্বলছে, তাতে বেশি জঞ্জাল চাপাতে নেই; প্রথমদিকে সযত্নে জ্বালাতে হয়। তারপর যখন সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন যা-কিছু দেওয়া যায় তাতে আগুনের কিছুই হয় না, বরং সবই জ্বলে যায়।'"

মহারাজ আবার বললেন, "ঠাকুর perfect gentleman (প্রকৃত ভদ্রলোক)

ছিলেন এবং তাঁর ব্যবহার এত অমায়িক ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে আপনার করে নিতেন।” পরেই বলে উঠলেন, “বৎস, এই তো অনেক হলো।” সকলেই প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিলেন।

বিকালে একটি সভা হয়। মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য অনেক অনুরোধ করায়, শেষপর্যন্ত মহারাজ রাজি হলেন এবং স্বল্প ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর সকলের ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক—এই প্রার্থনা করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। অন্যান্যদের বক্তৃতার পর মনোরঞ্জন কমিক-শো দেখাল। মনে আছে, আমরা সকলে মহানন্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের গান গেয়েছিলাম—‘জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বল আমার মন’।

পরের দিন বিজ্ঞান মহারাজ কলকাতায় ফিরে যান। আমরা তাঁকে বিদায় জানাতে স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম। মনে বড়ই কষ্ট হতে লাগল। এই দু-দিন আশ্রমে কী আনন্দের বন্যাই না বয়েছিল!

এরপর গুরুদেবের দর্শন হয় আবার বেলুড় মঠে। তখন সবে আমি এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। মনোরঞ্জনের সঙ্গে মঠে গিয়েছিলাম। রাতে মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম। মনোরঞ্জন বলল, “মহারাজ, অমর ডাক্তারি পাস করেছে, আমাদের ভাল করে খাওয়াতে বলুন।” মহারাজের সেবক সমর মহারাজও সেকথায় সায় দিলেন। মহারাজ হেসে বললেন, “কেন? ও খাওয়াবে কেন? এত কষ্ট করে ও পাস করল, আবার ও-ই খাওয়াবে? তোমরা খাওয়াবে ওকে, এখনি খাওয়াও।” একথা বলেই সমর মহারাজকে বললেন, “দাও যা আছে, এদের খাইয়ে দাও।” সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে ঘিরে পাতা করা হলো এবং ভক্তদের আনা মিষ্টি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি আমরা সকলে খুবই আনন্দের সঙ্গে খেলাম। পূজ্যপাদ গুরুদেবের সেই স্নেহপূর্ণ আদর ও করুণামাখা কথাগুলি এখনো আমার মনে পড়ে।

এরপর ভাগ্যান্বেষণে আমাকে সুদূর আমেদাবাদ যেতে হওয়ায় মঠে মহারাজের সাক্ষাৎ-দর্শনের আর সুযোগ হয়নি। তবে তাঁর লেখা দু-তিনখানা পত্র ছিল এসময়ের সান্ত্বনা। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বহুদিনের অভীপ্সিত কেদার-বদ্রী যাত্রা করি। যাত্রান্তে এলাহাবাদে মহারাজের চরণে উপস্থিত হয়ে মনের ভবিষ্যৎ-সঙ্কল্পের কথা নিবেদন করবার ইচ্ছা ছিল। তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করে যখন এলাহাবাদ মঠে উপস্থিত হলাম তখন সেবাশ্রমে কর্মরত শৈলেন মহারাজ জানালেন যে, মহারাজের শরীর খুবই অসুস্থ—তাই দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কথা বলা তো দূরের কথা। এতদূর এসে গুরুদেবের দর্শনলাভে পর্যন্ত বঞ্চিত হব—একথা ভেবে বড়ই

দুঃখ হলো। তাছাড়া ভবিষ্যৎ-সঙ্কল্পাদি জানাবারই বা কী হবে? শৈলেন মহারাজ আমার মনের অবস্থা বুঝে বললেন, "আপনি বাইরের সিঁড়ির পাশে বসে থাকুন। যদি মহারাজ ডাকেন তবে যাবেন, নতুবা নয়। সাবধান, ডাকাডাকি করবেন না, না মহারাজকে দেখবার চেষ্টাও করবেন না।" অগত্যা বিষণ্ণমনে বাড়ির বাইরে সিঁড়ির পাশে বসে পড়লাম। যাওয়ার সময় দেখি, মহারাজ ভিতরের বারান্দায় অন্যদিকে মুখ করে একটি চেয়ারে বসে আছেন। সিঁড়ির পাশ থেকে মহারাজকে দেখা যায় না। ঘরে বা বাড়ির ভিতরে যে অন্য কেউ আছে তার সাড়াশব্দ পেলাম না। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ একটা কথা ভেবে হাসি পেল। ভাবলাম—মহারাজ তো জানেন না যে, তাঁর দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় সুদূর কেদার-বদ্রী হয়ে একজন এখানে এসে বসে আছে বোকার মতো!

আশ্চর্য! এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে মহারাজকে প্রণাম করে মাটিতে বসে পড়লাম। তখন প্রখর গ্রীষ্মকাল। মহারাজ মাথায় একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে বসে ছিলেন। আমি কথা বলার আগেই মহারাজ বললেন, "বাবা, কথা নয়।" কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে মহারাজের মুখশ্রী দেখতে লাগলাম—প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্তি, দৈহিক ক্লেশের কোনো বহির্লক্ষণ দেখলাম না। কথাবার্তা না হওয়ায়, আবার প্রণাম করে মঠের বাইরে এলাম। বড়ই দুঃখ হলো।

এখন বুঝি, কথার প্রয়োজন ছিল না। মহারাজ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমাকে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতেই হবে। তাই তিনি আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেননি। অধিকারী না হলে তো কিছুই পাওয়া চলে না।

এই আমার শেষ দর্শন। তারপরই খবরের কাগজে মহারাজের মহাপ্রয়াণের সংবাদ শুনে মর্মাহত হই। চিরকালের মতো কি অদর্শন হলেন? এখন মনে হয়, প্রয়োজনে তিনি নিশ্চয় আসবেন, আর দেখছিও তা-ই।

জীবনের বৈচিত্রময় পথে চলতে গিয়ে কত বাধাবিপত্তি, কত বিপর্যয়! কিন্তু তার মধ্যেও গুরুকৃপা যে অজান্তে কাজ করে চলেছে, তাঁর কৃপায় তা অনুভব করতে পারি।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯৭তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি

প্রীতিময়ী কর

স্মরণের মণিমঞ্জুষায় মাত্র গুটিকতক রত্ন সযত্নে রক্ষিত ছিল। দিনের শেষে কুলায়ে ফিরে আসা ক্লান্ত মন নিয়ে নিভৃত মন্দিরে বসে তা-ই দেখছিলাম—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পবিত্র গুটিকতক স্মৃতিকথা, অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে যা আমার জীবনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল।

প্রথম যে-দিন আমার নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে দর্শন করতে যাই, সে-দিন যে কী আগ্রহ ও কী উদ্বেগ নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম, ভাষাতীত সে অনুভূতি! দেখলাম, যেন হিমাচলেরই নিভৃত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত-গম্ভীর এক বিরাট মূর্তি। ঘরে গিয়ে প্রণাম করতে তিনি বললেন, "বসুন।" বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা তাঁর দিকে চেয়ে বসে রইলাম, কোনো কথা মুখে এল না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসছেন?" বললাম, "বালিগঞ্জ থেকে।" তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপ। মনের মধ্যে কী এক অভূতপূর্ব পবিত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল।

আমাদের মনের ইচ্ছার কথা বোধ হয় আগেই শুনেছিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিলেন; আমাদের আগ্রহান্বিত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেন, "শুধু মন্তর নিলে হবে না, সেইরকম কাজ করতে হবে।" একটু থেমে আবার বললেন, "পবিত্র হতে হবে।"

আবার নিস্তব্ধ হয়ে আমরা বসে আছি। তিনি তাঁর সেবককে বললেন, "এঁরা কবে আসবেন, একটা দিন বলে দাও।"

সেবক দিন স্থির করে তারিখ আমাদের বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম করে উঠছি, এমনসময় মহারাজ বললেন, "সাবধানে আসবেন যেন, অতদূর থেকে আসবেন!"

সেবক বললেন, "আজকাল আসবার আর কোনো অসুবিধা নেই, সোজা যাত্রিবাহী বাস হয়েছে।" তখন বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পর্যন্ত বাস চলাচল আরম্ভ

হয়েছিল। মহারাজ তখনি উত্তর দিলেন, "বাস হলেই তো হয় না, অতদূর থেকে আসা—এক বার ওঠা, এক বার নামা।"

অভিভূত হয়ে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জানা নেই, চেনা নেই, আলাপ নেই, তাদের প্রতি এই অহেতুক দরদ—উদয়াস্ত নিজের কথা-ভাবা মানুষ আমরা কল্পনাই করতে পারি না। কোনো লোককে কাজে পাঠিয়েছি, ফিরে আসতে তার দেরি হলে বিরক্ত হয়ে কত কটূক্তি করি। তার কিছু অসুবিধা হয়েছিল কি না, একথা মনে আসে না। আর আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, তাতে তাঁর চিন্তা হচ্ছিল, ব্যাকুলমন নিয়ে ভাবছিলেন—অতদূর থেকে আসতে বাসে এক বার ওঠা, এক বার নামা, যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে—বললেন, "সাবধানে আসবেন যেন।" সে-দিনই ধারণা হয়ে গেল, ঐ হিমাচল-সদৃশ আপাতকঠোর মূর্তির মধ্যে কী পরিমাণে স্নেহপ্রেমের মন্দাকিনী বয়ে চলেছে!

জানি, এই অপরের কথা ভাববার স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণ-প্রেরণাতেই জীবকুল বিশ্বসৃষ্টির আদিম কাল থেকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত হয়েছে—তবু সম্যক ধারণা করতে পারলাম কি? যাঁর অংশপ্রসূত এই বিরাট হৃদয়াধার, সমগ্র হিমালয়রূপী সেই বিশাল মহামানবটি কেমন ছিলেন! কী এক অজানা আবেগে চোখে জল এসে গেল।

আগুনের তাপে ফুটন্ত জলের ময়লা ওপরে ভেসে ওঠে। গুরুদেবের কাছে যাতায়াত করি আর চঞ্চল মনে কত দ্বন্দ্ব, কত প্রশ্ন, বিগতদিনের জানা-অজানা কত ভুলত্রুটির বেদনা সমস্ত চিত্ত জুড়ে আলোড়িত হতে থাকে। ইচ্ছা হয়—মন উজাড় করে সব কথা বলি, প্রশ্ন করি; কিন্তু যখন যাই তখন প্রশান্ত-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে যাই; কিছু আর বলা হয় না। তাছাড়া, বেলুড় মঠে তখন গুরুদেবকে দর্শনের জন্য অসম্ভব ভিড় হতো, কথা বলবার সময়ও পাওয়া যেত না। শুধু অভূতপূর্ব এক ভাবসম্ভারে মন পরিপূর্ণ করে ফিরে আসতাম।

একদিন ঐকথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণমন নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়েছি। ঠাকুরপ্রণাম শেষ করে সবুজ মাঠটা পার হতে হতে ভাবছি, এইসব মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের পর তাঁদের প্রতিকৃতি নিয়ে কত উৎসবের আয়োজন হয়! আর তাঁরা সশরীরে থাকতে তাঁদের দেখতে পাওয়া, মুখের একটু উপদেশ শুনতে পাওয়া এত দুর্লভ—এ কেমন কথা?

অতঃপর যখন তাঁর ঘরের মধ্যে গেলাম, দেখি—ঘর ফাঁকা, সুস্মিতবদনে গুরুদেব বসে আছেন। আমি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মুখের দিকে তাকিয়ে

বললেন, "কি, উপদেশ?" একটু থেমে বললেন, "সহ্য করবে। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগে দেখেছ না, তিনটে 'স' আছে—শ, ষ, স। সহ্য করবে।"

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, "শুধু সহ্যই করব, কোনো সার্থকতা আসবে না?"

গুরুদেব গম্ভীর অন্তর্মুখভাবে বললেন, "সার্থকতা—ভগবানলাভ হলে।"

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে গেলাম। প্রসন্নদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "পুজোটুজো কীভাবে করব?" উত্তরে বললেন, "যখন যেভাবে ইচ্ছা।" বললাম, "কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ—সব দেবতার পুজোই কি করব?" বললেন, "হ্যাঁ, তা করবে বইকি।"

পুজো-আরাধনার কোনো জ্ঞানই তো ছিল না। মনে হতো, ঠাকুরের মধ্যেই যদি সব দেবতা আছেন, তবে আর তাঁদের ভিন্ন নামে ডাকা কেন? এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো হয়। বললাম, "অন্য দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, না তাঁদের নামে ডাকব?"

গুরুদেব বললেন, "যাঁর যে নাম, তাঁকে সেই নামে ডাকাই তো ভাল। যার নাম 'রাম', তাকে 'শ্যাম' বলে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন?"

এমন সহজ কথাটা আগে কখনো ভাবিনি। যেমন লজ্জিত হলাম, তেমনি আনন্দে আপ্লুত হয়ে ফিরে এলাম সে-দিন।

'কিসে ধর্মলাভ হবে?'—প্রশ্ন করায় আরেক দিন বলেছিলেন, "সত্যকে আঁট করে ধরবে। একেবারে ঠিক ঠিক চলা—যা মুখে বলা, তা-ই কাজে করা। ঠাকুর সত্যস্বরূপ।"

'কিসে আনন্দ পাব'—প্রশ্ন করায় বলেছিলেন, "আনন্দ তো রয়েছেই, খুঁজে নিতে পারলেই হলো।"

আরেক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব সহাস্যে বসে আছেন। ঘরের একপাশে স্তূপাকার মিষ্টি ছিল। সেবককে বললেন, "এগুলি সব এঁদের দিয়ে দাও।" আমার ছোট্ট ছেলেকে তিনি নিজহাতেই মিষ্টি দিলেন।

তাঁর এলাহাবাদ ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছিল; বললাম, "আপনাকে চিঠি দেব।"

তিনি সহাস্যে বললেন, "হ্যাঁ, আমি কিন্তু জবাব দেব না।"

আমি ঃ যদি কিছু দরকার হয়?

মহারাজ ঃ দরকার হলে দেব।

শুনেছিলাম, তিনি প্রায়ই চিঠির জবাব দিতেন না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথমদিকে কেমন আশাহত হতাম। পরে তাঁর বিষয়ে বিশেষভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কী কঠোর সংযমী ও তপস্বী ছিলেন। লোকালয়ে এসে সরল শিশুর মতো অকপট সান্নিধ্য সকলকে দান করলেও—যখন তিনি এলাহাবাদে তাঁর নিজের সাধনপীঠে ফিরে যেতেন, তখন নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনায় সমাহিত হয়ে থাকতেন। ভক্ত, শিষ্য প্রমুখ জগতের যাবতীয় মানবের জন্য তাঁর কল্যাণ-কামনা ও আশীর্বাদ সে-সাধনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে শ্রাবণের ধারার মতোই নিয়ত বর্ষিত হতো—চিঠি লেখা বা তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন কোথায়? তবে বিশেষ প্রয়োজন বা ইচ্ছাবশে কখনো ব্যতিক্রম করতেন। আমাদের এক বার মাত্র তাঁর চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

যাঁরা সবসময় তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন তাঁদের কাছে শুনেছি, সময়ে সময়ে তিনি কী অপূর্ব কৌতুকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্দরসে ভাসিয়ে দিতেন।

এরপর একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি-পুজোয় মঠে গিয়েছি। সন্ধ্যার দিকে একজন সেবক গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে দিলেন। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো জ্বলছে। আধো-অন্ধকারে তিনি দক্ষিণদিকের জানলাটি ধরে উৎসবের দৃশ্য দেখছেন—উন্নতদেহে জানলার সবটুকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে। বইয়ে পড়েছি, স্বামী বিবেকানন্দও এমনভাবে ঐ দক্ষিণের জানলা ধরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের জন্মোৎসবের দৃশ্য দেখেছিলেন।

ভিতরে গিয়ে গুরুদেবকে প্রণাম করতে তিনি কুশল প্রশ্ন করলেন; কিছুক্ষণ পরেই বললেন, "সন্ধ্যা হয়েছে, এখন এসো।"

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষাদের। গুরুদেবের শরীর খারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, আমরা ঘরে যেতে উঠে বসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার কি শরীর খারাপ?"

বললেন, "হ্যাঁ, আমার শরীর খারাপ।"

আর কিছু কথা বলা উচিত মনে করলাম না। নীরবে মাটিতে প্রণাম করে চলে এলাম।

তিনি একটু সুস্থ হয়ে আবার এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময়। তিনদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যেই আরেক দিন গিয়ে দেখি, গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণামের জন্য ভীষণ ভিড় হয়েছে ঘরে। শরীর খারাপ, সেবক পায়ে হাত দিতে দিচ্ছেন না; তাড়াতাড়ি পায়ে মোজা পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথমে পায়ে হাত দিতে গিয়ে, নিষেধ করাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক তখনই গুরুদেব তাঁর বড় বড় চোখের চাহনিতে আমার দুঃখ-ম্লান চোখের দিকে তাকালেন।

সেই শেষ দর্শন। এলাহাবাদে তাঁর দেহরক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর অবলম্বনশূন্যের মতো ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। একজন পূজনীয় মহারাজ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ওঁরা কী কখনো ছেড়ে যান? দেহ যাওয়ার পর ওঁদের সত্তা আরও ব্যাপকভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আরও বেশি হয়। ওঁদের আরও বেশি কাছে পাওয়া যায়। ওঁদের জন্য শোক বা দুঃখ করার কোনো কারণ নেই।"

সেই সান্ত্বনা নিয়ে আর গুরুদেবের পদচিহ্ন বুকে ধারণ করে বাড়ি ফিরে এলাম। জীবনাকাশে যখন দুঃখের ঘোর ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে—অন্ধকারে ছেয়ে যায় হৃদয়াকাশ, তখন মনে পড়ে শ্রীমুখের সেসব কথা, আর শেষ দর্শনের সেই বড় বড় চোখের কৃপাঘন দৃষ্টি, সেখানে ধ্রুবতারার মতোই জ্বলতে থাকে—অমৃতবর্ষী, অচপল।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৫৯তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

স্মৃতিকণা

প্রীতিময়ী কর

আশ্বিন মাসে একদিন ভোর পাঁচটায় আমরা কয়েক জন বেলুড় মঠে যাত্রা করলাম। তখন সবে নবারুণের লোহিতচ্ছটা পূর্বাকাশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। প্রাত্যহিক কাজকর্ম সবে একটু একটু আরম্ভ হয়েছে। একজন ব্রহ্মচারী ফুলের সাজি ও আঁকশি নিয়ে গাছের ডাল টেনে ফুল তুলতে ব্যস্ত। একজন গঙ্গার ধারে শ্রীব্রহ্মানন্দের মন্দির পরিষ্কার করছিলেন। এই মন্দিরের বারান্দায় পূর্বাস্য হয়ে একজন সন্ন্যাসীকে স্থির-নিশ্চলমূর্তিতে ধ্যানমগ্ন দেখলাম। তপোবন, ঋষির আশ্রম প্রভৃতির কথা পুঁথিতে পড়েছি, চোখে দেখিনি—কল্পনারাজ্যের সে-দৃশ্য আজ চোখের সামনে প্রকাশিত দেখে হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের বারান্দায় নিঃশব্দে বসে সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম—এখানে মিলবে কি মানুষের সেই চির আরাধ্যের সন্ধান? বহুদিনের অন্ধকারে হাতড়ে ফেরার শেষ হবে কি এখানে? সর্বদেশের, সর্বজাতির, সর্বধর্মের সমন্বয়স্থলে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মতলে ত্রিতাপদগ্ধ জীবের সকল দুঃখের কি অবসান হবে?

সদ্‌গুরু ভিন্ন কে একথার জবাব দেবে? সাধক কবি বলেছেন—

“নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী
ক্যায়সে ভরম টুটে পশুকারে,
বিন্ সদ্‌গুরু নর এহিসেহি ভোলে
য্যায়সা ঢুড়ত মৃগী বনকারে।”

সদ্‌গুরু ভিন্ন কে বলে দেবে ভগবান যথার্থ কোথায়।

ক্রমে সূর্যোদয় হলো। আমরা স্নানাদি শেষ করে ঠাকুরঘরের দালানে বসলাম। নূতন মন্দির তখনো হয়নি, নির্মাণকার্য চলছে।

যথাসময়ে ঠাকুরঘরের পাশের লম্বা ঘরের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করে আমরা ধন্য হলাম। আজকের কোনো কথা আর প্রকাশ করবার মতো নয়, স্মরণের মণিমঞ্জুষায় চিরদিন তা সযত্নে তুলে রাখবার যোগ্য। যুগে যুগে পারের

তরণি নিয়ে ধরণির কূলে কূলে কর্ণধারগণ নিয়ত ফিরছেন, যে ডেকে ভেড়াতে পারবে, সে-ই সে-তরণিতে স্থান পাবে।

আমরা কিছু ফুল-ফল সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অবসর সময়ে গুরুদেব যখন দোতলায় তাঁর নিজের ঘরে বসে ছিলেন, তখন আবার আমরা প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করতেই তিনি শুধু বললেন, "এত টাকাপয়সা ব্যয় করছেন কেন?" তারপর মধ্যাহ্নে প্রসাদ পেয়ে আমরা কৃতার্থচিত্তে সেদিনকার মতো বিদায় নিলাম।

ফাল্গুন মাস হলেও একটু একটু শীতের আমেজ রয়েছে। বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের শতবার্ষিকী জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী উৎসব। সহসা অভাবনীয়রূপে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। মঠে তখন শ্রীগুরুদেব উপস্থিত ছিলেন। শুনলাম, তিনি আমার দিদির বেলেঘাটার বাড়িতে পদধূলি দান করতে সম্মত হয়েছেন। খবর পেয়ে, কিঞ্চিৎ সেবা-অধিকার পাওয়ার আশায় আগের দিন রাতে আমরা বেলেঘাটায় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্তান, শ্রীরামকৃষ্ণ-পদস্পৃষ্ট যাঁর দেহ, শ্রীরামকৃষ্ণরূপ-দৃষ্ট যাঁর চক্ষু, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীপরিপূর্ণ যাঁর শ্রবণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহের সৌরভে সুরভিত যাঁর উত্তরীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-গদগদ যাঁর মন—তিনি আসবেন, সারারাত আমাদের চোখে ঘুম এল না। অন্তরে-বাহিরে ধ্বনি উঠতে লাগল—'তিনি আসবেন'। কীরূপে তাঁকে অভ্যর্থনা করব, কী দিয়ে করব তাঁর শ্রীপদবন্দনা? তাঁর উপযুক্ত আমাদের কী আছে?

অনেক কিছু কল্পনা করে রাখলাম, কিন্তু তিনি যখন এলেন তখন কিছুই হলো না। সে প্রশান্তমূর্তি-দর্শনে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। শুধু আপনা থেকেই তাঁর চরণে মাথা নত হলো।

ওপরে ওঠবার সমস্ত সিঁড়িটাতে আমরা আমাদের গায়ের শাল বিছিয়ে দিয়েছিলাম। সিঁড়ির কাছে এসে তিনি বললেন, "এগুলি উঠিয়ে নাও।"

তিনি সোজা ওপরে উঠে গেলেন এবং বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন; সঙ্গে তিন জন সন্ন্যাসী ছিলেন।

মুহূর্তে ঘরের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগল। বাড়ির সকলে প্রণাম করে মেঝেতে গুরুদেবের সামনে বসলেন; আমিও একধারে বসলাম। আনন্দ-জ্যোতিঃপূর্ণ সে প্রশান্ত-মুখ এখনো মানসচক্ষে ভেসে উঠছে। তিনি আমাদের

কুশল-প্রশ্ন করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে প্রত্যেকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি 'ভাল থাকো' বলে সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

বাধাবন্ধনহারা উন্মুক্ত-অনন্ত পথের মহাপথিক আজ আমাদের সম্মুখে বিরাজিত, আর আমরা সংসার-সমুদ্রে পলে পলে হাবুডুবু খেয়ে মরছি! বেদনায় বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে উঠল! এগিয়ে বসে পদসেবা করতে করতে একসময়ে বললাম, "গুরুদেব, আশীর্বাদ করুন!"

গুরুদেব বললেন, "আমি তো আশীর্বাদ করছি—সুখে থাকো, ভাল থাকো, ভগবানে ভক্তি হোক।"

বললাম, "সংসারের সুখের কথা বলছি না, কী করলে ভগবানের পথে এগোতে পারব, তা-ই বলুন।"

গুরুদেব একটু চুপ করে রইলেন। তারপর সহাস্যবদনে বললেন, "সত্যকে আঁট করে ধরতে হয়। একেবারে ঠিক ঠিক চলা—মন আর মুখ এক, যা মুখে বলা তা-ই কাজে করা।"

আমরা দু-জনে পাশাপাশি ছিলাম। প্রায় একসঙ্গে বললাম, "যাতে ভগবানকে পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারি, আপনি তা-ই করে দিন।"

অতি কোমল মিষ্টস্বরে তিনি বললেন, "নিজেকেও একটু চেষ্টা করতে হয়।"

চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু জীবনের অর্ধাধিক কাল, শরীর-মনের অর্ধাধিক ক্ষমতা যে এ পার্থিব-সংসারের পিছে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে! অবশিষ্ট যা আছে তা দিয়ে আর কতটুকু চেষ্টা করা চলবে! অনুশোচনার বেদনায় মন আর বাধা মানল না। সেই মানবদুর্লভ পা-দুটি চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে বললাম, "এ জীবনটা তো বৃথাই চলে গেল।"

অশ্রুতে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। প্রথমবারে কথাটা তিনি বুঝতে পারলেন না। প্রশ্ন করে দ্বিতীয়বারেও বুঝতে পারলেন না। তৃতীয়বারে বুঝতে পারলেন। সান্ত্বনামিশ্রিত ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বললেন, "বৃথা কিছু যায় না।"

মাত্র কটি কথা—'বৃথা কিছু যায় না।'—এর মধ্যে কতবড় নিগূঢ় অর্থ লুকানো আছে, তা আমাদের সম্যক বোঝবার সাধ্য আছে কি? ক্ষুদ্রমানব—অল্প নিয়ে কারবার, পদে পদে হারাবার ভয়। কিন্তু জীবনে যা-কিছু আমরা হারানো বলে মনে করি, তা যে প্রকৃত-হারানো নয়—এ বিশ্বের ক্ষুদ্র, বৃহৎ, জড় ও চৈতন্যময় যাবতীয় বস্তুর ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন সমস্তই যে শুধু একটা অবস্থান্তরের স্রোত

রূপে বয়ে চলেছে, কোনো কিছুই যে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না, প্রত্যেকের দ্বারাই যে জগতের কিছু-না-কিছু কার্য সাধিত হচ্ছে—এ সত্য তাঁর মতো পরম বৈজ্ঞানিক দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছিলেন বলেই না এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারলেন যে, 'বৃথা কিছু যায় না'।

প্রাণে পরম সান্ত্বনার প্রলেপ লাগল। অতীত জীবনে যা করেছি, তা তবে বৃথা যায়নি। কবির বাণী মনে এল—

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণিতে
যে নদী মরু-পথে হারাল ধারা;
জানি হে জানি তা-ও হয়নি হারা।"

আমি বললাম, "সেই সময়ে যেন ভগবৎ-আনন্দ পাই।"

তিনি বললেন, "ভগবৎ-আনন্দ এখন থেকেই পাবে। সেই সময়ে কেন?"

গুরুদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "মাকে ডাকবে। ঠাকুর বড় দুষ্টু, একেবারে ঠিক ঠিক না হলে হয় না। মা বড় ভাল।"

আমরা চুপ করে শুনতে লাগলাম। তিনি আবার বললেন, "ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন—'একে ভাববি।' তাতেই সব হয়ে গেল।" একথা বলতে বলতে ঠাকুর কীভাবে বুক দেখিয়ে বলেছিলেন, তা দেখালেন।

আমাদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "আচ্ছা, প্রকৃত সাধুর দর্শন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?"

গুরুদেব বললেন, "হিমালয়ে। সেখানে কত সাধু কত দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। কেউ ঊর্ধ্ববাহু, কেউ আরো কতরকম করে বছরের পর বছর অতিবাহিত করছেন।"

প্রশ্ন ঃ ওরূপ করলে কী হয়?

গুরুদেব বললেন, "তাদের যা অভীষ্ট তা-ই সিদ্ধ হয়।"

আমি বললাম, "ঠাকুরের সম্বন্ধে আপনার নিজের দেখা বা নিজের শোনা কিছু বলুন।"

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গুরুদেব বললেন, "একজন লোক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসছিল। তার স্ত্রী তাকে সেখানে যেতে দেবে না বলে তার কাছা ধরে টেনেছিল। সে আসামাত্র ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'কিগো, বউ বুঝি

আসতে দিতে চায়নি? কাছা ধরে টেনেছিল বুঝি?' ঠাকুর সকলকে দেখামাত্র তাঁর ভেতরের সব কথা বলে দিতে পারতেন।"

আমরা সকলে হাসলাম। আমি বইতে একটা ঘটনা পড়েছিলাম, তা-ই উল্লেখ করে বললাম, "আপনি নাকি ঠাকুরের সঙ্গে কুস্তি লড়েছিলেন?"

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "হুঁ, তুমি কী করে জানলে?"

আমি বললাম, "বইতে পড়েছি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি নাকি ইংরেজিতে রামায়ণ লিখছেন, সেটা কতদূর হয়েছে?"

মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, অরণ্যকাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে।" তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "এই লঙ্কাকাণ্ড শেষ করে যাব।"

'যাব' কথাটার ওপর এমন জোর দিলেন যে, মনটা ধক করে উঠল। বললাম, "ওকথা বলবেন না। আমাদের তবে কী হবে?" গুরুদেব আর কিছু জবাব দিলেন না। শুধু দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, "ভাল থাকো। কল্যাণ হোক। আমি প্রাণ থেকে আশীর্বাদ করছি।"

তাঁর কথাবার্তার ভাবে মনে হলো, আমাদের এখানে এসে বেশ আনন্দ পেয়েছেন। তিনি অল্পসময়ের জন্য থাকবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন, কিন্তু দেখা গেল, থাকলেন তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ।

গুরুদেবের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, চলাফেরা-নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তাই সেখানেই টেবিলের ওপর তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। শ্বেতপাথরের থালায় নানা ফল-মিষ্টান্ন প্রভৃতি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলের মধ্যে অকালের পাকা কাঁঠালও ছিল। তিনি সমস্ত কিছু তাকিয়ে দেখে সর্বাগ্রে সেই কাঁঠাল-কোয়া দুটি তুলে মুখে দিলেন।

খেতে বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাসি-তামাশা আরম্ভ করে দিলেন। রঙ্গভরে তাদের হাতে মিষ্টিগুলি প্রায় সমস্তই ভাগ করে তুলে দিলেন; নিজে সামান্য খেলেন। খাওয়ার মধ্যে বালিগঞ্জের দই এবং দিদির ঘরে প্রস্তুত চুষি পিঠে অতি তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। মনে আছে, দই দু-বার পরিবেশন করেছিলাম, চুষি-পিঠেটা খেতে খেতে বললেন, "খেতে বেশ সুন্দর হয়েছে, কিন্তু ভয় হয়, পেটে সইবে তো?"

আমরা বললাম, "ওটা ময়দা দিয়ে তৈরি, চালের গুঁড়ি দিয়ে নয়। খান, কিছু

হবে না।" খেতে খেতে একসময়ে বালকের মতো আনন্দ করে বললেন, "এই পাথরের থালাগুলো বেশ সুন্দর।"

ফল-মিষ্টি দিয়ে জলযোগের পর ভাত-তরকারি আর কিছু খেতে চাইলেন না। সেগুলি দেখিয়ে বললেন, "এগুলি এখন খাব না, সঙ্গে দিয়ে দাও।"

কারো বাড়িতে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল; গেলেও ভাত খাওয়া সম্বন্ধে নাকি তাঁর প্রায় এরকমই হতো। এখানেও দেখলাম, সঙ্গের মহারাজ বড় সাইজের একটি টিফিনকেরিয়ার এনেছেন। সেটাতে আহার্য গুছিয়ে দেওয়া হলো।

ইতিপূর্বে অন্যান্য মহারাজের জন্য আলাদা ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল, তাঁরা সেখানে খাচ্ছিলেন। জলযোগান্তে মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদের খাওয়া হয়েছে?"

মহারাজদের খাওয়া শেষ হতে একটু বিলম্ব ছিল, তা-ই জানানো হলো। তখন রহস্য করে বললেন, "সেই তখন থেকে খাচ্ছে, এখনো ওদের খাওয়া হয়নি?"

বিশ্রাম করতে করতে আরো কিছু কথাবার্তা হতে লাগল। ছেলেমেয়েরা ধরে বসল, "আমাদের কিছু বললেন না, আমাদের কিছু বলুন।"

গুরুদেব তাদেরও কিছু উপদেশ দিলেন।

মহারাজদের খাওয়া হয়ে গেলে গুরুদেব যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ঐসময়ে তিনি বললেন, "দেখো, আমি আবার যখন আসব, আমাকে এ-চেয়ারখানা আর দিয়ো না।"

একখানা উৎকৃষ্ট আরামকেদারায় তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। কোমরের দুর্বলতাবশত সোজা হয়ে ছাড়া তিনি বসতে পারতেন না, কষ্ট হতো। আমাদের একথা জানা ছিল না। আহা! আমাদের জন্য তাঁর কোমলাঙ্গে ব্যথা লাগল। তিনি আর আমাদের কারো বাড়িতে এলেন না। আমাদের মনে সে-বেদনাও চিরদিন থেকে গেল।

আমরা যদি আগে থেকে ওকথা জানতাম, তাহলে স্বচ্ছন্দে অন্যরকম ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু বুঝলাম, পরিপূর্ণ সন্তোষ ভগবানলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। তাই কি বিদায়বেলায় এই কাঁটা তিনি আমাদের বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন? সবই সেই লীলাময় ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমরা তাঁর চরণে প্রণত হলাম। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভাল থাকো।"

সেই পুণ্য আশিস-বাণীই এই দুস্তর জীবনপথের একমাত্র পাথেয় হয়ে আছে। সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পারি যে, অনেকসময় যাকে আমরা বন্ধু বলে আঁকড়ে ধরতে চাই, প্রকৃত বন্ধু হয়তো সে নয়। যাকে আমরা অন্তরঙ্গ বলে মনে করি, অন্তরের ব্যবধান তার সঙ্গে একশো হাতেরও বেশি। মহান আত্মত্যাগী ভিন্ন কারো সঙ্গে জগতে প্রকৃত আত্মীয়তা—প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করবার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। তাই তো এই নিখিল বিশ্বের একলা পথের চিরসাথি চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যখন মোটরে উঠলেন, আমরা গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন আবার হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভাল থাকো।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

স্মৃতির আলোয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সংযুক্তা মিত্র

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, প্রথম কবে মা-বাবার মুখদর্শন করেছিলেন, মনে পড়ে কি? উত্তর দেওয়া যায় না, কেননা তার স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই। চৈতন্যের প্রথম বিকাশের লগ্ন থেকে এই পরিচয় ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা তাঁদের সঙ্গে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিও আমার কাছে অনুরূপ অভিজ্ঞতা। যতদূর পিছনে তাকাই, পশ্চাতের স্মৃতিপট জুড়ে পুণ্যধাম বেলুড় মঠের স্মৃতি। আর সেই সঙ্গে যেসব পুণ্যশ্লোক সাধু ও মহাপুরুষের অক্ষয়স্মৃতি জীবনের তটরেখায় অম্লান পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে, এই সুমধুর স্মৃতি তাদের অন্যতম প্রধান, হয়তো বা প্রধানতম।

আমার শৈশব কেটেছে অরণ্যপর্বতময় উড়িষ্যার এক দেশীয় রাজ্যে। কলকাতায় যখন আমরা বরাবরের মতো চলে আসি তখন আমার বয়স সাত কি আট। তারপর থেকে মায়ের হাত ধরে মঠে যাতায়াত—কল্লোলিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে, আকাশভরা রৌদ্রচ্ছায়ার নিচে কতদিন কতভাবে বেলুড় মঠের অজস্র ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রসিদ্ধ আমগাছতলার উঠোনে পুরানো ঠাকুরঘরের সিঁড়ির ধারে মেরাপ বেঁধে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। কয়েক বছর ধরে মঠের শ্রীমন্দির গড়ে উঠতেও দেখেছি, যা এখন সমগ্র ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। যে পরম ভক্তিমতী মার্কিন মহিলাদ্বয়ের দানকে মূলত অবলম্বন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপলাভ করে, সেই হিন্দুনামে পরিচিতা ভক্তি ও অন্নপূর্ণাকেও দেখেছি। একবার মিস ম্যাকলাউডকেও দেখার সৌভাগ্য হয়েছে—হাস্যময়ী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারত-অন্তঃপ্রাণ বিদেশিনি, গরিব ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি, মার্বেলগুলি বিতরণ করছেন। সেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও দুর্লভ সেসব দর্শন শিশুমনে নিশ্চয় সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তা না হলে আজও জীবনসায়াহ্নে কেন সেসব মনে আসে, আশ্চর্য প্রত্যক্ষতা নিয়ে? যেসব পদস্পর্শ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, আজও যেন সেসব স্পর্শ চোখ বুজলে অন্তরের

অন্তস্তলে তেমনি সজীব ও স্পষ্ট অনুভব করি। কিন্তু যখন সেগুলি ঘটেছে তখন স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে হয়েছে, তার গুরুত্ব বুঝিনি। কারণ, সেই বিচারের ও দৃষ্টিভঙ্গি-অর্জনের বয়স সেটা ছিল না। এ যেন ছিল আমার নিতান্ত স্বাভাবিক অর্জিত অধিকার।

জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত জীবনেতিহাসের প্রতিটি বিশদ তথ্য যেমন বলা সম্ভব নয়, অথচ সবটা মিলিয়ে একটা অখণ্ড অনুভূতি চেতনায় জড়িয়ে থাকে, তেমনি বেলুড় মঠের সঙ্গে আবাল্যসংযোগ একটা সামগ্রিক বোধের মতো জীবনে জড়িয়ে গিয়েছে। সালতামামি হিসাবে তাকে স্বাতন্ত্র্যদান করা মুশকিল। তবু কয়েকটি স্মৃতি যেন তাদের মধ্যে আরো একটু ভাস্বর।

বাল্যের স্মৃতিপটে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল যে পুণ্যস্মৃতি জাগরূক, সেটি হলো গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্তৃক বর্তমান মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা। মঠে যখন মা-বাবার সঙ্গে পৌঁছেছিলাম, তখন শেষরাত। পুরানো মন্দিরবাড়ির আমগাছের নিচে বাঁধানো উঠোন ও পাশের সবুজ মাঠের মাঝে বর্তমান ফুলগাছের বেড়ার ব্যবধান সেসময় ছিল না। পুরানো ঠাকুরঘরের দিক থেকে আরম্ভ করে মাঠ ঘুরে নূতন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত শালু বিছানো ছিল। একপাশে অপেক্ষমাণ আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তবৃন্দ। অখণ্ড প্রশান্ত স্তব্ধতা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ। তারই মধ্যে মায়ের পাশে একইভাবে দাঁড়িয়ে আমি ও আমার ছোট ভাই; দু-জনেরই শৈশবাবস্থা। কিন্তু সে-দিন সূর্যের উদয়লগ্নে গঙ্গার পবিত্র জলধারার পাশে হিমেল হাওয়ায় হৃদয়ে পূর্ণতা ও আনন্দের স্পর্শ আমাদেরও কি কিছু কম ছিল? কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট পথ ধরে একটি মোটরগাড়ি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল—ভিতরে প্রশান্ত গম্ভীরমুখে উপবিষ্ট পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ। কোলের ওপর সযত্নে ধরা কাপড়ে-ঢাকা কৌটা, যাকে তাঁরা 'আত্মারামের কৌটা' বলতেন; কৌটার ভিতরে এযুগের নরদেবতার মর্তকায়ার অবশেষ। গাড়ির পিছনে বহু সাধু-মহারাজ নামগান-কীর্তনে মুখর। বাজছে পাখোয়াজ, করতাল, মৃদঙ্গ; হচ্ছে শঙ্খধ্বনি। গাড়ির অগ্রভাগে গঙ্গাজল ছড়িয়ে ছড়িয়ে একজন সাধু যাচ্ছিলেন। সকলের দৃষ্টি তখন ছিল গাড়ির ভিতরে উপবিষ্ট আত্মস্থ ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ও তাঁর পুণ্যহস্তধৃত দুর্লভদর্শন কৌটাটির প্রতি। গাড়ি ঘুরে মন্দিরের সিঁড়ির নিচে গিয়ে দাঁড়াতে এদিকের ভিড় কিছু ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীমন্দিরে মূর্তিপ্রতিষ্ঠার পর সকলের সঙ্গে গিয়ে প্রণাম করেছিলাম। এদিকে মাঠে বিশেষভাবে নির্মিত যজ্ঞমণ্ডপে দর্শন করেছিলাম বিধিমতো বৈদিক যজ্ঞ উদ্‌যাপন।

এরপরের যে স্মৃতি তা হলো বেলেঘাটায় আমাদের মাসিমার তৎকালীন বসতবাটিতে বিজ্ঞানানন্দজীর শুভ পদার্পণ। আমার মেসোমশাই নেপালচন্দ্র দে প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। সাধুসজ্জন-সেবায়, আত্মীয়পরিজনপোষণে এবং আশ্রিতজনবাৎসল্যে তাঁর বিশেষ প্রীতি প্রকাশ পেত। তাই ওঁদের বাড়ির সব উৎসব-অনুষ্ঠান পারিবারিক ক্ষেত্রে সর্বজনীন ঘটনা হয়ে দাঁড়াত। মা ও মাসিমা একই সময় দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রায়ই একসঙ্গে বেলুড় মঠে যাতায়াত করতেন। মাসিমা সুধাময়ী দে একবার স্বগৃহে পদার্পণের জন্য গুরুদেবকে আমন্ত্রণ করলেন। আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা, গুরুদেবও কৃপা করে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বলা বাহুল্য, এই আনন্দ-উৎসব ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকল না, অন্যান্য আত্মীয়ও এই অনুষ্ঠানে সাগ্রহে যোগ দিয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করলেন। বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে আমরা সকলে যোগ দিয়েছিলাম। এর বিশদ বিবরণ আমার মা প্রীতিময়ী কর 'উদ্বোধন'-এ লিখেছিলেন।

মনে আছে, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠকায় বিজ্ঞানানন্দজী অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিসহ শুভাগমন করেছিলেন। সন্ন্যাসিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিরজানন্দজীও। গৃহে প্রবেশের পর সেই মহাপুরুষের ধীরপদে ওপরে উঠে যাওয়া, দোতলায় বিশেষভাবে সজ্জিত কক্ষে আরামকেদারায় উপবেশন, গুরুজনদের নির্দেশে বাড়ির বালক-বালিকাদের তাঁর পদতলে বসা—স্মৃতিপটে চিত্রকলার মতো স্পষ্ট ছবির পর ছবি সাজানো রয়েছে। ঐ-দিন ঐ কক্ষেই আমার মাসতুতো ভাই (পরবর্তিকালে ইস্পাতনগরী রাউরকেল্লার অবসরপ্রাপ্ত প্রধান ভূতাত্ত্বিক) সত্যেন্দ্রকুমার দে ও আমাকে বিজ্ঞান মহারাজ কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক প্রথাসিদ্ধভাবে নয়, কিন্তু সেই কাছে দু-জনকে দাঁড় করিয়ে করুণার দৃষ্টিপাতে আলাদা আলাদাভাবে মাথায় হাত দিয়ে অভয়হস্তে আশীর্বাদ, নাম এবং কিছু নির্দেশদান—চিরজীবনের মতো আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে আছে।

এরপরেও মায়ের সঙ্গে মঠে গিয়েছি। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর খুব অল্পদিনই গুরুদেব স্থূলদেহে ছিলেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত ঘরের পাশের ঘরে একটি চেয়ারে সমাসীন তাঁর সেই প্রসন্ন গম্ভীর মূর্তিটি এখনও মনে পড়ে। ভূমিলগ্ন হয়ে প্রণাম জানিয়েছি। হাত বাড়ালে সেই পদস্পর্শ যেন এখনও অনুভব করি। কথাবার্তা যা হয়েছে, সব গুরুজনদের সঙ্গে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতভাষী, গম্ভীরপ্রকৃতির পুরুষ। আমি তখন নিতান্তই বালিকা।

আমাদের ছেলেবেলায় গুরুদেব সম্পর্কিত স্মৃতিচিত্রণ বা তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা

বিশেষ পাওয়া যেত না। পরে শুনেছি—তিনি ছিলেন আত্মস্থ, কঠোর-সংযমী, শক্তিযুক্ত মহাপুরুষ। কঠোর কৃচ্ছ্রতাবরণ করে এলাহাবাদ আশ্রমে তিনি থাকতেন।

আজ এই জীবনসায়াহ্নে এক-একসময়ে বাল্যের অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা মনে পড়লে ভিতরে এক আশ্চর্য বোধের সঞ্চার হয়। জীবনের প্রারম্ভেই এক বনস্পতির অভয়-ছায়াতলে আশ্রয় পেয়েছিলাম বলেই কি পরবর্তী তাপদগ্ধ জীবনের পথে ক্লান্ত পায়ে কিন্তু অবিচলভাবে হেঁটে আসতে পেরেছি? সমস্ত প্রতিকূলতা ও ঝঞ্ঝার মধ্যে অন্তরের অন্তস্তলে সেই অভয়হস্তই কি বারবার আমাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে—'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই'?

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা)

আমার স্মৃতিতে
পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ

সবিতা ঘোষ

আমার পিসিমা গিরিবালা ঘোষ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা ও ভগিনী নিবেদিতার বিশেষ স্নেহভাজন। তিনি আবার ছিলেন ভগিনী সুধীরারও ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অন্যতম। সেই সুবাদে আমরাও মাঝে মাঝে নিবেদিতা স্কুলে যেতাম। আমাদের বাড়ির সকলেই ঠাকুর-মায়ের অনুরাগি-ভক্ত ছিলেন।

যাহোক, পিসিমা একদিন নিবেদিতা স্কুলের দু-জন ছাত্রীকে নিয়ে বেলুড় মঠে যাচ্ছিলেন। সে-দিন ঐ দুটি মেয়ের পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা হওয়ার কথা। আমার তখন ন-বছর বয়স। পিসিমাকে বেলুড় মঠে যেতে দেখে আমিও তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি আমাকে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট। আমরা গিয়ে দেখি, তিনি মঠবাড়ির দোতলায় নিজের ঘরে বসে আছেন। যাঁদের দীক্ষা হবে তাঁরা সবাই আস্তে আস্তে তাঁর ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। দরজা ভেজানোই ছিল। আমিও ঘরে ঢুকে দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম, যাতে অন্য কেউ দেখতে না পায়। কিন্তু মহারাজের দৃষ্টি এড়াতে পারলাম না, তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?" আমি বললাম, "আমি দীক্ষা নেব।" তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তোর দীক্ষার মন্ত্র মনে থাকবে তো?" আমি তাঁর মুখের হাসি দেখে জোর দিয়ে বললাম, "ইংরেজি পদ্য, বাংলা পদ্য সব আমার মনে থাকে, দীক্ষার মন্ত্র নিশ্চয়ই মনে থাকবে।" হঠাৎ পিসিমা এসে বললেন, "এখানে দীক্ষা দেওয়া হবে, এখন চলে এসো।" তখন আমি পিসিমাকেও আমার দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। শুনে তিনি আমার হাত ধরে টানলেন। মহারাজজী তখন গম্ভীরস্বরে বললেন, "ওকে নিয়ে যাবেন না—গঙ্গায় স্নান করিয়ে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসুন আর একটা রুপোর টাকা ওর হাতে দেবেন।" পিসিমা যথারীতি তা-ই করলেন। দীক্ষার সময় মহারাজজী আমাকে তাঁর নিজের কাছে বসালেন এবং আমার কাছ থেকে ফুল চাইলেন। দীক্ষাদান সমাপনান্তে তিনি আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে বললেন, "এই তোর দক্ষিণা।" ঐ-দিনটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদিন বলে আমি মনে করি। দীক্ষা হওয়ার পরে আমার সে যে কী আনন্দ!

গুরুদেবকে প্রণাম করে বললাম, "তুমি খুব ভাল, আমার কথা শুনলে।" তিনি হেসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আদর ও আশীর্বাদ করলেন। আমিও তখন সাহস করে বললাম, "তোমাকে আমি 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলব।"

দীক্ষাগ্রহণের তিন দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে জপধ্যান করতে বসেছি, কিন্তু কী আশ্চর্য! দীক্ষার মন্ত্র কোনোমতেই মনে পড়ল না। ঠাকুর আর মায়ের ছবির সামনে বসে কত কাঁদলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মন্ত্র আর কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। পিসিমাকে ভয়ে কিছু না বলে বাবার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললাম, "আমি দীক্ষার মন্ত্র ভুলে গেছি।" বাবা আমায় খুব ভালবাসতেন। তিনি আমাকে মন্ত্র ভুলে যাওয়ার কথাটি কাউকে বলতে মানা করলেন এবং পরদিন তাঁর সঙ্গে মঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন।

পরদিন সকালে বাবার কথামতো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে তাঁর সঙ্গে বেলুড় মঠে গেলাম। বাবা শুধু এটুকুই বললেন, "তুমি নিজে দীক্ষা নিয়েছ, তুমি নিজেই সব কথা গুরুদেবকে জানাবে। আমি কিন্তু কিছুই বলব না।" মঠে পৌঁছে আমি সোজা ছুটে গিয়ে গুরুদেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "আমার খুব পাপ হবে।" তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে তোর?" আমি বললাম, "দীক্ষার মন্ত্র আমি ভুলে গেছি।" তখন তিনি জোরে হাসতে হাসতে বললেন, "তোর যে ইংরেজি পদ্য, বাংলা পদ্য সব মনে থাকে—তুই বলেছিলি? দেখলি তো অহঙ্কার ভাল নয়।" আমি তখন চুপ করে বসে তাঁর পা টিপতে লাগলাম। হঠাৎ আমার কী মনে হলো, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন মোজা পরে আছ কেন?" গুরুদেব বললেন, "আমার পায়ে একটা অসুখ আছে।" আরেকটা কী কথা বললেন, তা আমার মনে নেই। তখন তিনি একজন মহারাজকে ডেকে একটা ছোট বাক্স আনালেন এবং তার ভিতর থেকে একটা ছোট কাগজের টুকরো বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "তোকে একটা জিনিস দিচ্ছি, ঠাকুরঘরে একটা জায়গায় এটা লুকিয়ে রেখে দিবি, কাউকে বলবি না বা দেখতে দিবি না।" আমি কাগজের টুকরোটি খুলতেই দেখি, তাতে আমার দীক্ষার মন্ত্র লেখা। তাই দেখে আমার যে কী আনন্দ! প্রণাম করে ফেরার সময় গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কিছু খেয়েছিস?" আমি 'না' বলাতে তিনি একজন মহারাজকে ডেকে চাঙাড়ি ভর্তি করে প্রচুর ফল, মিষ্টি আমাকে দিলেন। নিচে নেমে এসে বাবার কাছে চুপি চুপি বললাম, "আমাকে কাগজের মধ্যে গুরুদেব সব লিখে দিয়েছেন।" বাবা বললেন, "দেখলে তো, সত্যকথা বললে সবকিছু হয়।"

তার বহুদিন পরের ঘটনা। পিসিমা একদিন এসে বললেন, "বেলুড় মঠে নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে।" আমিও সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের দিন সকালে বাবা, মা ও পিসিমাসহ আমরা সকলে বেলুড় মঠে গেলাম। উঃ কী ভিড়! লোকে লোকারণ্য! পিসিমা আমার হাত ধরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই মন্দির তোমার গুরুদেব তৈরি করেছেন।" হঠাৎ আমার মনে হলো—মন্দিরের এত সুন্দর কারুকার্য যিনি করেছেন, তিনি সত্যিই বিরাট ব্যক্তি। ঠাকুরকে প্রণাম করে পিসিমার হাত ছেড়ে ছুট দিলাম গুরুদেবের ঘরের দিকে। ওপরে উঠে দেখি, গুরুদেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু-জন মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কুশল সংবাদ নিলাম ও বললাম, "তুমি কতবড় মন্দির করেছ!" তিনি করুণমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "না রে, ভাল নেই আমি।" আমি খুব ছেলেমানুষ ছিলাম বলেই হয়তো তাঁর সে-দিনের সজলদৃষ্টির মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। তাঁকে আর দেখতে পাব না বলেই হয়তো শেষবারের মতো তাঁকে প্রণাম করতে আসা। ততক্ষণে মাইকে আমার নাম ডাকছে। আমি গুরুদেবকে বললাম, "আমি না বলে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এসেছি। তাই মাইকে আমাকে ডাকছে।" তিনি শুনে খুব অবাক হলেন। তখন আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুট দিলাম, ছুটতে ছুটতে পিছন ফিরে দেখলাম—তিনি আমার দিকে সজলদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এদিকে আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন, আর স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁর চোখে-মুখে জল দিচ্ছেন। পিসিমা আমাকে তিরস্কার করাতে বাবা তাঁকে চুপ করতে বললেন। বাবা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই তোমার গুরুদেবকে প্রণাম করবে, তবে আমাদের বলে গেলে ভাল করতে।"

শেষদিকে পিসিমা বারাণসী সেবাশ্রমে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। কলকাতায় এলে তিনি নিবেদিতা স্কুলেই থাকতেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর পিসিমা বারাণসী থেকে এসে আমাকে বিস্তারিত সব জানালেন; শুনে আমার খুব কান্না পেল। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "তিনি কত ভাল ছিলেন, আমার কথা শুনেছিলেন, আমার মাথায় হাত দিয়ে কত আদর করতেন, আর আমি তাঁকে দেখতে পাব না!" পিসিমা বললেন, "তাঁকে ডাকবে, স্মরণ করবে, তিনি তোমার সব কথা শুনবেন।" পিসিমা আমাকে দিয়ে যা-কিছু করণীয় কাজ করালেন। গুরুকৃপাতেই সংসারজগতের অনেক বাধাবিপত্তি আমি কাটাতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর পূতস্পর্শে আমার জীবন ধন্য হয়েছে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা

ফুলুরাণী সেনগুপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে আমার ও আমার স্বামীর দীক্ষা হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি, শুক্রবার, মকরসংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে—বেলুড় মঠে ঠাকুরের নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার স্মরণীয় দিনটিতে।

আমরা রাঁচির বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে রাঁচির মোরাবাদী আশ্রমে যাতায়াত করতাম। সেই সুবাদে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের বিশেষ স্নেহ করতেন, আমরাও তাঁর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। তাই ভেবেছিলাম—ওঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নেব, কিন্তু তিনি আমাদের পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে পরামর্শ দেন। একদিন আবেগের সঙ্গে আমাদের বললেন, "তোমরা বুঝছ না—তোমাদের স্নেহ করি, তাই ওঁর কাছে পাঠাচ্ছি। উনি ঠাকুরের দেহ স্পর্শ করে—পরশমণি স্পর্শ করে—সোনা হয়ে গেছেন। এখন বুঝছ না, পরে বুঝবে।" তাঁর কথা শুনে আমরা পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছেই দীক্ষা নেব স্থির করলাম। এব্যাপারে সব যোগাযোগ বিশুদ্ধানন্দজীই করে দিয়েছিলেন। দীক্ষার পর তিনি প্রায়ই আমাদের ঠাট্টা করে বলতেন, "অবধূতের চব্বিশ গুরু, আর তোমাদের দুই।"

যাহোক, সব ঠিকঠাক করে বিশুদ্ধানন্দজী আমাদের বলেছিলেন, "ঐ-দিন (১৪ জানুয়ারি) পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের ইচ্ছায় ঠাকুরের যে নূতন মন্দির হয়েছে, সেই মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং মন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হবে। তোমরা তার আগেই কলকাতা যাবে এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠার উৎসব দেখবে। সে-দিন তোমাদের দীক্ষাও হবে, কাজেই দীক্ষার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে যাবে।" সেই অনুসারে আমরা কলকাতায় আসি এবং এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো দীক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আমরা মকরসংক্রান্তির দিন খুব ভোরে বেলুড় মঠে চলে আসি। মঠে এসে মায়ের মন্দিরের কাছেই বিশুদ্ধানন্দজী, অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) এবং

নির্বাণানন্দজীকে (সূর্য মহারাজ) দেখতে পেলাম। আমাদের দেখে বিশুদ্ধানন্দজী একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে আমাদের দীক্ষার জন্য নিয়ে আসা জিনিসপত্রের ঝুড়িটি তাঁর হাতে দিতে বললেন; আমরা তা-ই করলাম। তারপর বললেন, "এখন উৎসব দেখো। প্রতিষ্ঠাকার্য হয়ে গেলে গঙ্গাস্নান করে স্বামীজী মহারাজের ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসবে।"

পুরানো মন্দিরের কাছে গিয়ে আমরা দেখি, মন্দিরের সিঁড়ি থেকে নূতন মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত শালুতে ঢাকা এবং তার ওপর ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরানো মন্দির থেকে নূতন মন্দির পর্যন্ত দু-ধারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। মেয়েরা একদিকে এবং পুরুষরা আরেক দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরাও দাঁড়ালাম। আমাদের হাতে ঘিয়ের প্রদীপ দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী এসে প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। পুরানো মন্দিরের সিঁড়ির কাছে একটি গাড়ি এবং ফুল দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো একটি পালকি রাখা আছে দেখলাম—পালকির ভিতর ঠাকুরের একখানি বড় ফটো। কয়েক জন সাধু-ব্রহ্মচারী ঐ পালকি কাঁধে নিয়ে গান করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে চলে গেলেন। আমার স্বামীও ঐ দলে যোগ দিলেন। একজন গঙ্গাজলের কলসি মাথায় করে এবং প্রিয় মহারাজ (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) একটি দুগ্ধবতী গাভিকে নিয়ে পালকির আগে আগে চললেন। ওদিকে পুরানো মন্দির থেকে 'আত্মারাম'-এর কৌটাটি দু-হাতে সযত্নে মাথায় ধারণ করে অনঙ্গ মহারাজ ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গাড়িতে উপবিষ্ট বিজ্ঞান মহারাজের হাতে সেটি দিলেন। গাড়ি নূতন মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ালে মহারাজ গাড়ি থেকে নেমে ঐ কৌটা মাথায় করে মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ ওপরের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মন্দিরে ঢুকলেন। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খুললে আমরা সকলে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম।

তারপর বিশুদ্ধানন্দজীর কথামতো নির্দিষ্ট সময়ে গঙ্গাস্নান সেরে আমরা স্বামীজীর ঘরের বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর একজন ব্রহ্মচারী এসে বললেন, "আজ দু-জন, এক জন বা স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে দীক্ষা হবে না। কারণ, অনেক দীক্ষার্থী রয়েছেন। আপনারা একসঙ্গে আট-দশ জন করে আসুন। মহিলারা আগে আসুন—তাঁদের ছেলেমেয়ে রয়েছে, তাই তাঁদের আগে হবে।" আমার স্বামী বারান্দার অপর দিকে বসেছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই মাথা নেড়ে তিনি আমায় যেতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং আরো আট-নয় জন মহিলাসহ মহারাজের ঘরে ঢুকলাম।

মহারাজ চেয়ারে বসেছিলেন। আমরা তাঁর পায়ের কাছে গোল হয়ে বসলাম। তিনি আমাদের মহামন্ত্র দিলেন। তারপর কিছু উপদেশও দিয়েছিলেন, কিন্তু কালের ব্যবধানে এখন আর সব মনে নেই। তবে একটা কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে, বলেছিলেন—"কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি কোরো না।" তারপর তিনি সকলকে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। ডান হাতে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বললেন, "মেয়েদের তো আবার বাঁ-হাত।" এই বলে আবার বাঁ-হাতে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। আমার তখন কম বয়স—মনে মনে ভাবলাম, উনি বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে বাঁ-হাতের কথা বলছেন, বাঁ-হাতে তো কাউকে জপ করতে দেখি না।

যাহোক, বাইরে এসে সাধুদের প্রণাম করলাম। একজন সাধুকে আমার এই সংশয়ের কথাও বললাম। তিনি বললেন, "বিকেল তিনটের পর উনি একলা থাকবেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস কোরো।" সেই অনুযায়ী আমি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলাম। গুরুদেব চেয়ারে বসেছিলেন। আমি সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আগে ডান হাতে যেমন জপ করতে দেখিয়েছিলেন, সেরকম করে বললাম, "এরকম করে করব তো মহারাজ?" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" আমি আর বাঁ-হাতের কথা কিছু বললাম না। তিনিও এই সম্বন্ধে আর কিছু বলেননি। আমি তাঁকে বললাম, "মহারাজ, অনেক সাধুর তো কৃপা পেয়েছি, কিন্তু কী হলো! রাগ-দ্বেষ-হিংসা—সবই তো আছে, তবে কি এসব বৃথা? আপনি আশীর্বাদ করুন।" আমার কথা শুনে একটু হেসে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, এখনো তা আমার মনে চির-অক্ষয় হয়ে আছে। সেই দৃষ্টি আমি আজও তাঁর ফটোতে দেখতে পাই। সে-দিন ভরসা দিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "কিছুই বৃথা যায় না।"

আমাদের দীক্ষার দিনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর ছোট বোন শৈবলিনীর ডাকনাম ছিল 'বাণী'। আমরা তাঁকে 'বাণীদি' বলে ডাকতাম। বাণীদির সংসারজীবন ছিল খুবই দুঃখের। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নিয়ে অল্পবয়সেই তিনি বিধবা হন। তাঁর স্বামী যখন মারা যান, তখন তিনি গর্ভবতী। এর তিন-চার মাস পর তাঁর একটি ছেলে হয়। ছেলেটি বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মারা যায়। এজন্য সকলেই তাঁকে খুব সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখত। আগে দু-বার দিন স্থির হয়েও কোনো-না-কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য দীক্ষা হয়নি। এবার আমাদের সঙ্গে তৃতীয়বার তাঁর দীক্ষার দিন ঠিক হয়। কিন্তু, দীক্ষার দিন বাণীদির মাকে একলা দেখে আমি তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাণীদি কই? ওঁর তো আজ দীক্ষা হওয়ার কথা।" শুনে তিনি বললেন, "ওর কপালটা খুব খারাপ। এবারও ওর দীক্ষা হবে না—বাধা উপস্থিত হয়েছে।" ঠিক সেসময় ভরত মহারাজ এসে তাঁকে একই প্রশ্ন করলেন। বাণীদির মা তাঁকে সব কথা বললেন। শুনে ভরত মহারাজ খুব দুঃখিত হলেন। তিনি গিয়ে গুরুদেবকে সব কথা জানালেন। শুনে তিনি বললেন, "তাতে কী হয়েছে? এ তো স্ত্রী-শরীরের ধর্ম, কিছু দোষ হবে না। মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে আসতে বলো।" ভরত মহারাজ এসে ঐকথা বললে, বাণীদি বললেন, "আমি তো দীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে আসিনি। দীক্ষার জন্য কিছুই সঙ্গে আনিনি।" ভরত মহারাজ বললেন, "গুরুকে যা দিতে ইচ্ছা হয় পরে দিয়ো। এখন দীক্ষা নিয়ে নাও।" তারপর ভরত মহারাজের দেওয়া দুটি টাকা ও একটি হরীতকী দিয়ে তাঁর সে-দিন দীক্ষা হয়ে গেল।

এপ্রসঙ্গে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। স্বামী মাধবানন্দজী তখন মঠের অধ্যক্ষ। রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে এসেছেন। আমরা রোজই তাঁকে দর্শন-প্রণাম করতে যাই। একদিন তিনি আমাকে একলা ডেকে বললেন, "এক মহিলার দীক্ষার দিন ঠিক হয়েছিল। দূর থেকে এসেছেন। এখন নিতে পারবেন না, অশুচি হয়ে গেছেন। ফিরে যেতে হবে। কী করবেন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। আমি তো এবিষয়ে কিছু জানি না। ওকে কী বলব? আপনি পুরানো ভক্ত, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।" আমি তখন বাণীদির ঘটনাটি বলে গুরুদেব যা বলেছিলেন, তা তাঁকে বললাম। শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, উনি (বিজ্ঞান মহারাজ) যখন বলেছেন, তখন আমিও তা-ই বলে দেব।" কিন্তু ঐ মহিলা দীক্ষা নিতে আসেননি, সংস্কারই বাধ সাধল।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। দীক্ষার পরের দিন সকালে আমরা গুরুদেবের ঘরে গিয়েছি। উনি একা চেয়ারে বসে আছেন। আমরা তাঁর শ্রীচরণের কাছে বসলাম। দেখলাম, খাটের নিচে একটা হাঁড়ি রাখা আছে। গুরুদেব সেবককে বললেন, "দেখো তো, এতে জয়নগরের মোয়া আছে; এদের দাও।" সেবক হাঁড়িটা বার করে সবেমাত্র খুলেছেন, এমনসময় ভরত মহারাজ সাত-আট জন ভক্তকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমরা আর মোয়া পেলাম না। আমার বয়স তখন আঠাশ-উনত্রিশ বছর। তখনো পর্যন্ত আমি জয়নগরের মোয়া খাইনি। গুরুদেবের ইচ্ছা হয়েছিল আমাদের খাওয়াতে, কিন্তু তা আর হলো না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার পর থেকে আমরা প্রায়ই জয়নগরের মোয়া পেতে থাকলাম।

গুরুদেব যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন ফলের জন্য সামান্য দশ টাকা তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি নিজহাতে স্লিপে (এ.ডি. কার্ডে) সই করে টাকাটা নিয়েছিলেন। সেই লেখাটি এখনো তাঁর আশীর্বাদস্বরূপ আমার কাছে আছে। দুঃখ হয়, গুরুদেবের কোনো সেবাই করতে পারিনি, আর তখন বিশেষ কিছু জানতামও না। কিন্তু আমার এই নব্বই বছর বয়সেও তাঁর সেই হাসিমাখা-দৃষ্টি আমার কাছে চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়েছে।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ১০৪তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শৈলেন্দ্রকুমার হালদার

পৃথিবীর ধর্মেতিহাস তথা অবতার-জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়—অবতারগণের সঙ্গে আবির্ভূত হন একদল পার্ষদ, যাঁদের কাজ হলো অবতার-জীবনে অনুভূত সত্যসমূহ স্ব-স্ব-জীবনে প্রতিফলিত করা এবং অবতারদেরই প্রবর্তিত যুগধর্ম-প্রবর্তনে ও জীবকল্যাণ-সাধনে জীবন উৎসর্গ করা। শ্রীবুদ্ধের আনন্দ, সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্লায়ন; ঈশামশির সেন্ট পিটার ও সেন্ট পল এবং শ্রীচৈতন্যের নিত্যানন্দ প্রমুখ পার্ষদ—একই সনাতন নিয়মের দৃষ্টান্ত।

অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও তাঁর মহাশক্তিধর পার্ষদগণের আগমন ও শুভমিলনে—উপরোক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মটিই যেন পূর্বাপেক্ষা আরো উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বত্যাগি-সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবন ভারতের সনাতন ধর্মাকাশে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় পৃথিবীর বিস্ময়রূপে চিরকাল দীপ্যমান থাকবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কঠোর ত্যাগ ও তপস্যাপূর্ণ অনুভূতি-সমৃদ্ধ অনন্ত ভাবময় জীবনের দিগ্‌দর্শনে তাঁরা যেন এক-একটি দিকপাল।

ভক্ত ও সাধকদের কল্যাণার্থে শাস্ত্রমুখে বারবার সাধুসঙ্গের অপার মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের অবতার শঙ্করোপম শঙ্করাচার্যও তাঁর অনবদ্য সুমধুর ভাষায় সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-কীর্তনপ্রসঙ্গে বলে গিয়েছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

আজ থেকে প্রায় ঊনত্রিশ বছর আগে মাত্র তিনটি দিনের জন্য পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূত-সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভাগমন করেছিলেন। তার প্রায় চার মাস আগে হঠাৎ দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করায়, তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে এলাহাবাদে চিঠি লিখেছিলাম; প্রায় পত্রপাঠই উত্তর দিয়ে কৃপা করে তিনি জানিয়েছিলেন, "...দীক্ষা হবে, কিন্তু এলাহাবাদ দূরদেশ—এখানে আসা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য—আগামী কালে আমি যখন পূর্ববঙ্গে যাব তখন হবে।"

আশা ও নিরাশার দোলায় প্রায় তিন-চার মাস আন্দোলিত হয়ে ভেবে ভেবে দিন কাটাচ্ছি, এমনসময়ে একদিন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজের কাছ থেকে খবর এল ঃ "বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ঢাকায় শুভাগমন করেছেন—দীক্ষার্থীরা এ-সুযোগ হারাবেন না।" সংবাদ পেয়ে সরকারি কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তার পরদিনই রাত্রি নটার ট্রেনে ঢাকা যাত্রা করলাম। আজও মনে আছে, অনিবার্য কারণবশত ট্রেনটি সে-দিন প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে এসেছিল।

পরদিন প্রত্যূষে স্নানান্তে তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হলাম। ঢাকা আশ্রমের উত্তরমুখী মঠগৃহের বারান্দায় তাঁর দর্শন পেলাম। বিশেষ চেষ্টায় সংগৃহীত একটি বৃহদাকার কাষ্ঠাসনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মুখে টেবিলের ওপর দুটি ফুলের তোড়া ও ধূপদানি। ভক্তিভরে চরণে প্রণত হয়ে বন্দনা করলাম; তিনিও পরম কৃপাভরে মস্তকে হস্তস্থাপন করে আশীর্বাদ করলেন। ...যথাসময়ে বহুপ্রত্যাশিত দীক্ষা লাভ করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলাম।

এই ক-দিন সর্বক্ষণ বেশকিছু দর্শনার্থী ও অভ্যাগতের ভিড় লেগে থাকত তাঁর ঘরে ও বাইরের বারান্দায়; তার মধ্যে সব শ্রেণির লোকই থাকতেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আইনজীবী ও বিচারক, বালিয়াটির জমিদার পরিবার ও স্থানীয় বিভিন্ন গৃহিভক্ত। তাছাড়া, কী এক দুর্বার আকর্ষণে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও ভিড় লেগে থাকত তাঁর ঘরের আশেপাশে; আর তাদের অনাবিল কলহাস্যে মুখরিত হতো আশ্রম-প্রাঙ্গণ ও তাঁর কুটির-সংলগ্ন অলিন্দ! * * * নাটকের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর পরিবর্তনের ন্যায় তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে থাকতে দেখেছি, তিনটি দিনের দুর্লভ অবকাশেই। অধিকাংশ সময়ই আনন্দোচ্ছল রহস্যালাপে মগ্ন—তারই মাঝে মাঝে কত অমূল্য কথা বলছেন! দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দর্শন ও মল্লযুদ্ধের কাহিনি-বর্ণনা, সারনাথে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দর্শনের কাহিনি, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে পেগুতে শায়িত বুদ্ধমূর্তির সন্নিধানে তাঁর জ্যোতির্দর্শনের বিবরণ, সেবাশ্রম-নির্মাণকার্য পরিদর্শন উপলক্ষ্যে কাশীধামে এক্কাগাড়ি থেকে পতনের পর জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় দেবাদিদেব বিশ্বনাথের তুষারশীতল আলিঙ্গন ও রোগমুক্তি এবং ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নানকালে ত্রিবেণী-মায়ের দর্শনের অমিয়মধুর কাহিনিগুলির বর্ণনাকালে মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁর এক গম্ভীর রূপ—যখন তিনি সবাইকে হাতজোড় করে অনুরোধ জানাতেন—"এখন একটু একলা থাকব!" * * * এই ভাব-বৈচিত্র মেঘের রং পরিবর্তনের ন্যায় কতই সুন্দররূপে প্রতিভাত হতে দেখেছি বারবার। হয়তো ছোট

ছোট ছেলেদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা-গল্পগুজব সবকিছু চলছে—ঘরটি আনন্দে পরিপূর্ণ; কত কথা বলে চলেছেন—কিন্তু তারই মাঝখানে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন, "এখন একটু একলা থাকব।" আর তখনই তাঁকে একলা থাকার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সব্বাইকে চলে যেতে হতো, কারো জন্য কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম ছিল না।

ঘণ্টাখানেক পর আবার শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই হয়ে যেতেন। একদিন শুনলাম, কয়েকটি দুষ্টু ছেলে তাঁর জানলার পাশে উঁকি দিচ্ছে দেখে বলে উঠলেন, "বাঘ দেখতে এসেছ? দূর থেকে দেখে যাও, কিন্তু খাঁচায় হাত দিয়ো না যেন।" আবার কখনো বলতেন, "এখন খানিকটা দুষ্টুমি করো; যখন হাতজোড় করব, তখন কিন্তু চলে যেতে হবে।" রঙ্গ করে হেসে হেসে বলতেন, "হাতজোড় করার মানে জান তো? হাতজোড় করা মানে—Please get out—অর্থাৎ এবার কেটে পড়ুন।"

এপ্রসঙ্গে আর একটি কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে, প্রথমদিকে তিনি দীক্ষা বেশি দিতেন না এবং স্ত্রীলোকদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না; পরে কিন্তু তাঁর এই ভাব পালটে যায়। তাঁর নিজের কথায় আছে যে, মহাপুরুষ মহারাজের অদর্শনের পর—মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা ও করুণার ভাবটি যেন তাঁর ভিতরে ঢুকে গেল এবং তখন তিনি স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে সকল দীক্ষাপ্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ করতে লাগলেন, প্রায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

কোথাও যেতে হলে, বিশেষত ট্রেন ধরার ব্যাপারে তাঁর একপ্রকার শিশুসুলভ ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তা ছিল। ট্রেন তাঁকে ফেলে চলে যাবে—এই ধারণাই যেন তাঁকে পেয়ে বসত। দু-ঘণ্টা না হোক, অন্তত এক-দেড় ঘণ্টা আগে স্টেশনে তাঁর যাওয়া চাই-ই। বেলুড় মঠ থেকে এলাহাবাদ যাওয়ার সময় প্রায় প্রত্যেকবারই এই নিয়ে অনেক মজার ব্যাপার হতো। অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজ এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন যে, ট্রেন তাঁকে না নিয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে না—এক ঘণ্টা আগে রওনা হলেই চলবে। তিনি যেন সান্ত্বনাও মানতে চাইতেন না; প্রায়ই চিন্তিতভাবে বলতেন, "তোমরা যাই বল—আজকে আর ট্রেন ধরাই হবে না।" ঢাকা থেকে কলকাতা যাত্রা করার প্রাক্কালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। অনেক সাধ্যসাধনার পর অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে তাঁকে ঢাকা স্টেশনে নিয়ে যেতে হলো। আমরাও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন দর্শনার্থী স্টেশনে উপস্থিত হলাম। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একখানা বড় চেয়ারে তাঁকে বসানো হলো। সেখানে পৌঁছেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে আবার ভক্তদের আনীত মিষ্টি ও অন্যান্য খাবারে ভর্তি পাঁচ-ছটি টিফিনকেরিয়ার খুলে, শিশুর মতো, কী কী এসেছে

একফাঁকে দেখে নিলেন। সেবকদের কাছে শুনলাম, তিনি তার এককণাও মুখে দেবেন কি না সন্দেহ। কাছে গিয়ে আমরা তাঁকে একে একে প্রণাম করলাম—কিন্তু স্টেশনে পৌঁছেও তাঁর সেই অন্যমনস্ক ভাবের কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। তবু তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "আবার পূর্ববঙ্গে আসবেন তো?" উত্তরে শুধু হাতদুটি তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলেন—যেন বুঝিয়ে দিলেন, 'তাঁর যা ইচ্ছা তা-ই হবে'।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এলে তাঁকে প্রণাম করে অনেকেই নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। আমরা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন একই ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত চললাম। পথে দোলাইগঞ্জ স্টেশনে দু-মিনিটের জন্য গাড়ি থামলে, ঢাকার নবাব-পরিবারের দু-জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক (যাঁদের মধ্যে একজন তৎকালীন ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়) ট্রেনে উঠে মাথা থেকে পাগড়ি খুলে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পাদবন্দনা করলেন। কিন্তু তাঁর সেই ভাবগম্ভীর মূর্তির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলো না! আমি বিশেষভাবে লক্ষ করলাম, তাঁর দৃষ্টি পূর্ববৎ শরতের আকাশে নিবদ্ধ হয়েই রইল—যেন একটি বিশাল অচঞ্চল সমুদ্র, বাইরের কোনো ঘটনা সেখানে তরঙ্গ তুলতে পারছে না। আগন্তুক ভদ্রলোক দু-জন পুনরায় সসম্ভ্রমে প্রণত হয়ে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করলেন। আজ থেকে ঊনত্রিশ বছর আগে তাঁর এই স্থির-গম্ভীর ভাবটি আমার মনে যে-দাগ কেটেছিল, আজও তা সমভাবে গভীর হয়ে আছে।

তাঁর আর একটি কথা মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। সেই কথাটি বলেই প্রবন্ধের উপসংহার করব। তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের দীক্ষাগ্রহণের আগে থেকেই মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল—'আমরা যে-জগৎ দেখছি, শুনেছি এটি একটি স্বপ্ন; এ-স্বপ্ন ভাঙে কী করে, আর এ-স্বপ্ন যখন ভাঙে তখন কী বাকি থাকে?' তিনি ভেবেছিলেন—দীক্ষার পর গুরুদেবের কাছে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে উত্তর জেনে নেবেন, কিন্তু কার্যত সেটি আর হয়ে ওঠেনি। গুরু যে অন্তর্যামী, দীক্ষার দিন রাতেই তিনি সেবিষয়ে নিঃসংশয় হলেন। সে-রাতে...তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মুখ থেকেই এই কথা-কটি শুনে কৃতার্থ হয়েছিলেন—"তোমাকে যে-মন্ত্রটি দিয়েছি, তা জপ করলেই তোমার জগৎ-রূপ স্বপ্নটি ভাঙবে।"

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৬৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

শ্রীশ্রীহরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ) মহারাজের স্মৃতিকথা

অমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

৯ মার্চ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার; স্থান—গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গদাধর আশ্রমে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হই। দেখি, একঘর লোক—সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি। একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে কোথায় প্রথম দর্শন করেন?"

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বলিলেন, "আমরা বেলঘরিয়ায় থাকতাম। ওখানকার একজন ভক্ত দেওয়ান গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে ঠাকুর প্রায়ই আসতেন। আমরা তখন ছেলেমানুষ—ধর্মের কী-ই বা বুঝি। কুস্তি করতাম আর কীসে শরীর সবল হয়—এই চিন্তা করতাম। একদিন শুনলাম—পরমহংসদেব দেওয়ান মহাশয়ের বাড়িতে এসেছেন। নিছক কৌতূহলবশেই ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। প্রণামান্তে বসে আছি—তিনি আমার পরিচয় নিলেন এবং একদিন দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললেন। কয়েক দিন পরই দক্ষিণেশ্বর গেলাম। সামান্যই কথা হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুস্তি লড়তে পারিস?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পারি বইকি।' ঠাকুর বললেন, 'আমার সঙ্গে কুস্তি লড় তো।' আমি তো হেসেই খুন, তাঁর সঙ্গে কী কুস্তি লড়ব! এবার ঠাকুর নিজেই আমার হাত ধরে কুস্তি শুরু করলেন। আমি এক মিনিটের মধ্যেই তাঁকে ঠেলে দেয়ালে কোণঠাসা করে ফেললাম। তখন ঠাকুর বললেন, 'আমি এখন বুড়ো হয়েছি, তাই তোর সঙ্গে পারলাম না, আগে হলে তুই পারতিস না।' ঠাকুর যখন আমার হাত ধরেছিলেন, তখন আমার 'ইলেকট্রিক শক' লাগবার মতো হয়েছিল।

"আমি ঠাকুরকে প্রশ্ন করলাম, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?' তিনি বললেন, 'ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, যেমন জল আর বরফ। তোর কীসে বিশ্বাস—সাকারে? তা বেশ, তিনি ভক্তের নিকট সাকার, জ্ঞানীর নিকট নিরাকার।' এমনসময়ে কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসে ঠাকুরকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, 'তোমার গত রোববার আসার কথা ছিল, তুমি এলে না—আমি দু-তিন বার পোস্তার কাছে গিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম—'কথারই ঠিক নেই, তা আবার ধর্ম করবে!' তা তোমার পরিবার

ঐ-দিন আসবার সময় কাছা ধরে টেনেছিল, না?' ভদ্রলোক তো শুনেই অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মশায়, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?' ঠাকুর বললেন, 'তা জানা যায় গো বাবু, জানা যায়।' ভক্তটি বলতে লাগলেন, 'আমি সে-দিন আসব মনে করে ঘর থেকে বেরোচ্ছি, এমনসময় আমার স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছ? আমি দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি শুনেই আমার কাছা ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে—ও! ঐ পাগলা বামুনের কাছে? তা হবে না। আজ রোববার, এসো গল্পটল্প করা যাক। তাই আসতে পারলাম না। তা মশায়, ঐ-ব্যাপার তো কলকাতায় হলো, আপনি ওখানকার ঘটনা কী করে জানলেন?' ঠাকুর বললেন, 'মা আমায় সব দেখিয়ে দেন গো।' এসব কথা শুনে আমি ভাবলাম—'তবে তো এঁর কাছে কিছু গোপন থাকবে না! দুষ্টুমি করলেও ইনি টের পাবেন।' ভদ্রলোকটি চলে গেলে ঠাকুর আমাকে বললেন, 'দেখ দেখি, কথার ঠিক রাখতে পারে না, কী করে ধর্ম করবে? কথার ঠিক রাখতে হয়। আমি যদি ভুলেও বলে ফেলি—ঝাউতলা যাব, আমাকে যেতেই হবে।' তিনি আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে প্রসাদ খাইয়ে বিদায় দিলেন।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মুখে ঠাকুরের পুণ্যকথা শুনিয়া আমরা সেই দিন সানন্দে গৃহে ফিরিলাম।

আরেক দিন মঠে গিয়াছি, সেই দিন বিজ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখো, আমি স্বামীজীকে বড় ভয় করতাম, তাই তাঁর সামনে না পড়ি—এভাবে চলাফেরা করতাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর সামনে পড়ে গেলাম। তিনি বললেন, 'পেসন, চল আমার ঘরে।' আমি তাঁর পেছন পেছন চললাম। তিনি বললেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় মন্দির করতে হবে। তুই একটা নক্সা আঁক দেখি।' তিনি সব বলে দিলেন, আমিও সেইভাবে নক্সা আঁকলাম। তিনি দেখে খুশি হলেন। আমি বললাম, 'আপনার নক্সা অনুযায়ী মন্দির করতে কয়েক লাখ টাকার দরকার। কী করে হবে, স্বামীজী?' তিনি বললেন, 'আমি idea (ভাব) দিয়ে গেলাম, তোরা পরে করবি। আমি ওপর থেকে দেখব।' দেখো, সেই মন্দির এতকাল পরে হলো। স্বামীজীর কথা কি মিথ্যা হতে পারে? কী করে সাত লাখ টাকা আমেরিকা থেকে এসে গেল! স্বামীজী যে বলেছিলেন, তিনি ওপর থেকে দেখবেন—সেকথাও সত্য হলো। দেখলাম, সত্য সত্যই তিনি মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন ওপর থেকে দেখছেন। দেখে আমার চোখে জল এল।"

আমরা দেখিয়াছি, যখন স্বামীজীর সমাধি-মন্দির তৈরি হইতেছিল

(১৯২২ খ্রিঃ), তখন তিনি কী শ্রদ্ধার সহিত, কত কষ্ট করিয়া মন্দির করাইলেন। তিনি মজুর-মিস্ত্রিদের বলিতেন, "দেখো বাবারা, ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করো। এ শিবের মন্দির তৈরি করছ; খুব সাবধান, খুব সাবধান।"

আরেক দিনের কথাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন, "দেখো, সে-দিন আমি কার্যগতিকে বেশ রাত করে কলকাতা থেকে ফিরছি, মঠের দক্ষিণদিকের সদর সবেমাত্র পার হয়েছি; দেখছি, একটা search-light-এর (সন্ধানী আলোর) মতো light পড়ছে। প্রথমে ভাবলাম, গঙ্গা দিয়ে বোধ হয় স্টিমার আসছে, কিন্তু যতই সামনে এগোচ্ছি, দেখি—light স্টিমারের নয়, স্বামীজীর ঘর থেকে আসছে। পরে ভাবলাম—হ্যাঁ, স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন কিনা, এ আলো তাঁর থেকেই আসছে।"

বিজ্ঞান মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা স্বামীজী, আমরা যে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিই, তিনি তা গ্রহণ করেন কি?' তিনি বললেন, 'গ্রহণ করেন বইকি। তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে একটা ray (রশ্মি) ভোগের ওপর পড়ে। তিনি তা গ্রহণ করে আবার পূর্ণ করে দেন। তুই দেখতে চাস তো আজ ঠাকুরঘরে তোকে দেখাব।' আমি অবশ্য তা আর দেখতে গেলাম না, তাঁর কথাতেই আমার প্রত্যয় হলো। স্বামীজী আমাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর ভালবাসা বলে বোঝানো যাবে না। তাঁর আদেশে কিছু কিছু কাজ করে জীবন ধন্য করেছি।"

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কঠোর তপস্বী ছিলেন। চালচলন সাদাসিধা, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে একটা ঢিলা কোট—তাহাও কম্বলের তৈরি, কোটের পকেটেই সকল প্রয়োজনীয় জিনিস। সন্ধ্যার পর তাঁহার ঘরে কেহই যাইতে পারিতেন না, একপ্রকার সারারাত তিনি ধ্যানজপেই কাটাইতেন। ভক্ত হইলেও কোনো স্ত্রীলোক তাঁহার আশ্রম-প্রাঙ্গণে যাইতে পারিতেন না—ইহাই ছিল তাঁহার এলাহাবাদ আশ্রমের রীতি। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একসময় তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তোরা দেখে আয়।" মহাপুরুষ মহারাজও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

একদিন মঠে কুঞ্জবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "বাবা, থাকাথাকি কী, এখন এই কয়েকটা দিন হরি বলে কাটাতে পারলেই হয়।"

কুঞ্জবাবু ঃ মহারাজ, আপনিও এই কথা বলছেন!

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ বাবা, না মরলে বিশ্বাস কী। মরলে পরে সাধু।

কঠোর তপস্বী হইলেও তিনি শেষ কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম অকাতরে বিতরণ করিয়া বহু ভক্তকে ভবসাগর-পারের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। একদিন জনৈক সাধু তাঁহার প্রদত্ত দীক্ষামন্ত্র শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যে-নাম ভক্তদের দেন, তা আমরা পাশের ঘর থেকে শুনতে পাই।" তিনি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি? ঠাকুরের নাম যতদূর পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়, ততদূরই পবিত্র হয়।"

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের শিবরাত্রির দিন বিকালে আমি, আমার এক বন্ধু ও বন্ধুপত্নী তাহাদের তিন বৎসরের একটি ছেলেসহ বিজ্ঞান মহারাজকে দর্শন করিতে মঠে উপস্থিত হইলাম। এই ছেলেটির বয়স অল্প হইলেও জন্মগত সংস্কার অনুসারে ঠাকুর-দেবতার উপর তাহার ভক্তি পরিলক্ষিত হইত। আমরা মহারাজকে প্রণাম করিলে, ছেলেটি যেই তাঁহাকে নমস্কার করিতে মাথা নত করিল, মহারাজ অমনি নিজের মুখ ঢাকিলেন। কেন তিনি এইরূপ করিলেন, তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু দেখা গেল, এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই সামান্য রোগভোগের পর ছেলেটির মৃত্যু হইল। মহারাজ কি তাহার আসন্ন মৃত্যু দেখিতে পাইয়াছিলেন? কে বলিবে!

বিজ্ঞান মহারাজ দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতেই অসুখে ভুগিতেছিলেন, তাঁহার পা-দুইটি একটু ফুলিয়াছিল। ঐ অবস্থাতেই তিনি মঠে আসিয়াছিলেন। মঠের প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা এখানে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা আপনার চিকিৎসা করাতে চাই, আপনি অনুমতি দিলে সব ব্যবস্থা করব।"

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ আমাকে তো একজন বিজ্ঞ ডাক্তার দেখছেন।

সাধুগণ ঃ এলাহাবাদে বুঝি আপনি ডাক্তার দেখিয়েছেন?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ শ্রীশ্রীঠাকুরই আমাকে দেখছেন, তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ ডাক্তার আর তোমরা কোথায় পাবে? সাধুর আবার ওষুধ কী? গঙ্গাজলই মহৌষধ।

(উৎস ঃ শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণের স্মৃতিকথা)

বরিশালে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বরিশালে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি বরিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করতে এসে ঐ ক-দিন স্থানীয় ভক্ত ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে যেসকল ধর্মপ্রসঙ্গ করেছিলেন তা-ই সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হলো।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ সম্বন্ধে যেসকল কথা এখানে লেখা হলো, তা লেখার পর (প্রাত্যহিক) উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেককে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং সকলের স্মৃতিশক্তির সাহায্যে মূল লেখা সংশোধিত ও পরিবর্তিত করা হয়েছে; সুতরাং তিনি যেরকম তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় ব্যক্ত করেছিলেন, তা যথাসম্ভব অবিকৃত আকারে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।]

জীবনে যেসকল সাধু-মহাপুরুষের দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয়েছে, পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ তাঁদের অন্যতম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসি-শিষ্য বলে তাঁকে দেখার যেমন আমার একটা আগ্রহ ছিল, তেমনই আবার সুযোগ উপস্থিত হওয়ার পর অপরিচিত বলে তাঁর কাছে যেতে একটা সঙ্কোচও ছিল। ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে যেসকল কথা শুনেছিলাম, তাতেই সঙ্কোচ অনুভব করার যথেষ্ট কারণ ছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁর আনন্দপূর্ণ জীবনের এমন একটি মধুর রূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে, তার স্পর্শে তাঁর বরিশালে অবস্থানের শুধু নটি দিনের জন্য নয়, আমার এবং অন্যান্য অনেকের জীবনেই স্থায়ী পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়েছে। তাঁকে দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ঠাকুর নিজেই তাঁর সন্তানদের ভিতর শক্তি জোগাচ্ছেন এবং কখনো বা কৃপা করে আমাদের সংশয় দূর করছেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ নভেম্বর, সোমবার, বিজ্ঞানানন্দজী বরিশালে পদার্পণ করবেন শুনে আমরা অনেকে সকাল সাড়ে সাতটার সময় স্টিমারঘাটে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে-দিন অত্যধিক কুয়াশা হওয়ায় স্টিমার আসতে বিলম্ব হয় এবং আমাদের অনেককেই বাসায় ফিরে যেতে হয়। আমরা কলেজে কাজের ফাঁকে তাঁর আগমন-বার্তা পেয়েছিলাম এবং কখন তাঁকে দেখতে যাব, মাঝে মাঝে তা-ই ভাবছিলাম।

বিকাল সাড়ে চারটার সময় আমরা তাঁকে দেখতে আসি। তিনি সেসময় শঙ্কর মঠের সামনে শ্রীযুক্ত সারদা ঘোষ মহাশয়ের দালানের একতলার উত্তরদিকের কোঠায় দক্ষিণাস্য হয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর ডানদিকে একটা টেবিলের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি বড় ফটো ছিল। আমরা উত্তরাস্য হয়ে বিজ্ঞানানন্দজীর সামনে খুব কাছেই বসেছিলাম। ঘরে আরো অনেকে ছিলেন এবং আমরা বসবার পর অল্পসময়ের মধ্যে আরো কয়েক জন ভদ্রলোক এসে বসলেন। ঘরটি ভরে উঠল। সকলেই প্রণাম করে বসে তাঁর দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি অল্পসময় মৌন ছিলেন, পরে কিছু বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে তাঁর নিজের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তিনি প্রথমে সারনাথে বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিব্য জ্যোতিঃসমুদ্র দর্শনের কথা সংক্ষেপে বললেন; কিছুসময়ের জন্য তাঁর দেহবোধ ছিল না এবং পরে সারারাত ধরে তাঁর যে আনন্দের নেশা ছিল, তা-ও বললেন। বলতে বলতে তাঁর মুখে-চোখে আনন্দের ভাব ফুটে উঠল। আমরা সকলেই নিঃশব্দে ঐ-দর্শনের বিষয় কল্পনা করছিলাম। একটু পরে তিনি ঠাকুরের পট দেখিয়ে বললেন, “ইনি সব শুনতে পাচ্ছেন।” বলা বাহুল্য যে, আমাদের সন্দিগ্ধ মন ঠাকুরের ছবিতে তাঁর প্রকাশ ভাল দেখতে পায় না, কিন্তু বিজ্ঞানানন্দজীর ঐকথার পর ঠাকুরের পটের দিকে তাকালাম এবং কিছুসময়ের জন্য আমার মনের সন্দেহ চলে গেল। বিজ্ঞানানন্দজী একটু পরেই ঠাকুরের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বললেন, “একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলাম, এমনসময় তাঁকে দেখতে কোন্নগর থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। কিছুসময় কথাবার্তার পর যখন ভদ্রলোক চলে গেলেন, তখন ঠাকুর আমাকে বললেন, ‘আমি সকলের অন্তর ঠিক কাচের আলমারির মধ্যে জিনিসপত্র রাখলে যেমন দেখা যায়, তেমনই দেখতে পাই।’ ঠাকুরের মুখে ঐকথা শুনে আমি ভাবলাম—‘তাহলে তো আমার ভিতরও কী-সব আছে, উনি দেখতে পাচ্ছেন! ইনি তো দেখছি, একজন dangerous man!’ ঠাকুর লোকের ভালটাই বলতেন, খারাপটা বলতেন না।

“প্রথম যে-দিন পরমহংসদেবের মুখে শুনেছিলাম, ‘যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এই শরীরে (নিজ শরীর দেখিয়ে) রামকৃষ্ণ’, তখন আমার তত বিশ্বাস হয়নি। আমি মনে করেছিলাম—তা একটু আবোলতাবোল বললেই বা, লোকটি তো ভাল—সরল। পরে ঠাকুর একদিন তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, ‘যে বৃন্দাবনে রাসলীলা করেছিল, সে-ই এই শরীরটাতে আছে।’ তাঁর তখনকার

মুখ-চোখের ভাব দেখে আমার ওকথায় বিশ্বাস হয়েছিল। পরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ঊর্ধ্বরেতা হওয়া জিনিসটা কী।"

আমাদের লক্ষ্য করে একটু পরেই বললেন, "আপনারা হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমি hypnotised (সম্মোহিত) হয়েছিলাম!" তিনি মধুরভাবে চোখে চোখে হেসে যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বেয়াড়া স্বভাবকে বিদ্রুপ করলেন।

একটু গম্ভীর হয়ে আবার বললেন, "আমি যখন পরমহংসদেবকে দেখেছিলাম, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম—বয়স সতেরো বছর ছিল। অল্পদিনই তাঁর সঙ্গ করেছি, অল্পই বুঝতে পেরেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মহারাজ, ঠাকুর দেখতে কীরূপ ছিলেন?" উত্তরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বললেন, "তিনি এই মূর্তিই ধ্যান করতে বলতেন।"

২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার

সকাল সাড়ে আটটার সময় স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে শুনলাম, পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ পুরানো ঠাকুরঘরে স্থানীয় ভক্তদের দীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁকে এক বার প্রণাম করে আসব মনে করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা সাড়ে নটার সময় তিনি ঠাকুরঘর থেকে বার হলেন। স্বামী প্রণবেশানন্দ বিজ্ঞান মহারাজকে নতুন ঠাকুরঘর দেখালেন, পরে মিশনের পুকুর এবং সেখান থেকে ওপারের জায়গাগুলো দেখালেন। ফাঁকা জায়গা দেখে বিজ্ঞান মহারাজ বালকের মতো আনন্দ করে বললেন, "All right, all right, all right, very good, পাঁউরুটি বিস্কুট।" তারপর ধীরে ধীরে যে বাড়িতে উঠেছিলেন (শ্রীযুক্ত সারদা ঘোষের বাড়ি) সেখানে এলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি আমার খুব ভাল লেগেছিল—মনে হচ্ছিল, যেন কোনো রাজপুত্র আপনমনে চলেছেন।

মিশন থেকে সারদাবাবুর বাড়ি প্রায় এক ফার্লং হবে। এর মধ্যে তিনি কোনো কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর পিছনে চলতে চলতে এবং তাঁর হাঁটা দেখে ক্ষণিকের জন্য মনে হলো, তাঁর যেন রাজাধিরাজের সঙ্গে নিকটসম্বন্ধ আছে। এরূপ ধারণা পাকা হলে পথ চলতেও আনন্দ হয়।

এ-বাড়িতে এসে তিনি নিজের ঘরে চেয়ারের ওপর উত্তরাস্য হয়ে বসলেন। আমি প্রণাম করে একাই তাঁর সামনে শতরঞ্চির ওপর বসলাম। প্রায় তিন-চার মিনিট বসার পর আমাকে বললেন, "এখন একটু নির্জনে বসব।"

আমি অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মতো তাড়াতাড়ি প্রণাম করে উঠে যখন দরজার কাছে গেলাম, তখন তিনি আমাকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন এবং দু-বার 'আনন্দম্' বললেন। এই কথাগুলো বলবার সময় তাঁর মুখে-চোখে এমন একটা মধুরভাব ফুটে উঠেছিল যে, তাতে আমার প্রাণও আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু কেন যে তিনি হঠাৎ ঐরকম করলেন, তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলাম না।

আমি যখন ঘরের বাইরে এলাম, তখন একজন ভক্ত ঘরে ঢুকে মহারাজকে প্রণাম করলেন। তিনি খুব সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন।

নায়ক মহারাজের কাছে শুনলাম যে, আজ খুব সকালে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এসেছিলেন এবং তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও (৭০ বছর) যে খুব সকালে ওঠেন ও বেড়াতে যান, সেকথা একটু গর্ব করে বলেছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ নাকি হেসে বলেছিলেন, "আমি কিন্তু মশাই সকালে উঠতে পারি না।" মনোমোহনবাবু কাশীধামে বহুদিন আগে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ ঐকথা শুনে তাঁকে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখার কথা ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দর্শন করেছেন কি না এবং কেমন দেখেছিলেন—তা-ও জিজ্ঞাসা করেন। মনোমোহনবাবু ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একটি কালো পাথরের ঢিপির মতো দেখেছিলেন শুনে মহারাজ বলেছিলেন, "আমি কিন্তু তাঁকে সুপুরুষ জ্যোতির্ময় দেখেছিলাম।" ঐ-দর্শন বোধ হয় বিজ্ঞান মহারাজের আধ্যাত্মিক দর্শন, কারণ আমরাও শুনেছি যে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নাকি সাধারণের চোখে সুপুরষ ছিলেন না।

বিকাল চারটের পর আমরা কয়েক জন কলেজ থেকে ফেরার পথে বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম। প্রণাম করে কিছুসময় বসার পর, মহারাজ সারনাথে তাঁর দিব্যজ্যোতি দর্শনের বিষয় আবার বর্ণনা করলেন। দ্বিতীয়বার শুনে যেন একটু বিশ্বাস হলো যে, ভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ বাস্তবিক মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়।

একটু পরেই তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বসে আছি, হঠাৎ ঠাকুর বললেন, 'আয় দেখি—তোর গায়ে কেমন জোর আছে।' প্রথমটা একটু সঙ্কোচ হলো। তা উনিই আগে আমায় ধরলেন, তখন আমিও ধরলাম। দু-জনে কে কাকে ঠেলে হটাতে পারে সেই চেষ্টা চলছিল। তখন গায়ে আমার বেশ শক্তি ছিল, আমি ঠেলে ঠেলে ঠাকুরকে কোণঠাসা করলাম। ঠাকুর তখন বললেন, 'আগে গায়ে শক্তি ছিল, পেটের অসুখে

ভুগে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েছি।' আমি তখন ভেবেছিলাম, জিতেছি; এখন কিন্তু দেখছি—হেরে গেছি, তাঁর মতই আমাকে গ্রহণ করতে হলো।"

বিজ্ঞান মহারাজের মুখে এসব শুনে আমারও যেন সঙ্কোচ কেটে গেল। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে ঠাকুরের শরীর সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। উত্তরে জানলাম যে, বিজ্ঞান মহারাজ যখন দেখেছিলেন তখন তাঁর দোহারা চেহারা ছিল; খুব ফরসা রং ছিল না এবং তিনি নাকি তাঁর বসা-ফটোর মূর্তিই বিশেষ করে চিন্তা করতে বলতেন।

এরপর বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "এবার তিনি (ঠাকুর) গোপনে এসেছিলেন; আবার নাকি দুশো বছর পরে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শারীরিক শক্তি নিয়ে রাজা হয়ে আসবেন।"

প্রশ্নের উত্তরে জানলাম, ঠাকুর পাঞ্জাব প্রদেশে আসবেন—নিজমুখে একথা বলেননি।

বিজ্ঞান মহারাজ পাশের শঙ্কর মঠ থেকে এসে কিছুক্ষণ খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন, "এরা প্রণাম করে যেন বোঝাতে চায় যে, আমি কত বড়! কই আমি তো বড় বলে বুঝতে পারছি না।"

একটু পরে নিজেই বললেন, "স্বামীজীর খুব কঠোরতা ছিল। একটু এদিক-ওদিক হলেই বকুনি দিতেন।" জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, "আমি বকুনি খাইনি। বেলুড়ে একবার তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে সারারাত ধ্যান করতে আদেশ দিলেন। একদিন মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) মাধুকরী করে খেতে বললেন। সে-দিন মহারাজের জন্য রান্না হলো না। তিনি মাধুকরীতে বেরুলেন। মহারাজ মাধুকরী করে ফিরে এলে স্বামীজী বললেন, 'মাধুকরীর অন্ন খুব পবিত্র, দেখি কী আনলি?' এই বলে মহারাজের কাছ থেকে চেয়ে খানিকটা খেলেন।"

বিজ্ঞান মহারাজ একটু নির্জনে বসার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমরা সকলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

২৭ নভেম্বর, বুধবার, সকালবেলা

সকালে প্রণাম করে বসার পর হনুমানের কথা উঠল। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "একবার আমাদের ওখানে (বোধ হয় বেলঘরিয়ার কথা বলেছিলেন, কেউ এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি) হনুমান খুব অত্যাচার করতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ওদের মারবার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো। একদিন

আমি শৌচে বসেছিলাম, হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ হলো। আমার কাছেই একটা হনুমান পড়ে গেল। আমি দেখলাম যে, হনুমানটা হাত দুটো একত্র করে বুকে ঠেকাল আর তিন বার বলল—রাম, রাম, রাম; তারপরেই মরে গেল।"

বিকালে কলেজ থেকে এসে প্রণাম করে বসতেই তিনি বেড়াতে বেরোলেন। বিজ্ঞান মহারাজ এই প্রথম জগদীশ আশ্রম দেখতে গেলেন। আমি পদব্রজে যখন জগদীশ আশ্রমের কাছে গেলাম, তখন তিনি আশ্রম দেখে গাড়িতে উঠছিলেন। আমি নায়ক মহারাজকে লক্ষ্য করে বললাম, "মহারাজ, ফিরতে তো ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হবে।" বিজ্ঞান মহারাজ ও নায়ক মহারাজ একসঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরব।" আমি সন্ধ্যার পর বিজ্ঞান মহারাজের উপদেশাদি শোনবার আশায় আবার সারদাবাবুর বাসায় যাব ঠিক করলাম।

রাত প্রায় সাতটা

বিজ্ঞান মহারাজ চেয়ারে বসে ছিলেন এবং তাঁর সামনে ভক্তরা। কলেজের অধ্যাপক শ্রী—ও উপস্থিত ছিলেন। ইনি জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গ অনেক দিন করেছেন। শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের থেকে তাঁর বেশি পড়াশোনা আছে।

কথাপ্রসঙ্গে, পৃথিবীর মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় হজরত মহম্মদের বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয় জানতে চাইলেন। অনেকেই প্রথমটা একটু হতাশ হলেন, কেননা হজরত মহম্মদের চেয়ে আমাদের দেশের মহাপুরুষদের সম্বন্ধে—বিশেষত ঠাকুর ও স্বামীজীর বিষয় শোনার ইচ্ছা ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হজরত মহম্মদের জীবনের কতকগুলি ঘটনা—গুহায় তাঁর চল্লিশ দিন তপস্যার কথা, সেখানে তখনকার সামাজিক প্রথাগুলোকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপনের কথা এবং তাঁর সংগঠনশক্তির কথা বলতে আরম্ভ করলেন। হজরত মহম্মদ বাল্যকালে বিশেষ কিছু লেখাপড়া শেখেননি, সেকথা উল্লেখ করে তাঁর ঐশীশক্তির খুব প্রশংসা করলেন। এছাড়া হজরত মহম্মদ যে জীবনে অতিশয় কঠোর তপস্যা না করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, তা-ও উল্লেখ করলেন।

ইতিপূর্বে পরমহংসদেবের সাধনার বিষয় পড়েই হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে কতকটা শ্রদ্ধা জন্মেছিল। বিজ্ঞান মহারাজের মুখে তাঁর জীবনী শুনে আমার হজরত মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। আমার বুদ্ধি স্বামীজীর 'Mohammed stumbled on spirituality'-র কথা না বুঝতে পেরে একটু দ্বিধা-ভাব

পোষণ করত; আজ তা বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা একটা intellectual assent-ও পেল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষের কথা বলতে গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠল। সে-সমাজের অনেকের সম্বন্ধে খুব সশ্রদ্ধভাব নিয়ে তিনি কথা বললেন। পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর একদিনকার বক্তৃতার কথা বললেন। শাস্ত্রী মহাশয় নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজের প্রতি পদাঘাত (পা দিয়ে মাটিতে আঘাত) করে তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় পাশ্চাত্য সভ্যতার কথা তুললেন। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "ভগবানকে জানা ও বোঝা খুব অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। অন্তর শুদ্ধ না হলে হয় না। খুব সাবধানে থাকতে হয়; একটা খারাপ ভাব এলে সমস্ত blood (রক্ত) দূষিত হয়ে যায়। time, space ও causation রূপে যিনি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছেন, তাঁর পূজা (অর্থাৎ তাঁর নিয়ম মেনে চলা) পাশ্চাত্যের লোকেরাই করছে—এই জন্যই মহামায়া তাদের প্রতি সুপ্রসন্না।"

প্রশ্ন করা হলো, "ভগবান কি law (আইন)?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, তিনি law, law নিজেও মেনে চলেন (যেমন অবতার-শরীরে), আবার তিনি law তৈরিও করেন।"

তিনি আমাদের সকলকে time, space ও causation-এর সম্মান রেখে নিয়ম মেনে চলতে বললেন এবং আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

২৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

শ্রী— খুব সকালে এসেছিলেন। তিনি খুব বেশি কথা বলেন বলে অনেকে তাঁকে পাগলাটে মনে করেন। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে খুব আনন্দ করেছেন। একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ভগবান পাগল ও বালকের মধ্য দিয়েই কথা বলেন।"

একজন প্রশ্ন করলেন, "ঠাকুরের দেহরক্ষার পর কেউ তাঁর দর্শনলাভ করেছেন কি?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, কেউ কেউ দেখেছেন।"

বিজ্ঞান মহারাজ একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্রের কারণ কী?" যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি চুপ করে ভাবছেন, এমনসময় অধ্যাপক শ্রী— সৃষ্টি-বৈচিত্রকে ক্রিকেট খেলার উপমা দিয়ে বললেন, "যদি সকলেরই জানা থাকত, এই খেলায় যে একশো রান করতে পারবে সে জিতবে,

তবে খেলাতে আর কোনো আনন্দ থাকত না।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "কী করে বলব? আমি তো আর ভগবান নই। আমি তাঁর চাকর, এক ধাপ নিচে আছি, আমি কী করে বলব।"

স্থানীয় ডাক্তার শ্রী— ধর্মপিপাসুর পক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করবার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিজ্ঞান মহারাজের মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।" ডাক্তারবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "দীক্ষা নিয়ে যদি ঠিকভাবে কাজ না করে?" উত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "একজন জিনিসটি নিল, কিন্তু ব্যবহার করে না, ইচ্ছা হলেই করতে পারে। অপর জন ইচ্ছা হলেও জিনিস নেই বলে ব্যবহার করতে পারবে না।"

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মূর্তিপূজাকে Idol-worship বলা চলে কি?" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "Idol-worship করবেন না, তা খারাপ, খুব খারাপ।" পরে বললেন, "মূর্তি ভেবে পূজা করলে কোনো লাভ নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পূজা করছি, মূর্তির ভেতরে তিনি আছেন—এই ভেবে পূজা করতে হয়; মূর্তি ঈশ্বর নন, তবে তিনি মূর্তিতে আছেন।"

বিকাল পাঁচটা

কলেজের আট জন অধ্যাপক এবং অন্যান্য ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞান মহারাজ আজ স্বামীজীর সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন। স্বামীজীর ভক্তি, বিশ্বাস, দর্শনাদি ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে উল্লেখ করলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, "আমি স্বামীজীর কাছে বেশি যেতাম না। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে স্বামীজী আমাকে ডেকেছিলেন। আমি বললাম, 'ধ্যান করতে যাব।' তখন তিনি বললেন, 'কেমন ধ্যান করবি রে, জল কম পড়বে না তো?'"

আমরা শেষোক্ত কথাগুলো বুঝতে না পেরে বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তখন স্বামীজীর 'ধ্যান করার' গল্পটি বললেন ঃ "একজন লোক নতুন দীক্ষা নিয়েছে। তার গুরু তাকে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করতে বলেছেন। সে ঠাকুরঘরে প্রণাম করে একটু বসে বেরিয়ে আসতেই গুরু বললেন, 'সে কিরে! এত শীঘ্র হয়ে গেল! অন্তত এক ঘণ্টা থাকতে হয়।' তখন সে আবার ঠাকুরঘরে ফিরে গেল, কিন্তু কিছুতেই সেখানে বসে থাকতে পারল না। ঘরেই বসে-দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল। বাইরে আসবার উপায় ছিল না, কারণ গুরু বাইরের দিক থেকে দরজা বন্ধ করে কোথায় বেড়াতে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে বলে গেছেন, এক ঘণ্টা পরে দোর খুলে দেব। সময় আর কাটে না। লোকটি মাটিতে

খানিকটা শুয়ে কাটাল। তারপর হঠাৎ তার পায়খানা পেয়ে গেল, তখন অগত্যা ঐ-ঘরেই কাজটি সারতে হলো। কোশায় জল কম ছিল, সুতরাং জলের অভাব অনুভব করল। এক ঘণ্টা পরে গুরু এসে দোর খুলে দিতেই সে বেরিয়ে এল। তখন গুরু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, কেমন ধ্যান করলি?' লোকটি তার নিজের কথাই ভাবছিল, বললে, 'জল কম হয়েছিল!'"

আমরা গল্পটি শুনে কাকে দোষী বলব ভাবছি, এমনসময় বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "আমরা অনেকেই এরকম ধ্যান করি।"

এই কথাগুলো আমার মনে খুব লাগল। গল্পটির কথা ভুলে, মহারাজের শেষোক্ত কথাগুলোই ভাবতে লাগলাম।

একটু পরে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "একদিন বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় স্বামীজী আমায় ডেকে নিলেন। তারপর গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে একটা মন্দির হবে, সেকথা খুব জোর দিয়ে বললেন। আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কী বলিস?' আমি বললাম, 'আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয় হবে।' মন্দিরের কথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখ-চোখ অন্যরকম হয়ে গেল; মনে হচ্ছিল, যেন তিনি মন্দিরটি দেখতে পাচ্ছেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে মন্দিরটির কোথায় কীরকম হবে তা-ই বোঝাতে লাগলেন। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করে আমাকে একটা প্ল্যান তৈরি করতে বললেন। স্বামীজী আবার বললেন, 'এ দেহটা (নিজের শরীর দেখিয়ে) ততদিন থাকবে না, তবে আমি ওপর থেকে দেখব।' মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময় আমি বলেছিলাম, 'স্বামীজী, আপনি ওপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন—এবার দেখুন, আমরা কাজ আরম্ভ করছি।' তা উনি দেখেছেন।"

শেষ কথা-কটি শুনে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, আপনি কি তখন স্বামীজীকে দেখলেন?"

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "না, তা নয়। উনি যখন বলেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই দেখেছেন।"[১]

একটু পরে আবার বললেন, "স্বামীজী একবার পঞ্চাশ বছর পরে আবার আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, হয়তো আসবেন!"

---

১ এটা মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের সময়ের ঘটনা। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় কিন্তু তিনি স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন।

এরপর বিজ্ঞান মহারাজ অশ্বিনীকুমার দত্তের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে অশ্বিনীবাবুর একটি চিত্র তাঁকে উপহার দেওয়া হয়। তিনি চিত্রটি মস্তকে স্পর্শ করেন। স্থানীয় গায়ক শ্রী—র গান শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, "স্বামীজীর গলা আরও অনেক মধুর ও দরাজ ছিল।"

২৯ নভেম্বর, শুক্রবার, সকাল আটটা

ভক্তগণ অনেকে বসে আছেন—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নানারূপ দর্শনাদির প্রসঙ্গ চলেছে। অনেকে আধ্যাত্মিকজীবনে দর্শনাদি খুব উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক নয় বলে মত প্রকাশ করায় বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন, "দর্শন figment-ও (কাল্পনিকও) হতে পারে।"

শ্রী— কিছুদিন যাবৎ 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত' ও 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা'র মধ্যে কোন্‌টিতে নির্ভুল গণনা আছে, তা নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি নিজে 'বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত'র পক্ষপাতী। স্থানীয় মিশনে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্য কেন্দ্রাদিতে কেন এর প্রাধান্য স্বীকার করা হয় না, তা তিনি বুঝতে পারেন না। বিজ্ঞান মহারাজ 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছেন, তাই তাঁর মতামত জানার আগ্রহে —বাবু তাঁকে ঐবিষয়ে প্রশ্ন করলেন। বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "অনেক দিন আগে বইটা লিখেছিলাম, আমার এখন ঐবিষয় মনে নেই। আমি নিজে 'গুপ্তপ্রেস' মেনে চলি। পঞ্জিকা সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোক কোন্‌টা মেনে চলেন, তা-ও দেখে চলা ভাল।" বলা বাহুল্য, প্রশ্নকর্তা এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

আবার একটু পরেই বিশ্বাস ও অনুরাগের কথা উঠল। একজন ভক্ত হতাশভাবে বললেন, "অনুরাগ কই?" বিজ্ঞান মহারাজ একটু রহস্য করে বললেন, "তা একটু না থাকলে কি আর এখানে এসময় আসতেন। তিনি যে খুব 'আপনার'; তাঁকে ডাকবেন, জোর করবেন, আমাদের যে হক রয়েছে।" সকলেই তাঁর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিলেন।

গতরাতে একটি প্রশ্ন আমার খুব মনে হয়েছিল, কিন্তু সেটি বিজ্ঞান মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতে কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। আজ সকালেই যে আমার প্রশ্ন করার এমন সুন্দর সুযোগ আসবে, তা তখন ভাবিনি। আমি সে-সুযোগ নষ্ট না করে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঠাকুরকে আপন ভেবে যে অহঙ্কার হয়, তা কি ভাল?" প্রশ্ন শেষ না হতেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আপন ভাবতে গিয়ে মনে করা বুঝি, ঠাকুরই হয়ে গেছি!" তাঁর হাসি দেখে সকলেই

হাসতে লাগলেন। আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি মনে করে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা, ও তো সাত্ত্বিক অহঙ্কার, ও ভাল।" আবার হাসতে হাসতে বললেন, "তিনি তো সর্বত্রই রয়েছেন, তবে হৃদয়ে তিনি বিশেষভাবে প্রকাশিত রয়েছেন, মস্তকেও তিনি বুদ্ধিরূপে রয়েছেন, (ভ্রু-মধ্যে হাত দিয়ে দেখিয়ে) এর ওপরে সকলের ভগবান এক—এর নিচে প্রত্যেকের ঠাকুর আলাদা আলাদা।" কথাগুলি শেষ করেই আমার দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "অন্তর পবিত্র হলে, বাসনা-কামনা গেলেই তিনি প্রকাশিত হবেন।" জানি না, উপস্থিত অন্য সকলে এই শেষোক্ত কথাগুলো কীভাবে গ্রহণ করলেন; আমি কিন্তু সেটাকে ব্যক্তিগতই মনে করলাম, কেননা তাতে আমার একটা সন্দেহ চলে গেল। তাছাড়া মহারাজের চোখের চাহনিতে আমি হৃদয়ে খুব আনন্দ অনুভব করলাম এবং সেজন্য তাঁর সব কথা যেন ঠিক ঠিক অনুভব করলাম।

এরপর হঠাৎ একজন ভক্ত বললেন, "আপনি বলেছেন, বিশ্বাস ছাড়া হবে না, কিন্তু কই! বিশ্বাস কই! বিশ্বাস তো নেই।" একথা শুনেই বিজ্ঞান মহারাজ গম্ভীর হয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, "ওকথা বলবেন না, নেই নেই বললে কিছুই হয় না; আছে বিশ্বাস করামাত্র দেখবেন সবই রয়েছে।" মহারাজের গম্ভীর ভাব দেখে ও ঐকথাগুলো শুনে সকলে যেন কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন।

—বাবু বিজ্ঞান মহারাজের একটা ফটো তোলবার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাতে সম্মত হলেন না; বললেন, "আপনাদের জন্য আমি এক কপি পাঠিয়ে দেব।" —বাবু বললেন, "এক কপিতে কী হবে?" তার উচ্চারণে 'কোপি' শোনা গিয়েছিল। বিজ্ঞান মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন, "কেন, একটা 'কোপি' থেকে তো একক্ষেত 'কোপি' হয়।"

আজ সকালটা সকলেরই খুব আনন্দে কেটেছে।

বিকাল পাঁচটা

আমরা কলেজ থেকে ফিরে মহারাজের ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলাম। পাশের ঘরে অনেক মহিলা তাঁকে প্রণাম করতে এসেছিলেন। এ-ঘর থেকে অনেক কথা শোনা যাচ্ছিল। আমাকে একজন ভক্ত বললেন যে, জজ সাহেবের[২] স্ত্রী নাকি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মনের চঞ্চলতা কী করে যাবে?" মহারাজ উত্তরে বলেছিলেন, "কেন, চাবুক মেরে শাসন করবেন।" ঐকথা শুনে

২ বরিশালের তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট জজ শ্রীযুক্ত বি.কে.বসু (আই.সি.এস.)।

জজ সাহেবের স্ত্রী (বাবুরাম মহারাজের ভাইঝি শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবী) নাকি বলেছিলেন, "তা মহারাজ, চাবুক তো হাতে, মন অনেক দূরে পালিয়ে গেছে, চাবুক মারব কাকে?" উত্তর শুনে মহারাজ খুব হেসেছিলেন। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মহারাজ নিজের ঘরে এলেন, দেখলাম বেশ গম্ভীর।

—বাবু বললেন, "মহারাজ আজকে বড় ক্লান্ত।" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছেন! তা আপনারা সকলে আসেন তা কী...।" (আমাদের কষ্ট হবে বলে বোধ হয় আর কিছু বললেন না।)

আমি নিবেদন করলাম, "মহারাজ, আপনার এখানে এলে আমাদের আনন্দ হয়, তাই আসি।" তিনি বললেন, "আমারও তো আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়। তিনি তো আপনাদের ভেতরেও আছেন।" আমি বললাম, "আমরা তো বুঝতে পারছি না।" তিনি কিছু বললেন না। হঠাৎ তাঁর চোখদুটি ঢুলুঢুলু হলো, হাতজোড় করে বললেন, "একটু দয়াটয়া রাখবেন, আপনাদের দয়ার ওপরই নির্ভর করি।" সঙ্গে সঙ্গে —বাবু বলে উঠলেন, "মহারাজ, মহাপুরুষদের বাক্য কিন্তু মিথ্যা হয় না, মনে রাখবেন; কিন্তু—।"

ধীরে ধীরে বিজ্ঞান মহারাজের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি তখন বললেন, "আমি এখন একটু নির্জনে বসব।" আমিই তখন প্রথম উঠে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, "মহারাজই তো আমাদের মনের কথা বলে দিয়েছেন!" আমার কথা শুনে তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল, তিনি বললেন, "আপনারা আনন্দে থাকুন।" তাঁর কথা শুনে প্রণাম করতে করতে বললাম, "মহারাজ আশীর্বাদ করুন যেন তা-ই পারি।" একথা শুনে তিনি বললেন, "আনন্দ মানে এ নয় যে দুঃখ আসবে না—দুঃখ এবং সুখে বিচলিত না হয়ে থাকা।"

—মহারাজ বললেন, গতরাতে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর শ্রীশ্রীজগন্মাতার দিব্যদর্শনের কথা বলেছিলেন এবং 'মা' যে তাঁকে কাঞ্চনত্যাগ করতে আদেশ করেন, তা-ও বলেন। এরপরেই বিজ্ঞান মহারাজ ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজে ইস্তফা দিয়ে আলমবাজার মঠে চলে আসেন। মহারাজ নাকি বলেছেন যে, আগে তাঁর খুব ক্রোধ ছিল, ঠাকুরের ইচ্ছায় সেটা চলে গিয়েছে। এখন বরং মনে হয় যে, রাগ করলে নিজেরই কষ্ট।

৩০ নভেম্বর, শনিবার, সকাল আটটা

আজ আমি এবং পাশের বাসার —বাবু একসঙ্গে মহারাজের কাছে

গিয়েছিলাম। তিনি হাসিমুখে গল্প করছিলেন। আমরা প্রণাম করে বসতেই তিনি বললেন, "রাতে ঘুমটুম হলো? হজমটজম?" বিজ্ঞান মহারাজের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, কারণ তিনি এপর্যন্ত একদিনও এরকম প্রশ্ন করেননি। আরো বিশেষ কারণ এই যে, গতরাতে আমি একটু ধ্যান-ভজন করব মনে করে খুব কম খেয়েছিলাম; ভেবেছিলাম, মাঝরাতে উঠে বসব কিন্তু আমার আর ঘুম ভাঙেনি এবং সকালে খুব দেরিতে উঠেছিলাম। —বাবু প্রসাদাদি খুব বেশি খেয়ে গতরাতে হজম হবে না মনে করেছিলেন; কিন্তু পেট খারাপ হয়নি, অধিকন্তু তিনি রাতে উঠে কিছু ধ্যান-জপও করেছেন। আমি —বাবুর বিষয় পরে জানতে পেরেছি, সুতরাং বিজ্ঞান মহারাজের কথা শুনে আমি মনে করেছিলাম, 'ইনি তো কম dangerous লোক নন! উনি আমার মনের কথা কী করে বুঝলেন!'

একটু পরেই বিজ্ঞান মহারাজ ক্ষৌরকর্মের জন্য ভিতরের বারান্দায় গেলেন, কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরেই চারিদিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, "আপনাদের যা প্রশ্ন আছে জিজ্ঞেস করুন।" সকলকেই নিরুত্তর দেখে কিছুক্ষণ পর হেসে বললেন, "তবে আর কী, কারুর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।"

এরপরেই শ্রী— গীতায় যোগীর যেসব লক্ষণের কথা আছে, তার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। —বাবুর গীতাশাস্ত্রে কতটা শ্রদ্ধা আছে, তা দেখার জন্যই যেন বিজ্ঞান মহারাজ একে interpolation (প্রক্ষিপ্ত) বলে নির্দেশ করলেন। তখন —বাবু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী থেকে একটা ঘটনা বললেন, "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মাদ্রাজ অঞ্চলে একটি লোককে দেখেছিলেন। গীতাপাঠ শুনতে শুনতে সেই লোকটির চোখ দিয়ে ধারা বইছিল। সে লোকটি সংস্কৃত জানত না, কিন্তু অর্থ না বুঝেই কাঁদছে কেন জিজ্ঞেস করাতে সে লোকটি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে বলল, 'আমি ঠাকুরকে সারথিরূপে উপবিষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তিনি অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিচ্ছেন।' তাঁর কথা শুনে মহাপ্রভু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ও ঠিক বলছে।'"

—বাবুর গল্প শুনে বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "তা আপনার বিশ্বাস আমি ভাঙতে চাই না। বেশ তো, গীতায় যা আছে তা-ই করবেন।" একটু পরেই আবার বললেন, "তা গীতায় তো সব রকমই আছে।"—একথা বলে হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, "ভ্রু-মধ্যে জোর করে মনকে একাগ্র করতে গেলে অনেক বাধা উপস্থিত হয়; অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যায়। মস্তিষ্কের তিনটে স্তর আছে—নিম্ন, মধ্যম ও সর্বোচ্চ। সাধারণ চিন্তাদি নিম্নস্তরের, ধ্যানধারণার ফলে মন মধ্যমস্তরে ওঠে, কিন্তু উচ্চস্তরে তাকে ওঠানো খুবই শক্ত। ঈশ্বর সর্বত্রই

রয়েছেন, মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে বিশেষভাবে প্রকাশিত রয়েছেন।" সকলেই নীরবে শুনছিলেন। একটু পরেই তিনি আবার বললেন, "তবে বিশ্বাস-ভক্তি চাই—বিশ্বাস-ভক্তি হলে সব easy হয়ে যায়। তখন আর জোর করে কিছু করতে হয় না।"

কিছুসময় চুপ করে থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ —বাবুর ভাই —বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে আপনিও এসেছেন!" সে ভদ্রলোক তাঁর ব্যক্তিগত অশান্তির কথা এবং সকল ধর্মের প্রতি, বিশেষত খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলতে লাগলেন; সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক বাজে কথাও বলতে লাগলেন। বিজ্ঞান মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। আমরা অনেকেই বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে উঠে গেলাম। —মহারাজের কাছে পরে শুনলাম, —বাবু বিজ্ঞান মহারাজকে একা পেয়ে তাঁর শ্রীচরণযুগল মস্তকে স্থাপন করে গুরুস্তবাদি করেছিলেন এবং পরদিন তাঁর কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

বিকাল চারটা

আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর নিজের ঘরে এলেন। অন্য দিনের মতো আজও কিছুটা সময় গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। —বাবু এরপর বললেন, "মহারাজ, ঠাকুরের কথা আপনার কাছে আমরা শুনতে চাই।" তিনি বললেন, "আমি আর বেশি কিছু তো জানি না, তবে আমার নিজের শোনা কথাই তো এদের (আমাদের দেখিয়ে) বলেছি।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে লাগলেন, "আমি যখন প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম, তখন ছেলেমানুষ ছিলাম (বয়স ষোলো-সতেরো বছর); একা হেঁটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে বাইরের গেটের দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কিছুই বলতে পারলে না; বললে, 'ভেতরে গিয়ে খোঁজ করো।' ভেতরের দারোয়ানদের কাছে জিজ্ঞেস করাতে একজন বুড়ো দারোয়ান তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলে। উত্তরদিকের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের দুয়ার বন্ধ। সাহস করে 'নক' করলাম; তৃতীয়বার 'নক' করতেই দুয়ার খুলে গেল।" একথা বলেই হাসতে লাগলেন, আর বললেন, "Knock and it will be opened."

একটু পরেই আবার বলতে লাগলেন, "এমনি তো লিখতে-পড়তে জানতেন না, কিন্তু তাঁর শিষ্টাচার কতটা ছিল! আমাকে বসতে দিলেন, জিরোতে বললেন; অতটা হেঁটে গিয়েছি—তেষ্টা পেয়েছিল, জল খাওয়ালেন। তারপর ছোট তক্তপোশটিতে বসে বললেন, 'কিছু সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞেস কর।'

"আমি তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ প্রথম—'ভগবান কি আছেন?' তা তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আছেন, তিনি সর্বত্রই আছেন।' 'সর্বত্রই আছেন' শোনার সঙ্গে সঙ্গে উনি যে তক্তপোশটিতে বসেছিলেন সেটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ল; কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে কি এই তক্তপোশটিও ভগবান?' তিনি তখনই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এই তক্তপোশ ভগবান, এই ঘটি ভগবান, এই বাটি ভগবান, এই ইট ভগবান, এই ছাদ ভগবান—যা দেখতে পাচ্ছিস সবই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কিছু নেই।'

"আমি ঐরকম শুনে মনে করলাম—'তা হবে।' শেষ প্রশ্নটি হলো, 'ভগবান সাকার না নিরাকার?' তিনি বললেন, 'তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে, আবার সাকার নিরাকারেরও পারে—মুখে বলা যায় না।' আমি তো সাকার সম্বন্ধে ধারণা করলাম এবং একরকম বুঝলাম। নিরাকারও আকাশ-বাতাসের মতো মনে করে খানিকটা বুঝলাম। তার পারে যে কী, তা আর তখন বোধগম্য হলো না। কিন্তু মশাই, তাঁর কথা শুনে, আর মুখ-চোখ দেখে, পুনরায় আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।"

কিছুটা সময় চুপচাপ থাকার পর একটু হেসে বললেন, "এবার তো আপনাদের সবই বলে দিলাম; আপনারা সবই জেনে ফেললেন, আর কী, তাহলে আমার ছুটি।"

আজ এসময় ডিস্ট্রিক্ট জজ সাহেবের (Mr. B. K. Bose, I.C.S.) বাড়িতে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল, কাজেই আমরা সব উঠে পড়লাম।

১ ডিসেম্বর, রবিবার

সকাল প্রায় আটটার সময় মিশনের গেটে আমরা কয়েক জন তাঁকে প্রণাম করলাম। বিজ্ঞান মহারাজ খুব গম্ভীর ছিলেন, কিছুই বললেন না। ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের ছবিখানি হাতে করে এনে নতুন হলঘরে বসালেন। আমরা শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাজিয়ে ধন্য হলাম। নামার সময় তাঁর চটিজোড়া যথাস্থানে এগিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। পরে মহারাজ দীক্ষাদি দিতে গেলেন।

আজ বিকালে মিশন-প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভা হয়। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য শ্রী— খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। অনেকে আশা করেছিলেন, বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলবেন, কিন্তু তিনি —বাবুর প্রশংসা করে, তাঁর কথাগুলো মনে রাখতে অনুরোধ করে সভার কাজ শেষ করলেন। বিজ্ঞান

মহারাজ আজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মিটিং হয়ে যাওয়ার অনেক পরে রাতেও তাঁকে প্রণাম করার অনুমতি পেলাম না।

২ ডিসেম্বর, সোমবার, সকাল আটটা

উপস্থিত সকলেই মহারাজের কাছে কিছু শোনার জন্য চুপচাপ বসে আছি। বরিশালের ঘোড়ার গাড়ি সম্বন্ধে কথা উঠল, তারপর এক্কাগাড়ির 'থেকে থেকে লাগে বিষম ধাক্কা' এবং তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শুনে আমার মনে নৈরাশ্যের একটি বিষম ধাক্কা লেগেছিল; কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজ যখন বললেন, "এক্কা উলটেও যায়", তখন আবার উৎসুক হয়ে শুনতে আরম্ভ করলাম।

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, "আমি একবার কাশীধামে বিশ্বনাথকে দেখেছিলাম। সেখানে সেবাশ্রমে কী একটি opening ceremony ছিল। আমি এলাহাবাদ থেকে এসে কাশী Cantonment station-এ নেমে এক্কায় খানিকটা যেতে না যেতেই একটি মোড়ে এক্কা গেল উলটে। আমার পা চাকার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। পা-টাকে টেনে বের করে নিলাম, কিন্তু বেশ ব্যথা লাগল। রাতে ভীষণ জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা। আমি বিশ্বনাথকে বললাম, 'আপনার জায়গায় আসতেই তো আমার পায়ে চোট লাগল, অথচ যে কাজটার জন্য এসেছি তা-ও তো মন্দ নয়, এ কেমন হলো!'

"ঘুমিয়ে আছি, রাতে দেখি—বিশ্বনাথ এসে উপস্থিত; জটাজুট রয়েছে, গলায় সাপ জড়ানো, একেবারে শুভ্র। আমাকে দেখে একটু হাসলেন, আর আলিঙ্গন করার জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন। আমি বললাম, 'না, আলিঙ্গনে আর কাজ নেই; একে তো আমার পায়ে চোট লাগল, জ্বর হলো, আবার আলিঙ্গন! আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। আপনার সঙ্গে আলিঙ্গন করে কাশীপ্রাপ্ত হই আর কী!' তা তিনি শুনলেন না। আস্তে আস্তে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর গা কী ঠান্ডা—যেন বরফের মতো। ঘুম থেকে উঠে দেখি, পায়ের ব্যথাট্যথা কিছু নেই, জ্বরও সেরে গেছে।"

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "বিশ্বনাথকে দেখেছিলাম বিরাট পুরুষ, কিন্তু জটাজুট ও সাপ জড়ানো ছিল।" আমি প্রশ্ন করলাম, "মহাদেবের কি দাড়ি-গোঁফ ছিল, না ছবির মতো?"

তিনি বললেন, "তা, বোধ হয় দাড়ি-গোঁফ ছিল। ঐ ছবিই তো আমার মনে ছিল, তাই অমন স্বপ্ন দেখলাম। মনেরই খেয়াল বোধ হয়।"

—বাবু বললেন, “তা জ্বর ছেড়ে যাওয়াটা তো আর খেয়াল নয়!” তিনি বললেন, “তা হয়তো জ্বরটা ছেড়ে যাওয়াতেই ঠান্ডা লেগেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্বপ্ন দেখেছিলাম।” এরপরেই মহারাজ উঠে গেলেন।

আজ বিকাল প্রায় চারটের সময় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের কলেজে গিয়েছিলেন। সেখানে টেনিস লনের একধারে তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপকবৃন্দ অর্ধবৃত্তাকারে তাঁর সামনে বসেছিলেন। কলেজ আগেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশি ছাত্র ছিল না; হস্টেলের কয়েক জন ছাত্র এসে তাঁর কাছে কিছু শুনতে চাইল। তিনি তাদের সংক্ষেপে শরীর সুস্থ রাখতে, পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং কথায় ও কাজে যথাসম্ভব সত্য পালন করতে উপদেশ দিলেন। অধ্যাপকরা কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি বললেন, “শ্রীশ্রীপরমহংসদেব খুব খাঁটি লোক ছিলেন, তিনি ভগবানের নাম করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। একবার সমাধির সময় একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লার টুকরো শরীরে ঢুকে গিয়েছিল, কিন্তু উনি তখন তা টের পাননি; পরে তা সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বের করতে হয়।”

কলেজের ডাক্তার শ্রী— উপস্থিত ছিলেন।

—বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, “আমরা ক্রমশ ভালর দিকেই যাচ্ছি, যুবকরা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে ভাল হবে।”

বিজ্ঞান মহারাজকে ফল-মিষ্টাদি যা খেতে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে সামান্য কিছু মুখে দিলেন। একটু পরেই উপস্থিত সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেড়াতে গেলেন।

বিজ্ঞান মহারাজ বললেন, “তাঁর নাম করো, আত্মার শান্তি পাবে।” পরে জিজ্ঞাসা করলেন, “What is the definition of soul?” কেউই উত্তর দিল না দেখে নিজেই বললেন, “Soul is immaterial. Soul is beyond birth and death. Soul is eternal. Individual soul is subservient to the supreme soul.”

প্রশ্নোত্তরে বললেন, “প্রাণায়াম বেশি করা ভাল নয়; ৪/১৬/৮ অথবা ৮/৩২/১৬—এই পর্যন্ত করবে। বায়ুস্থির করে এক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকতাম, পরে দেখতাম, মাথা খুব গরম হয়ে যায়। প্রাণায়াম দুই প্রকার—নির্বীজ ও সবীজ, সবীজ প্রাণায়াম বড় শক্ত।

"ধ্যানধারণা যা সয় তা-ই করা ভাল, জোর করে বেশি করতে গেলেই মাথা গরম হয়ে যায়।

"সব রকমই করা গেল, এখন ঠাকুর আর মা-ই সম্বল। তাঁদের ওপরই নির্ভর করে পড়ে আছি। এ-ই মনে হচ্ছে, যেন তাঁদের নাম করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।"

বীজমন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন, "হ্রীং, শ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্রের শক্তি সত্যিই আছে। রামায়ণে যেসব বাণের কথা আছে সেসবও সত্যি।"

এরপর বিজ্ঞান মহারাজকে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে এক দিন বেশি থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি রাজি হলেন না। তাঁর যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি দুটি গল্প বললেন ঃ

"গঙ্গাধর মহারাজকে একবার রাখাল মহারাজ নৌকা করে যেতে দিলেন; কিন্তু মাঝিকে টিপে দিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ অনেক পরে ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে নৌকা বেলুড়ের ঘাটেই আছে, আর রাখাল মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন।

"আমি একবার বেলুড় থেকে এলাহাবাদ যাব; কিছুতেই যেতে দেয় না দেখে হেঁটে হাওড়া গিয়ে টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসলাম। পরে পরিচিত একজন লোককে দিয়ে নিজের মালপত্র আনিয়ে নিলাম।"

একজন ভক্ত বললেন, "এখান থেকে চলে গিয়েও হয়তো বেলুড় হতে বেরোতে পারবেন না।" তিনি বললেন, "তা ওরা আমাকে খুব চেনে, ওরা ওরকম করবে না।"

৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, সকাল আটটা

আজ মহারাজ খুব হাসিখুশি ভাবে ছিলেন। আমরা সকলে প্রণাম করে বসতেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "সারনাথে পাথরের খোদাই করা দুটি সাপ জড়িয়ে রয়েছে দেখেছিলাম। পরে স্বপ্ন দেখছি যে, সমস্ত ঘরে সাপ ঘুরছে; আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি—'তোমরা এখানে কেন? তোমাদের দূরে থাকাই ভাল, তোমরা লোকদের অযথা কামড় দাও।' সাপগুলি যেন বলছে, 'তা সবসময় অকারণে কেন কামড়াব, তাছাড়া আমরা লোকের মঙ্গলও করি।'"

আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য বিজ্ঞান মহারাজ বৃন্দাবনের একজন সাধুর

কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ঃ “বৃন্দাবনে খুব সাপ; আমাদের আশ্রমের একজন সাধু সাপ দেখলে লেজ ধরে ঘুরিয়ে মেরে ফেলত। তা ওরাও সুযোগ খুঁজছিল! একদিন সন্ধ্যার একটু আগে সাধুটি শৌচে বসেছে, একটা খুব বড় সাপ হঠাৎ এসে মাথায়, ঘাড়ে ও আরো কয়েকটা জায়গায় কামড় দিল। সাধুটি ঐ অবস্থাতেই সাপটিকে ধরেছিল, কিন্তু রাখতে পারলে না। খানিক বাদেই সেই সাধুটি মারা গেল।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিজ্ঞান মহারাজ আবার বলতে লাগলেন, “বেলুড়েও প্রথম যখন কয়েকটি বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, খুব সাপ ছিল। আমাদের একজন contractor একদিন আমাকে বললেন, ‘আসুন, একটা তামাশা দেখে যান।’ পরে একটা আমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘ঐ দেখুন, জলে একটা গোখরো ও একটা কেউটে জড়িয়ে রয়েছে; খুব সাবধানে দেখবেন। ওরা দেখতে পেলে কিন্তু খুব রেগে যায়; আর যেমন করেই হোক কামড়ে দেয়।’ তা সাপগুলোর খুব বড় ফণা ছিল। আমি তো ঐটি দেখে গিয়ে রাখাল মহারাজকে বললাম; উনি শুনে খুব মন্দ বললেন। বললেন, ‘সাপ যে কেবল দেখতে পেলে কামড়ায় তা নয়, ওতে আধ্যাত্মিক ক্ষতিও হয়।’ আমি তবু তাঁকে বললাম, ‘আপনি কি দেখবেন?’ তা উনি বললেন, ‘না, আমি দেখব না। আমি বৃন্দাবনে ওরকম দেখেছি! তুমি আর দেখো না, ওতে ক্ষতি হয়।’”

বিকাল সাড়ে চারটা

আমরা কয়েক জন মহারাজকে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই তিনি বললেন, “আসুন মহাপ্রভুরা।”

—বাবু বললেন, “কই মহারাজ! আমরা তো তা বুঝতে পারছি না।”

তিনি হেসে বললেন, “তা মহাপ্রভুরা নিজেরা বুঝতে পারেন না।”

মহারাজ তাড়াতাড়ি স্টিমারঘাটে যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখাতে লাগলেন। স্টিমার ছাড়বার প্রায় দু-ঘণ্টা আগে ৪.৪৫ মিনিটের সময় তিনি রওনা হয়ে গেলেন। আমরা অনেকে স্টিমারে তাঁকে আরেক বার প্রণাম করতে গেলাম। আমাদের আগ্রহ দেখে তিনি শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও অনেকক্ষণ সামনের ডেকে বসে উপস্থিত সকলকে আনন্দে ভরপুর করে রাখলেন।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪০তম বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা)

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের পুণ্যস্মৃতি

রাধাকান্ত বসু

[লেখক রাধাকান্ত বসু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ গৃহি-শিষ্য ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর পোষ্যপুত্র। রামকৃষ্ণ বসুর এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা। পুত্র হৃষীকেশ অল্পবয়সে মারা যান। রামকৃষ্ণ বসুর মৃত্যু হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। রামকৃষ্ণ বসুর স্ত্রী সুশীলাবালা, বলরাম বসুর কনিষ্ঠ সহোদর সাধুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পৌত্র রাধাকান্তকে (জন্ম ঃ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) পোষ্যপুত্র নেন (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। রাধাকান্তের পিতার নাম নিত্যানন্দ, মাতার নাম কমলা। রাধাকান্তের জন্মের এক বছরের মধ্যে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে কমলার মৃত্যু হয়। রাধাকান্তের নতুন নাম হয় পার্থসারথি—সংক্ষেপে পার্থ। সরকারিভাবে রাধাকান্ত নামটি থেকে গেলেও 'পার্থ' নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। গত ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে বলরাম বসু বা রামকৃষ্ণ বসুর দিক থেকে পুত্রের ধারাটি শেষ হয়ে গেল। (দ্রঃ বলরাম বসুর বংশতালিকা, উদ্বোধন, ৯২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৩২; ৯৫তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৮) লেখকের নিজের হাতে লেখা নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাটি তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। সম্পাদক—উদ্বোধন]

ওঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে শিবস্বরূপায় ধীমহি।
তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।

মা[১] ছোড়দাকে[২] মঠে[৩] পাঠালেন। ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কয়েক দিনের জন্য এলাহাবাদ থেকে বেলুড়ে এসেছেন—দীক্ষা দেবেন। মহারাজের কাছে গিয়ে ছোড়দা বললেন, "মঞ্জুর মা[৪] পাঠালেন, বিভু[৫] আর পার্থর[৬] দীক্ষার জন্য।" শুনে মহারাজ বললেন, "এবার ওদের দীক্ষা হবে না। ঠিক সময়ে ওদের আমি ডাকব।" সেবারে তিনি এলাহাবাদে ফিরে গেলেন। সময়টা যতদূর মনে আছে ১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। কিছুদিন পর মহারাজ নিজে ছোড়দাকে চিঠি

---

১ সুশীলাবালা বসু—বলরাম বসুর পুত্রবধূ, রামকৃষ্ণ বসুর স্ত্রী। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

২ শান্তিরাম ঘোষ—বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর। রামকৃষ্ণ বসুর ছোটমামা। সুতরাং, সম্পর্কে লেখকের ছোটদাদু। লেখক তাঁকে 'ছোড়দা' বলতেন।

৩ বেলুড় মঠ।

৪ সুশীলাবালা বসু। 'মঞ্জু' অর্থাৎ মঞ্জুলালী (মিত্র) তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা।

৫ বিভূতিভূষণ বসু। বলরাম বসুর কনিষ্ঠ সহোদর সাধুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পৌত্র—নিত্যানন্দ বসু ও কমলা বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। লেখকের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ডাকনাম 'বিভু'।

৬ লেখক (পার্থসারথি বসু—পার্থ)

লিখে আমাদের এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিতে বলেন। আমরা দু-ভাই হরেরামবাবুর[৭] সঙ্গে (ওঁকে আমরা 'কাকা' বলতাম) মহারাজের নির্দেশমতো এলাহাবাদ মঠে হাজির হলাম; পৃথগ্‌ভাবে প্রচুর ফল, মিষ্টি ও প্রণামিস্বরূপ মোহর ইত্যাদি নিয়ে। মহারাজ প্রণামি ও জিনিসপত্রের বহর দেখে মন্তব্য করলেন, "শান্তিরামবাবু ও নিতাইবাবু[৮] খুব পাকামি করেছেন দেখছি!"

যতদূর স্মরণ হয়, পরের দিনই ভোরে ত্রিবেণীতে স্নান করে এলাম এবং সকালে দীক্ষা হলো—দু-ভাইয়ের পৃথক পৃথক। দীক্ষার পরে মহারাজ উভয়কে একটা করে সাদা বন্ধ খাম হাতে দিলেন। খুলে দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে মহারাজের স্বহস্তে লিখিত অমূল্য উপদেশাদি-সমেত আমাদের ইষ্টের দুখানি ছবি।

সকাল থেকে উপবাস ছিল। দুপুরে মাছ-সমেত ঝোল ও ভাত—হালকা করে রান্না। আমাদের ছোট্‌কা[৯] তখন ঝরিয়া কয়লাখনির চিফ ম্যানেজার ছিলেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল, ঐ-দিন রাতের গাড়িতেই ঝরিয়া যাব। গুরুদেবকে নিবেদন করলাম আমাদের বাসনা এবং জিজ্ঞাসা করলাম, মাছ-মাংসাদি খেতে পারি কি না। গুরুদেব বললেন, "খাওয়াদাওয়ার কোনো বাধা নেই।"

গুরুদেবকে আমরা উভয়ে নিবেদন করি যে—গানবাজনা, তাসখেলা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহই করে প্রায় সমস্ত দিন কেটে যায়। সবসময়েই আমাদের ঘিরে থাকে বন্ধুবান্ধব। এ-অবস্থায় জপাদি করব কখন বা কী করে নির্জনতা পাব? নির্দেশ পেলাম, "তোরা পায়খানা করতে কলঘরে যাস তো? তখনো কি সঙ্গে বন্ধু থাকে?" আমরা 'না' বলায় গুরুদেব নির্দেশ দিলেন, "ঐ পায়খানা করতে করতে যতবার পারবি আঙুলটা চালিয়ে নিবি—এখন তা হলেই হবে।"

গুরুদেবকে প্রণাম করে সন্ধ্যার গাড়িতে ঝরিয়া রওনা হলাম।

একটা অতি বিস্ময়কর ঘটনার কথা বর্ণনা করতে ভুলে গিয়েছি। যখন গুরুদেব আমাদের দীক্ষার জন্য ডাকলেন, তখন এলাহাবাদে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তীব্র দাঙ্গা চলছে। সকালে ত্রিবেণীতে স্নান করতে যাব। গুরুদেব এক মুসলমান মাঝিকে ডেকে পাঠালেন। সে-ও হাতজোড় করে 'বাবা' বলে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। মহারাজ তাকে বললেন, "এই দুটো আমার ছেলে। চান করবে—দেখিস, যেন এদের গায়ে একটুও আঁচ না লাগে।" সে তো প্রায়

৭ হরেরাম ঘোষ। বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর তুলসীরাম ঘোষের পুত্র।

৮ নিত্যানন্দ বসু—বলরাম বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র, সাধুপ্রসাদের পুত্র। লেখকের (এবং বিভূতিভূষণের) পিতা।

৯ ভগবানরাম ঘোষ—বাবুরাম মহারাজের কনিষ্ঠ সহোদর শান্তিরাম ঘোষের পুত্র।

মাথায় করে আমাদের নিয়ে গেল। ঐ-দিন বিকালে টাঙায় করে শহর দেখতে যাব বললাম। একই ব্যাপার—মুসলমান গাড়োয়ান এল। তাকেও একই কথা বললেন মহারাজ। সে জবাবে বলল, "বাবা, আমার জান থাকতে একটা ছুঁচও দাদাদের গায়ে লাগতে দেব না।" কোন্ দিকে বেশি উত্তেজনা বা গোলমাল, আমরা কিছুই জানতাম না। 'এ-দিকে চলো, ও-দিকে চলো' গাড়োয়ানকে বলছি; গাড়োয়ান বলছে, "না দাদারা, ও-দিকে যাব না, ও-দিকে খুব জোর হামলা চলছে।" যাহোক, আমাদের সন্তুষ্ট করার মতো সে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। তার কিছু পরে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। আমাদের এলাহাবাদ রওনা হওয়ার আগেই দাঙ্গার খবর কলকাতায় খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছবিসহ নিত্য প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের মা[১০] বা বাবা[১১] কেউই আমাদের নির্দিষ্ট তারিখে রওনা করাতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেননি। যেহেতু গুরুদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের বারণ করা সত্ত্বেও তাঁদের মন কিছুমাত্র চঞ্চল হয়নি। মহারাজের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি কত গভীর ছিল, এ থেকে বোঝা যায়।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

১০ সুশীলাবালা বসু
১১ নিত্যানন্দ বসু

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা

সংগ্রাহক ঃ গুরুদাস গুপ্ত

মহাপুরুষ মহারাজের অসুখ। বিজ্ঞান মহারাজ এলাহাবাদে। তিনি খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ঐসময় দেখলেন, ঠাকুরঘর থেকে ঠাকুর নারায়ণ-বেশে বার হয়ে বলছেন, "ভাবছিস কেন? ওকে তো আমিই দেখছি।" মহারাজ আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু কৌতূহল হলো—যাঁকে নারায়ণ দেখছেন, তাঁকে এক বার দর্শন করা চাই। এলাহাবাদ থেকে রিটার্ন টিকিট কেটে রওনা হলেন এবং হাওড়ায় নেমে যাতায়াতের জন্য ট্যাক্সি ধরলেন। মতলব হলো, মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করে তখনই ফিরবেন।

ঐ বিশাল শরীর নিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। আগে কাউকে সংবাদ দেননি। পায়ের শব্দ শুনে সকলে বুঝলেন, বিজ্ঞান মহারাজ এসেছেন। সটান তিনি মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলেন। উভয়ের মহা আনন্দ। কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লেন। ধুপধাপ শব্দ করে নিচে নামলেন এবং সোজা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলেন, ঠাকুরঘরেও গেলেন না। তখন মঠের পরিচালকগণ আশ্চর্য হলেও তিনি নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, "এই দেখো না, যাতায়াতের টিকিট করে এসেছি এবং ট্যাক্সিও যাতায়াতের জন্য।" কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে কয়েক জন সাধু ট্যাক্সির সামনে শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, "আমাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারেন তো যান।" অগত্যা যাওয়া বন্ধ হলো।

বিশ্রামান্তে নারায়ণ-দর্শনের ব্যাপারটি উপস্থিত সকলকে বললেন।

বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কয়েক দিন আছি। একদিন বিকালে অনেকে বসে আছেন এবং নানা গল্প হচ্ছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি রেখে শিশুদের ভয় দেখাবার জন্য লোকে যেমন বন্দুক ছোঁড়বার সময় দু-হাতের আঙুলের এক বিশেষ সন্নিবেশ করে, ঠিক তেমনি করে বেশ গম্ভীরভাবে 'গুড়ুম্' শব্দ করে উঠলেন। ঘটনাটা হঠাৎ হওয়ায় চমকে উঠেছি। মহারাজ হাতে পুনঃপুন তালি দিয়ে হেসে কুটিপাটি হয়ে বললেন, "এই দেখো।"

তারপর একটা গল্প বললেন, "একজন বলেছিল লড়াইয়ে যাবে। এদিকে তার

ভয়ও হচ্ছে, যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিতে চায়।" তারপর আমাকেই বললেন, "ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে কী সাধু হওয়া যায়?" এই ঘটনায় আমার মনে ভয়ের ভাব যা দৃঢ় সংস্কাররূপে ছিল, তা একেবারে চলে গেল।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসেছেন, মহারাজ আমাকে চেয়ার দিতে বললেন। ভদ্রলোকটি বললেন, "না, মহারাজ, আমি নিচেই বসছি।" কিন্তু মহারাজ চেয়ার দেওয়ার জন্য জিদ করে বললেন, "Respect should be paid towards the old and aged."

একদিন ঠাকুরের কাছে কোনো একজন পূর্বকথামতো আসেনি। পরে আরেক দিন এলে ঠাকুর তাকে বললেন, "কিগো! ও-দিন আসনি কেন? গিন্নি বুঝি কাছা ধরে আটকে রেখেছিল?" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, "আপনি জানলেন কী করে মশাই?" ঠাকুর বললেন, "আমি সব দেখতে পাই। তবে যা বললে ভাল হবে, তা-ই মাত্র বলি।"

ঠাকুরের ঐকথা শুনে বিজ্ঞান মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—'লোকটি তো বড় dangerous! আমি তো নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো পাপ করি।' ঠাকুরের কথা শুনে মহারাজ বুঝলেন যে, ঠাকুর তাঁরও মনোভাব জেনেছেন।

ঠাকুরের মনে হলো—'দর্শন সব মাথার ভুল নয় তো?' ঠাকুর তখন ভাবলেন—'যদি ঐ পাথরখানা (নহবতের সামনে ছিল) নাচতে নাচতে উঠোনের এ-দিক থেকে ও-দিকে যায় তবে বুঝব দর্শন ঠিক, মাথার ভুল নয়।' বাস্তবিকই পাথরটি যথাসঙ্কল্পিতভাবে নাচতে নাচতে চলে গেল।

জনৈক শিষ্য ঃ মহারাজ, আমার ভগবান লাভ হবে?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ হ্যাঁ হবে। সত্যকথা বলবে।

শিষ্য ঃ মহারাজ, মন বড় চঞ্চল, কী করি?

বিজ্ঞান মহারাজ ঃ মন তো চঞ্চলই। শোয়ার সময় 'রাম রাম' বলে শোবে। আমিও ঐরূপ করি।

শিষ্যের মনে ছিল—'কাম যায় কী করে এবং তা নিবারণের উপায়ই বা কী?' অন্তর্যামী গুরু তার মনোগত প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন।

কোনো মাদ্রাজি শিষ্য বহু সমস্যাজর্জরিত এক সুদীর্ঘ পত্র বিজ্ঞান মহারাজের কাছে মীমাংসার জন্য পাঠান। মহারাজ সমস্যাভঞ্জনের কোনো চেষ্টা না করে তাঁকে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করতে লেখেন ঃ "সকাল-সন্ধ্যায় ঐ মন্ত্র পুনঃপুন উচ্চারণের ফলে সূর্যোদয়ে কুয়াশারাশি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ সর্বসংশয় নষ্ট হয়ে যাবে।"

জনৈকা দীক্ষিতা শিষ্যা ঃ কী করলে ভগবানের পথে এগোতে পারব, তা-ই বলুন।

মহারাজ (একটু নীরব থেকে সহাস্যে) ঃ ঠাকুর বলতেন, সত্যকে আঁট করে ধরতে হয়। একেবারে ঠিক ঠিক ধরা। মন আর মুখ এক হবে। যা মুখে বলা, তা কাজে করা।

মহারাজ ঃ "এই তিপ্পান্ন বছরের মধ্যে মা একদিনও তাঁর মোহিনীমূর্তি দেখাননি। তাঁর কৃপা।"

—(শৈলেন মহারাজ কথিত)

বিজ্ঞান মহারাজের জীবনের শেষদিকে একদিন জনৈক সাধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ, আপনার আশ্রমে স্ত্রী-মেথরেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ; অথচ এখন মেয়েদেরও দীক্ষা দিচ্ছেন।"

এর উত্তরে বিজ্ঞান মহারাজ বলেন, "এখন দীক্ষার্থী মেয়ে কি পুরুষ—সে-বোধ দীক্ষাদানকালে থাকে না।"

—(স্বামী হরানন্দ কথিত)

নেপাল মহারাজ একদিন বিজ্ঞান মহারাজকে বলেন, "মহারাজ, ভগবদ্দর্শনের জন্য সাধু হলাম, কিন্তু কই, কিছুই তো হলো না!"

মহারাজ ঃ একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দর্শনলাভেই মানুষ কৃতার্থ হয়ে যায়। ঠাকুরের এতগুলি ব্রহ্মজ্ঞ সন্তানকে দর্শন করেও তোমার কিছু হলো না—এ কী বলছ!

বাসুদেবানন্দ ঃ রামচন্দ্র অন্তরাল থেকে বালীকে বধ করলেন কেন?

মহারাজ ঃ বালীর বর ছিল—যুদ্ধকালে যে তাঁর দিকে তাকাবে সে হীনবল হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র কোনো দেবতা বা ঋষির মর্যাদা লঙ্ঘন করতেন না। বানররাজ বালী খুব অত্যাচারী ছিলেন।

কারো জন্য শোক করা ভাল নয়—এপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বলেন ঃ "শোক তমোগুণ থেকে ওঠে এবং তা থেকে আবার ক্রোধ হয়। রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, কিন্তু সীতার শোকে 'কী করে সাগর পার হব' বলে আকুল। অথচ তাঁর কৃপায় হনুমান এক লাফে সাগর পার হয়ে গেলেন। রামচন্দ্র নিজে শোক নিয়ে জীবকে দেখালেন যে শোক কী ভীষণ বস্তু! শিব সতীর শোকে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন, ক্রোধে মদনভস্ম করলেন।

অর্জুন শোকগ্রস্ত হয়ে ধর্মযুদ্ধ ও দুষ্টদমন-রূপ ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিরত হতে চেয়েছিলেন। শরীরে তমোগুণ আসতে দিতে নেই। মোহগ্রস্ত হওয়া, আত্মহত্যা, অপরকে হত্যা করা—এসব তমঃপ্রসূত শোক থেকে উৎপন্ন হয়।"

মহারাজ ঃ virginity infringe করলে মহামায়া কিছুতেই ক্ষমা করেন না। মাকে ডাকো আর বলো—মা, বুদ্ধি দাও, যে-বুদ্ধির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়।

"কোনো বাসনা বা ভোগেচ্ছা মনে পুনঃপুন উঠলেও তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করার জন্য ছুটবে না বা ব্যস্ত হবে না। ঐ ইচ্ছার দোষ-গুণ বিচার করতে থাকো এবং অপেক্ষা করো। ঠিক ঠিক বিচার হলে ঐ ভোগেচ্ছা আপনা থেকেই বিলীন হয়ে যাবে, ভোগ করে তৃপ্তি আনতে হবে না।"

মহারাজ স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবার জন্য কবীর দাসের এই দোঁহাটি বলতেন ঃ

গজধন বাজিধন আওর রতন ধন মান।
আওত যব সন্তোষ সব ধন ধুরিসমান।।

[বাজি = অশ্ব, ধুরি = ধুলা]

ঈশোপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ব্যাখ্যাকালে বলতেন, "তিনি যা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন, তা-ই ভোগ করবে এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে।" আবার বলতেন, "ভগবানের কাছে ভোগৈশ্বর্য প্রভৃতি কিছুই চাইতে নেই, কারণ যা চাইবে তিনি তা-ই দেবেন।"

নিষ্কাম কর্মী হওয়ার উপায় প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, "তোমার মন যদি আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যেসব কাজ করছ, তা তোমার মনে কোনো দাগ ফেলতে পারে না এবং তোমার যেসব সুসংস্কার রয়েছে, তা-ও নষ্ট হলো না। তা হলেই তুমি নিষ্কাম কর্মী হলে।"

ঠিক ঠিক বিশ্রাম প্রসঙ্গে মহারাজ বলেন, "Real rest you will find when you are unselfishly active—অর্থাৎ যখন তুমি কর্ম করছ অথচ নিঃস্বার্থ, তখনই তুমি প্রকৃত বিশ্রাম কী, তা অনুভব করতে পারবে।"

—দর্শন বা অনুভূতি খাঁটি কি না তা নিশ্চয় করার উপায় কী?

—যদি দেখো, আধ্যাত্মিক ভাবাবেগ গভীরতর হয়েছে এবং জ্ঞান ও আনন্দ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবেই বুঝবে দর্শন সত্য। ত্রিবেণী-দর্শন কতকাল পূর্বে হয়েছে, কিন্তু এখনো সেই ত্রিবেণীর বালিকামূর্তি স্মরণ করলেই আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই।

স্বামীজীকে বিজ্ঞান মহারাজ অত্যন্ত ভয় করতেন। তিনি বলতেন, "স্বামীজীকে মনে হতো গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড মার্তণ্ড; আর রাজা মহারাজকে মনে হতো শরৎকালীন moon (চন্দ্র)।"

গুরুভাইদের মধ্যে কত ভালবাসা ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ একদিন মুড়ি খাচ্ছেন। হঠাৎ স্বামীজী তা থেকে একখাবলা মুড়ি নিয়ে খেলেন এবং হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

বিজ্ঞান মহারাজ নস্যি নিতেন জেনে স্বামীজী কলকাতা থেকে নস্যি কিনে এনে তাঁকে দেন।

একদিন কথাবার্তা শেষ হলে বিজ্ঞান মহারাজ রাজা মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, এখন আসি।" এই বলে চলে যাচ্ছেন। এমনসময় রাজা মহারাজ সহাস্যে বললেন, "আমি না যেতে দিলে কেমন করে যেতে পার দেখি।" তা শুনে বিজ্ঞান মহারাজ হেসে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি না যেতে দিলে কেমন করে যাই?" এই বলে দু-জনে প্রীতিপূর্ণ আলাপে প্রবৃত্ত হলেন।

আমরা শুনেছি ভগবান অন্তর্যামী। বিজ্ঞান মহারাজের মধ্যে অন্তর্যামিত্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, জনৈক ভক্ত তা তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন ঃ

"তখন তিনি মঠ-মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ। কাশীতে এসেছেন এবং সেবাশ্রমে কেদারবাবার (স্বামী অচলানন্দ) পাশের ঘরে রয়েছেন। মহারাজ শুয়ে আছেন এবং প্রিয় মহারাজ হাওয়া করছেন। রাত তখন প্রায় নটা। একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। ঘরখানি প্রায় অন্ধকার—বাইরের কিছু দেখা যায় না। আমার খুব ইচ্ছা মহারাজকে একবার প্রণাম করে আসি। কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছে, কারণ বিশ্রামকালে দর্শনাদির চেষ্টা অনুচিত। যাহোক, বারান্দায় সন্তর্পণে পায়চারি করছি যাতে শব্দ না হয়।

"এমনসময় ভিতর থেকে তিনি বললেন, 'বাইরে কেন? ভেতরে এসো।' ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসলে প্রিয় মহারাজকে বললেন, 'এর হাতে পাখা দাও, হাওয়া করুক।' তিনি বললেন, 'ও কী করবে?' কিন্তু মহারাজ জিদ করে বললেন, 'আরে দাও না।' কিছুক্ষণ পরে তাঁর খাবার এলে তিনি উঠে চেয়ারে বসলেন এবং বললেন, 'ঐ গ্লাসটিতে জল দাও।' গ্লাসটিতে এক সেরের বেশি জল ধরে। আমি ভেবেচিন্তে আধ গ্লাস জল তাঁর হাতে দিলে, বেশ নিরীক্ষণ করে দেখলেন। আহারান্তে বললেন, 'রাত অধিক হয়েছে, কাল এসো।' কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'শরৎ মহারাজ ভাল লোক ছিলেন।'"

এঁদের সঙ্গে কাজকর্মের মধ্যে মিশলে একটা জিনিস লক্ষ করা যেত। যেকোনো ব্যাপারেই হোক, এঁরা খুঁটিনাটি এত লক্ষ করতেন, যা আমাদের চোখেই পড়ে না। কোনো ঘটনা এঁদের কাছে বর্ণনা করতে গিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে ঘটনাটির আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসিত হয়ে বর্ণনাকারী দেখত যে, কতটা ওপর ওপর সে দেখেছে। বস্তুত, অনেক কিছু দেখার ছিল, সে তখন বুঝতে পারত। ভবিষ্যতে সব ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে দেখার ও লক্ষ করার ইচ্ছা জাগত। কাশীতে রাজা মহারাজ এসেছেন—তা দেখে কেউ এলাহাবাদ মঠে এসে বিজ্ঞান মহারাজকে বলল। তা শুনে বিজ্ঞান মহারাজ রাজা মহারাজ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলেন, তখন ঐ ব্যক্তি নিজের দৃষ্টিশক্তির ও পর্যবেক্ষণ শক্তির স্বল্পতা সম্বন্ধে অবহিত হলো।

পরিব্রাজক অবস্থায় নানা স্থানে দর্শনাদি করে বিজ্ঞান মহারাজ এলাহাবাদে আসেন এবং দশ বছর কঠোর তপস্যা, অধ্যয়ন ও ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করেন। তিনি ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকতেন এবং খুব কঠোর জীবনযাপন করতেন। নিজেই রান্না করতেন। অন্য কাজের জন্যও কোনো ভৃত্য ছিল না। যখন যেমন জোটে—

ঐভাবেই দিন কাটাতেন। অযাচিত হয়ে তিনি উপদেশ দিতেন না, তবে যদি কেউ আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশপ্রার্থী হতো, তাকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।

স্বল্পভাষী বিজ্ঞান মহারাজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে খুব অল্পকথায়, কখনো হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে, কখনো বা গম্ভীরভাবে প্রশ্নকর্তার সমস্যাভঞ্জন করে দিতেন। জটিল দার্শনিক প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, "তুমি বইতে পড়েছ—'সর্বদা সত্যকথা বলিবে; পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।'—এগুলি কাজে পরিণত করো।" বস্তুত, আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁকে ঘাঁটানো খুব কঠিন ছিল। তবে তিনি যখন বিশেষ ভাবস্থ থাকতেন, তখন এমন সব উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব সরলভাবে বলতেন যে লোকের মন পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং লোকে প্রচুর পরিমাণে চিন্তার খোরাক পেত। কেউ কেউ বা সারাজীবনের জন্য ভরপুর হয়ে যেত।

প্রায় দশ বছর ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে থাকার পর বিজ্ঞান মহারাজ মুঠিগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও জীবনযাপন-প্রণালী ও কঠোরতা পূর্ববৎ রইল। বিজ্ঞান মহারাজ সম্বন্ধে রাজা মহারাজ কত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন তা এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় ঃ "ওকে জানা-বোঝা ভারি শক্ত। সর্বদা ও নিজেকে গোপন রাখে, কিন্তু প্রসন্ন ব্রহ্মবিদ্। আত্মাকে জেনে হরিপ্রসন্ন নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।" যেসব তরুণ বিশেষ ধর্মপিপাসু, রাজা মহারাজ তাদের বিজ্ঞান মহারাজের সংস্পর্শে রাখবার জন্য এলাহাবাদ পাঠাতেন।

সাধারণত বক্তৃতা দেওয়া তাঁর রীতি ছিল না। যাঁরা অধ্যাত্মপিপাসু হয়ে তাঁর কাছে আসত, তিনি বিশেষ যত্ন করে তাদের শিক্ষা দিতেন।

তিনি বলতেন, "ভগবদ্দর্শনই মানবজীবনের সত্যকার উদ্দেশ্য, কারণ তাতেই প্রকৃত এবং স্থায়ী আনন্দ পাওয়া যায়। ধর্মপথে অহঙ্কার-অভিমানের মতো প্রবল প্রতিবন্ধকতা আর নেই। অর্থের বাহুল্য ও মানযশের আকাঙ্ক্ষায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায়, ফলে ধর্মলাভ হয় না, বরং অশান্তির উৎপত্তি হয়ে মানবের মহা-দুর্দশা ঘটে।"

একদিন এক ব্যক্তি বললেন, "দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এত সঙ্গিন এবং আর্থিক অনটন এত ব্যাপক—আমরা কী করে শান্তি পাব?"

উত্তরে মহারাজ বললেন, "বাইরের এই অশান্তির দিকে অতটা মনোযোগ কেন দিচ্ছ? তোমরা এখন যা চাইছ তা-ই যদি পাও, তাহলে কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? কখনোই নয়। বাহ্য সঙ্ঘর্ষে অশান্তির সৃষ্টি হয় না, বরং অন্তরের বাহ্যবিষয়ে আসক্তিই অশান্তির হেতু।"

বিজ্ঞান মহারাজের সরলতার তুলনা হয় না। ঐ সরলতার জন্যই তিনি অতিমাত্রায় স্পষ্টবাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্পষ্টভাষণে হুল না থাকায় লোকে অপমান বোধ করত না।

তাঁর এক ধনি-শিষ্য ভক্তির অর্ঘ্যস্বরূপ অনেকগুলি টাকার একটা তোড়া বিনীতভাবে তাঁকে উপহার দিলে তিনি বলেন, "আমার অনুমান, এই অর্থ নিরাপদে রাখার স্থান না পেয়ে তুমি এর দায়িত্বভার আমার ওপর অর্পণ করছ।" কথাটা কৌতুক করে বললেও, তাঁর পার্থিব সম্পদের ওপর কতটা অনাসক্তি ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

গরিবদের জন্য তিনি খুব ভাবতেন। উড়িষ্যার কয়েক জন গরিব-শিষ্য গুরুকে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য উপহার আনলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, "এরূপ করলে দীক্ষা দেওয়া বন্ধ করে দেব।"

এই মহান পুরুষকে কী বলে প্রশংসা করা যায়—তা বুদ্ধির অগম্য। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "প্রকৃত সাধুর যদি পাণ্ডিত্য ও বিদ্যা থাকে তবে হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হলে যেমন হয় তদ্রূপ।" বিজ্ঞান মহারাজ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাদি পাঠে তা সহজেই অনুভূত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও জ্যোতিষ-বিষয়ে গ্রন্থাদি ছাড়াও 'দেবী ভাগবত' নামক বৃহৎ পৌরাণিক গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। জীবনের শেষদিকে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ করছিলেন, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে; কতকটা ছাপা হয়েছে। বিপুল বিদ্যা, অগাধ বিনয় ও বিশাল সাধুতার একত্র সমাবেশে এই মহাপুরুষ আমাদের দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন।

বেলুড় মঠের মন্দির তৈরি হচ্ছে, বিজ্ঞান মহারাজ দেখাশোনা করছেন। একদিন মন্দিরের নবনির্মিত খানিকটা অংশ ভেঙে নতুনভাবে করালেন। একজন বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী মন্দির তৈরি হচ্ছে, তা আপনি গড়া-জিনিস ভেঙে আবার গড়লেন কেন?"

বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর দিলেন, "স্বামীজীই আমাকে বললেন, 'এ জায়গাটা ওরূপ হবে না—ভাল দেখাচ্ছে না, এরূপ করো।' তাই আমি করেছি।"

তাঁর frankness অতুলনীয়। কখনও মন ও মুখ ভিন্ন ছিল না। এবিষয়ে কোনো আদবকায়দা, রীতিনীতি অথবা লোকে কী ভাববে বা বলবে—তিনি তার কোনো ধার ধারতেন না।

বেলুড় মঠে স্বামী শুদ্ধানন্দ রক্তচাপজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য বিজ্ঞান মহারাজ নিচে এলেন। তাঁকে দেখে বললেন, "ডাক্তারই আপনাকে মেরে ফেলবে দেখছি। ওদের কখনো বিশ্বাস করবেন না, আপনাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবে। ওষুধপত্র তো অনেক খেয়েছেন, আর ওষুধ খাবেন না—ওষুধে কিছুই হয় না।"

বেলুড় মঠে বিজ্ঞান মহারাজের শরীর একটু খারাপ হয়েছিল। পা-ও একটু ফুলেছিল। ডাক্তার দেখানোর কথায় তিনি বললেন, "আমার ডাক্তারের ওপর মোটেই বিশ্বাস নেই।"

সাধু ঃ খুব ভাল ডাক্তার। তিনি প্রায়ই মঠে আসেন।

মহারাজ ঃ তাঁর চেয়ে বড় ডাক্তার আছে?

সাধু ঃ হ্যাঁ আছে, নীলরতন সরকার।

মহারাজ ঃ তাঁর চেয়ে বড় কেউ আছে?

সাধু ঃ না, তাঁর চেয়ে বড় এখন আর কেউ নেই।

তখন মহারাজ বললেন, "একজন আছেন। তিনি হচ্ছেন ঠাকুর। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।"

সকলের সঙ্গে মহারাজের বন্ধুভাব বা ভাই-ভাই ভাব ছিল। এই ভাই-ভাই ভাব ছিল তাঁর স্বভাবগত—সকলেই সমতুল্য। কেউ প্রশ্ন করলে মহারাজ এভাবে উত্তর দিতেন—'আরে ভাই, মা কৃপা করে তপস্যা করিয়ে নিচ্ছেন, ঘাবড়াও কেন?', 'আরে ভাই, মায়ের কাজ মা-ই করিয়ে নেবেন। মনে-প্রাণে তাঁকে ডাকতে পারলে সব হয়ে যাবে।'

(উৎস ঃ গুরুদাস গুপ্তের ডায়েরি)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মহাপ্রয়াণ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

১৩ এপ্রিল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার। বেলা প্রায় এগারোটায় এলাহাবাদ মঠে পৌঁছিয়া মহারাজজীকে প্রণাম করিলাম। তিনি মঠবাড়ির ভিতরের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হইয়া একটি কালো চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে একটি টেবিল—বাম দিকে রাতে শোয়ার খাট। টেবিলের উপর একটি থলি, একটি ফাউন্টেন পেন ও একটি ওয়াচ। টেবিলের ধারে জলের চারটি কুঁজো, কুঁজোগুলিতে ঠান্ডা জল থাকে; ঐ জল মহারাজজী মাঝে মাঝে একটু পান করেন।

শরীর শুষ্ক ও শীর্ণ—গলার ও গালের হাড়গুলি দেখা যাইতেছিল। শরীরে মাংস ছিল না বলিলেই হয়, কেবল চামড়া ঝুলিতেছিল। হাঁটু হইতে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সব ফোলা। পেটটি বেশ বড় হইয়াছে। দেখিয়া মনে হইল যেন ছয় মাসের রোগী। অতিকষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলিতেছিলেন। গায়ে একটি সাদা কোট এবং নিম্নাঙ্গ একটি গেরুয়া কাপড়ে ঢাকা। চলিবার শক্তি ছিল না। এক মাস পূর্বে বেলুড় মঠে তাঁহার শরীর যেমন ছিল, তদপেক্ষা অনেক জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারা শক্ত।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও! খুব এসেছ তো।" পরে বলিলেন, "তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, কখনো-সখনো দরকার হলে একটু ব্যাঙ্কে যেতে হবে। যাও, স্নান করে আহারাদি করো ও বিশ্রাম করো। ঐ-বাড়িতে (পাশের বাড়িতে) গিয়ে থাকো।" বেণীকে বলিলেন, "ও-বাড়ির দরজা খুলে দাও।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার খাওয়া হয়েছে?" বলিলেন, "খাওয়াদাওয়া কী আর আছে! মঠ থেকে এসে এপর্যন্ত মাত্র এক দিন ভাত খেয়েছি। কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না আর ভালও লাগে না। তবে তুমি এসেছ, এবারে খাওয়া যাবে। একটু শুক্তোর ঝোল খেতে ইচ্ছা হয়।" বলিলাম, "বেশ তো, তা-ই করা যাবে।"

তারপর তিনি ঘরে বিশ্রাম করিতে গেলেন। একা চলিবার, উঠিবার বা বসিবার শক্তি ছিল না। বেণী তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ার হইতে উঠাইয়া ঘরের ভিতরে লইয়া যাইত এবং বিছানায় শোয়াইয়া দিত। যাইবার সময়ও তাঁহার মাথায় ভিজা গামছা ও গায়ে সাদা কোট। মহারাজজী যখন বিশ্রাম করিতেন তখন বেণী তাঁহাকে

বাতাস করিত। কোনো দরকার পড়িলে বেণীকেই ডাকিতেন। সে মহারাজজীর আদেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকিত।

বিশ্রামান্তে বেলা সাড়ে তিনটার সময় মঠবাড়িতে আসিয়া দেখি, তখনো মহারাজ ঘরের ভিতর বিশ্রাম করিতেছেন; বেণী বাতাস করিতেছে। একটু পরেই বারান্দায় আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। মাথায় ভিজা গামছা, গায়ে সাদা কোট। তিনি চেয়ারে বসিলে বেণী একটি গেরুয়া কাপড় তাঁহার কোমরের উপর দিল।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "মন্দিরের কাজ তো হয়ে গেছে?" বলিলাম, "হ্যাঁ মহারাজ, শেষ হয়েছে।" মহারাজজী বলিলেন, "ঠাকুরও তো মন্দিরে বসেছেন।" বলিলাম, "হ্যাঁ মহারাজ, আপনিই তো ঠাকুরকে বসিয়ে এলেন।" তখন তিনি বলিলেন, "ব্যস।" এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজজীর মুখের ভাব অন্যরূপ ধারণ করিল। তিনি যেন এক বিরাট দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন—এই ভাব প্রকাশিত হইল। সেই দিন হইতে মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত মন্দির-সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলেন নাই।

আমার পৌঁছানোর সংবাদ মঠে দেওয়ার জন্য একখানি পোস্টকার্ড চাহিয়া লইয়া লিখিলাম, "নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। মহারাজজী একপ্রকার আছেন।" সেইসময় মহারাজজী বলিলেন, "দেখি, কী লিখেছ।" পড়িয়া আর কিছুই বলিলেন না। পরদিন নরেনবাবুর বাড়ি হইতে মহারাজজীর অসুখের ও শরীরের বিস্তারিত সংবাদ লিখিয়াছিলাম।

এলাহাবাদ মঠের পিয়ন বড় মিঞা সেই দিন যে চাঁদা আদায় করিয়াছিল, মহারাজজী তাহা খাতায় জমা করিলেন। সন্ধ্যার পর বারান্দার খাটটিতে শুইয়া পড়িলেন; কিছুই আহার করিলেন না।

বেণীকে ঠাকুরঘর বন্ধ করিতে বলিলেন; আরো বলিলেন, "ও মহারাজকো খানা উনকো কোঠরী পর দে দেও। আউর কেওয়াড়ি বন্ধ করকে চলা যাও।" মহারাজজীর নির্দেশমতো দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসি। রাতে সেবাশ্রমের বাড়ি হইতে তাঁহার মুখনিঃসৃত 'মা, মা' ধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

পরদিন সকালে তিনি বেণীকে ডাকিলে সে নিকটে গেল। সাতটার সময় গিয়া দেখিলাম, মহারাজজী পূর্ববৎ চেয়ারে বসিয়া আছেন; বলিলেন, "ঠাকুরঘর খুলে দাও।" ঠাকুরঘর খুলিয়া দিলাম। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাধারণত কী খাও?" বলিলাম, "সাধারণ খাবার ছাড়া সকালে ও রাতে দুধ খাই।" ইহা শুনিয়া বেণীকে বলিলেন, "উনকো ওয়াস্তে আধা সের দুধ ইন্তেজাম করনে হোগা।"

পরে তিনি এক কাপ চা খাইয়া বলিলেন, "এই থলি থেকে পয়সা নাও। ভাল রুইমাছ ও ভাল মিষ্টিদই আনবে। মাছের ঝোলভাত ও দই খাবে। এটা গরম দেশ, এতে শরীর ঠান্ডা থাকবে। বাজারে যাওয়ার সময় বড় মিঞা বা বেণীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কখনো একলা যাবে না। এখানে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি-কাটাকাটি হচ্ছে—খুব সাবধানে চলবে। যেখানে দু-তিন জন লোক একসঙ্গে দেখবে, সেখান দিয়ে যাবে না—অন্যপথে যাবে।

"পেতোর (নরেনবাবুর) বাড়ির পাশে ভাল মাছ পাওয়া যায়। যাও, সেখান থেকে মাছ ও দই নিয়ে এসো।" থলি হইতে পয়সা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল শুক্তোর কথা বলছিলেন?" মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু শুক্তো করো না, বেশ তো।" বলিলাম, "আপনি খাবেন তো?" বলিলেন, "তা একটু ঝোল খাওয়া যাবে।" বাজার করিয়া আনিলাম। রান্নার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "রান্না হয়েছে, এখন খাবেন?" বলিলেন, "তুমি খেয়ে বিশ্রাম করো। আমি পরে খাব, আমার জন্য খাবার রেখে দাও।" ঘরের ভিতর শুইতে গেলেন। বেণী তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, "ঠাকুরঘর বন্ধ করো।" তখন বেলা এগারোটা।

বিকালে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "আচ্ছা, একটু শুক্তোর ঝোল দাও।" একটি কাপে একটু ঝোল দিলাম। সামান্যই খাইলেন। পরে বাজারের হিসাব লইলেন ও সংগৃহীত চাঁদার টাকা জমা করিলেন। সন্ধ্যার পর শোয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেণী বারান্দার খাটে বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দিল। মহারাজজী শুইয়া শুইয়া কেবল বলিতেছেন, "চলোজী, চলোজী।" নিত্যই সন্ধ্যার পর এইরূপ বলিতেন। দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসি। সারারাত মহারাজ একা থাকিতেন ও 'মা, মা' করিতেন। রাতে খুব কমই ঘুমাইতেন।

পরদিন সকালে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ, কেমন আছেন?" বলিলেন, "ভালই আছি।" বলিলাম, "ঘুম হয়েছিল?" বলিলেন, "ঐ একরকম!" প্রত্যহ সকালে বলিতেন, "বাজার থেকে ভাল মাছ প্রভৃতি এনে রান্না করো।" জিজ্ঞাসা করিতাম, "আপনি খাবেন তো?" বলিতেন, "হ্যাঁ, খাব।" কিন্তু খাওয়া আর হইত না। সারাদিন মাঝে মাঝে একটু একটু ঠান্ডা জল খাইতেন। দুই দিন আধ কাপ ঘোল খাইয়াছিলেন। একদিন এক কাপ লেমনেড খাইয়াছিলেন।

বেলুড় মঠে তাঁহাকে বাথগেট কোম্পানির লেমনেড খাইতে দেওয়া হইত।

সেই লেমনেড খাইবেন কি না জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "সবই একরকম— লেমনেড বলো আর যাই বলো।" ঠান্ডা জলই ছিল তাঁহার একমাত্র পানীয়— তাহা-ও বেশি নয়, সারাদিনে হয়তো জোর এক কাপ। তবে প্রত্যহ সকালে এক কাপ চা খাইতেন।

দুই-এক জন ভক্ত প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় দর্শন করিতে আসিতেন। কেহ কেহ মাছ, দই আনিতেন। মহারাজ ঐসব ভালবাসিতেন; কিন্তু তিনি ঐসব গ্রহণ করিতেন না। ভক্তদের সহিত মহারাজজীর বিশেষ কথাবার্তা হইত না; সকলেই তাঁহার ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিতেন, এমনকী সেবকগণ পর্যন্ত।

চিকিৎসার জন্য জনৈক ভক্ত একজন ভাল কবিরাজের কথা বলিলেন। মহারাজজী বলিলেন, "ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং, বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।" ভক্তটি পুনরায় নিবেদন করিলেন, "আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে, যাকে বলবেন তাকেই আনব।" কোনো জবাব না দিয়া মহারাজজী তাঁহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য হাতে ইশারা করিলেন। ভক্তটি প্রণামান্তে বিষণ্ণমনে বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার পর মহারাজ শুইয়া পড়িতেন। প্রায়ই বলিতেন, "আর কেন মা, আর তো মাত্র কটা দিন বাকি।" একদিন সকালে বশিষ্ঠানন্দ (সমর মহারাজ) লখনউ হইতে কিছু ভাল চিঁড়া ও মাগুর মাছ লইয়া আসিলেন। সেইগুলি দেখিয়া মহারাজ খুব খুশি হইলেন; কিন্তু তাঁহার খাওয়া আর হইল না। কিছুক্ষণ পরে সমর মহারাজ চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রণাম করিতেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যাবে, আবার কবে আসবে?" সমর মহারাজ বলিলেন, "যখনই ডাকবেন তখনই আসব।" মহারাজ এই কথার কোনো জবাব দিলেন না।

একদিন জনৈক ভক্ত একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশি আনিয়া বলিলেন, "এই ওষুধটি খুবই ভাল, খেলে নিশ্চয়ই উপকার হবে।" ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, ওখানে রেখে দাও, পরে খাওয়া যাবে।" কিন্তু সে ঔষধ আর খাওয়া হয় নাই। পরদিন ঐ ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ ইশারায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

অপর একদিন জনৈক ভক্ত এক ঠোঙা বাতাসা ও গোলাপ ফুলের একটি মালা লইয়া আসিলেন। বাতাসা ঠাকুরঘরে রাখিয়া মালাটি লইয়া মহারাজজীর নিকটে আসিতেই মহারাজজী মালাটি তাঁহার গলায় পরাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ভক্তটি গুরুদেবের গলায় মালা পরাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

১৭ এপ্রিল তাঁহার অনূদিত রামায়ণের প্রুফ প্রেস হইতে আসিল। তাহা তিনি লইলেন এবং সংশোধন করিলেন।

১৮ এপ্রিল বিকালে হরিদ্বার কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাগত শ্রীহট্টবাসী জনৈক ভক্ত কাশীর একজন সন্ন্যাসীর পত্রসহ উপস্থিত হইলেন। মহারাজ পত্রখানি সেবককে পড়িতে বলিলেন। ভক্তটি মহারাজজীর নিকট দীক্ষাপ্রার্থী। ভক্তটিকে মহারাজ বলিলেন, "এখানে জায়গা নেই। পাশেই কালীবাড়ি—সেখানে গিয়ে থাকো। হোটেলে খাওয়াদাওয়া করো, এখানে রান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই। কাল সকালে যমুনায় স্নান করে আসবে, সাড়ে নটার সময় দীক্ষা হবে।"

ভক্তটি বলিলেন, "আজ রাত্রিটা মঠে থাকব। কালই কাশী চলে যাব।" মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা, ঐ বাড়ির হলঘরে থাকো আর হোটেলে খাওয়াদাওয়া করো।" ভক্তটি সম্মতি জানাইয়া প্রণাম করিলেন।

১৯ এপ্রিল, মঙ্গলবার। চাকর মারফত সেবককে তখন তাঁহার নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। সেবক মনে করিল, বোধ হয় ভক্তটিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। সেবক প্রত্যহ সকালে যেমন যায় তেমনি মহারাজজীর নিকট গিয়া প্রণাম করিতেই মহারাজ বলিলেন, "এখন যাও।" একটু পরেই ডাকিয়া ঠাকুরঘর খুলিতে বলিলেন।

চা খাইবার পর মহারাজ বেণীকে বলিলেন, "গঙ্গাজল, ফুল, বেলপত্তি সব ইন্তেজাম করো।" তিনি চেয়ারে সোজা হইয়া বসিলেন। ভক্তটিকে বসিতে ইশারা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালা কোথায়? জপের মালা এনেছ?" ভক্তটি বলিল, "না, মহারাজ।" মহারাজ বলিলেন, "যাও, চক থেকে মালা কিনে নিয়ে এসো।" সেবকের পরামর্শমতো ভক্তটি বলিলেন, "এখন সময় নেই, পরে ব্যবস্থা হবে।" মহারাজ আর কিছুই বলিলেন না।

ভক্তটিকে কোশা হইতে জল লইয়া আচমন করিতে বলিলেন। দীক্ষার কার্য আরম্ভ হইল। আশ্চর্যের বিষয়, দীক্ষাকালে মহারাজজীর গলার স্বর ও চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া গেল। তখন তাঁহাকে অসুস্থ বলিয়া বোধ হইল না। বেশ জোরে স্পষ্ট করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ও অন্যান্য উপদেশ দিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা তাঁহার ঐ ভাব ছিল। ইহাই মহারাজজীর শেষ দীক্ষাদান। বেলুড় মঠে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "যেপর্যন্ত শরীরে একটু শক্তি থাকবে সেপর্যন্ত যে আসবে, তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে দেব।" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

দিন দিন মহারাজ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িতেছেন। কাশীতে ও বেলুড় মঠে সংবাদ প্রেরিত হইল। ২১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শোয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বেণী বিছানা করিয়া দিল। তিনি কেবল বলিতে লাগিলেন, "চলোজী, চলোজী।" এইভাবে কিছুক্ষণ চলিল। নিজেই চেয়ার হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেও পারিতেছিলেন না। বেণী ধরিতে গেলে বলিলেন, "আরে ঠ্যারো।" আবার বলিলেন, "চলোজী।" একটু পরেই সেবককে দেখাইয়া বেণীকে বলিলেন, "উনকো বুলাও।" সেবক আসিল। উভয়ে তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। রাত্রি পূর্ববৎ কাটিল। আদৌ ঘুম হইল না—কেবল 'মা, মা' ধ্বনি।

পরদিন ২২ এপ্রিল, শুক্রবার। মহারাজকে খুবই ক্লান্ত দেখা গেল। মুখে কেবল 'মা, মা' রব। বেণী ও সেবক পরপর বাতাস করিল। দুই বার বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু দুই বারই শুইয়া পড়িলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে উঠিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসানো হইল। একটু চা খাইলেন। বেলা সাড়ে দশটায় ঘরে শুইতে গেলেন। ঠাকুরঘর বন্ধ করিতে বলিলেন।

সেই দিন তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইবার বা বসাইবার সময় বোঝা গেল, মহারাজজীর নিজের নড়িবার শক্তি আদৌ নাই। এই পর্যন্ত ডাকের চিঠিপত্র দেখিয়াছেন, মনি-অর্ডারও সই করিয়াছেন। পূর্বদিন পর্যন্ত বাজারের হিসাব ও চাঁদার টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ আর ওসব করেন নাই।

বড় মিঞা বাড়ি যাওয়ার জন্য ছুটি চাহিলে বলিলেন, "আভি মত্ যানা, দো রোজ বাদ যানা।" বড় মিঞা বলিল, "নেহীজী, বহুতহী জরুরি হ্যায়। দো রোজকে ওয়াস্তে যাতে হ্যঁায়।" মহারাজ তাহাকে ইশারায় সম্মতি জানাইলেন।

সেই দিনও সন্ধ্যায় শোয়ার পর কেবল বলিতেছেন, "চলোজী, চলোজী।" সেবকগণ রাত আটটায় দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। অতি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত 'মা, মা' শব্দ শোনা গেল—বাহির হইতে শোনা যাইত না, শব্দ শুনিবার জন্য দেওয়ালের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। মহারাজজীর অজ্ঞাতসারে ঘরের বাহিরে শোয়ার সাহস হয় নাই, পাছে তিনি বিরক্ত হন।

২৩ এপ্রিল, শনিবার। সকালে বেণীকে আর ডাকিলেন না। পূর্বদিন পর্যন্ত বেণীকে ডাকিয়াছেন। বেণী নিজেই মহারাজজীর ঘরে গেল। একটু পরে সেবকও গেল। তাহারা দেখিল, মহারাজ চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন। নড়িবার শক্তি নাই। অতি ক্ষীণস্বরে 'ওঃ, ওঃ' করিতেছেন। কখনো 'মা, মা' বলিতেছেন।

বেণী বাতাস করিতে লাগিল। বেলা আটটায় তাঁহাকে বারান্দায় বসাইয়া দেওয়া হইল। একটু চা খাইলেন। কিছুক্ষণ পরে ইশারায় ঘরে শুইতে যাইবেন জানাইলেন। তাঁহাকে ধরিয়া ঘরে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। ঘরে যাইবার সময় ঠাকুরঘর বন্ধ করিতে বলিলেন। তখন বেলা নয়টা।

বিকাল চারটায় সেবক গিয়া দেখিল—মহারাজ বিছানায় শুইয়া আছেন ও বেণী বাতাস করিতেছে। সেই দিন তাঁহাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাইতেছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই 'চলোজী, চলোজী' বলিতে লাগিলেন। বেণী ধরিতে যায় ও সেবককে ডাকিতে থাকে। সেবক দরজার নিকট আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ হ্যায়?" সেবক বলিল, "আমি —।" মহারাজ বলিলেন, "ভাগো হিঁয়াসে।" সেবক চলিয়া যায়, কিন্তু দুই-তিন বার চেষ্টা করিয়াও বাহিরে আসিতে পারিলেন না, অগত্যা ঘরেই শুইয়া পড়িলেন।

মহারাজজীর ঘরটি গুদামঘরের মতো হওয়ায় বাতাস প্রবেশের সুযোগ ছিল না, তাহাতে আবার গ্রীষ্মকাল! সেবক ও বেণী সেই রাতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘরে খুব সাবধানে রহিল, যাহাতে মহারাজজী জানিতে না পারেন। উভয়েই তাঁহার খাটের দুই পাশ হইতে বাতাস করিতেছিল। বাম পাশে ফিরিলে সেবক বাতাস করিত আর ডান পাশে ফিরিলে বেণী বাতাস করিত। এইভাবে রাত তিনটা বাজিল। তখন মহারাজজী একটু ঘুমাইলেন।

সমর মহারাজ সেই দিন লখনউ হইতে আসিয়াছেন। সেবক ও বেণী চলিয়া যাইবার পর তিনি বাতাস করিতে লাগিলেন। অন্য কোনো সাধু আশ্রমে ছিলেন না। মঠে ও কাশীতে সংবাদ পাঠাইলাম ঃ আপনারা শীঘ্র আসুন। মহারাজজীর অবস্থা খুবই খারাপ যাইতেছে।

২৪ এপ্রিল, রবিবার। সকালে অর্ধনিমীলিতনেত্র হইয়া আছেন। এই অবস্থা দেখিয়া সেবাশ্রমের ডাক্তার লালজী মহারাজজীর নাড়ি দেখিয়া বলিলেন, "বহুত দুবলা মালুম হোতা হ্যায়, ঔর কুছ নেহি।" প্রত্যহ 'চা খাব' বলিতেন—সেই দিন চা খাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই ঐ অবস্থায় 'হুঁ' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। বেণী চা করিয়া আনিল। বসিয়া চা খাইবার ক্ষমতা মহারাজজীর ছিল না—শুইয়া শুইয়া খাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অর্ধেকের বেশি মুখ হইতে পড়িয়া গেল—এইভাবেই নিস্তব্ধ রহিলেন।

বেলা প্রায় দশটার সময় কাশী হইতে স্বামী শর্বানন্দজী, ওঙ্কারানন্দজী, রঘুবরানন্দজী ও সত্যাত্মানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় বেলা বারোটায়

স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দজী হরিদ্বার হইতে আসিলেন। বাঁকুড়ার মহেশ্বরানন্দজীকে তার করা হইল—মহারাজজীর চিকিৎসার জন্য।

সেই দিন মহারাজজীর অবস্থা খুবই খারাপ বোধ হইল। এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার ললিতমোহন বসুকে ডাকা হইল। ললিতবাবু মহারাজজীর বন্ধু মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের পুত্র। তিনি মহারাজজীকে পরীক্ষা করিয়া 'এপিডেমিক ড্রপসি' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এলাহাবাদ হইতে কাশী মোটর গাড়িতে চার ঘণ্টার পথ। সেইখানে সেবাশ্রমে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে, তাই সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে কাশী লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করিতেই মহারাজ বলিলেন, "তোমরা যাও।"

সেই দিন মহারাজজীর শরীরের তাপ ছিল ১০১°। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ানো তো দূরের কথা, ঔষধের নাম পর্যন্ত তাঁহার নিকটে করা যাইত না। 'জল খান' বলিয়া দুই বার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ানো হয়। মাঝে মাঝে একটু গ্লুকোজ দেওয়া হইল। সারাদিন এইভাবেই কাটিল।

সাধুগণ সারারাত পালা করিয়া মহারাজজীর সেবা করিলেন। সেই রাতে খুব গরম থাকায় সারাক্ষণ মহারাজকে বাতাস করা হইল। রাতে 'মা, মা' শব্দ অস্পষ্টস্বরে মাত্র কয়েক বার শোনা গেল। রাত দেড়টায় বেণীকে ডাকিলেন। পিপাসার্ত মনে করিয়া বেণী জল আনিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই 'হুঁ' বলিয়া একটু জল খাইলেন।

মাঝে মাঝে হাত নাড়িতেন। বাম বা ডান হাত নাড়িয়া পাশ ফিরিবার ইচ্ছা জানাইতেন। পাশ ফিরাইতে তিন জনের প্রয়োজন হইত। এইভাবে মহারাজজীর জীবনের শেষরাত অতিবাহিত হইল।

২৫ এপ্রিল, সোমবার। মহাপ্রয়াণের দিন। সকালে মহারাজজীর শরীরের তাপ ছিল ১০১°। তাঁহাকে খুবই দুর্বল মনে হইল। সকাল হইতেই ধ্যানস্তিমিত নয়ন। চায়ের পরিবর্তে সকালে কমলালেবুর রস ও গ্লুকোজ দেওয়া হইল, সামান্য একটু খাইলেন।

বেলা প্রায় দশটায় কাশী হইতে ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহারাজকে দেখিবার জন্য আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন, মহারাজ?" মহারাজজী চোখ বুজিয়াই উত্তর করিলেন, "ভাল আছি।" ইহাই এই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত শেষবাক্য। তারপর আর কোনো কথাই বলেন নাই।

বেলা বারোটায় ডাক্তার মজুমদার কাশী ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "কোনো ভয়ের কারণ নেই। বারো ঘণ্টার মধ্যে কিছুই হবে না।" সেই দিন দুই জন মাদ্রাজি যুবক দীক্ষার জন্য আসিয়াছিল। মহারাজজীর ঐ অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ পর তাহারা চলিয়া যায়।

মহারাজজীর শরীরের তাপ ১০২° হইল। বেলা এগারোটায় গলায় ঘড়-ঘড় শব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। সেবক প্রথমে আঙুল দিয়া ও পরে চামচ দিয়া মহারাজজীর গলা সাফ করিল। গলা হইতে কফ বাহির হইল না—সবুজ রঙের সামান্য ফেনা মাত্র বাহির হইল। গলার শব্দ পূর্ববৎ হইতে লাগিল।

মহারাজকে সর্বদা বাতাস করা ও মাঝে মাঝে গ্লুকোজ দেওয়া হইতেছিল। বেলা দুইটায় শরীরের তাপ দেখা গেল ১০৩°। সেবক সকলকেই সংবাদ দিল যে, মহারাজজীর জ্বর বাড়িয়াছে। সেবকগণ তাঁহাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া বিছানা পরিষ্কার করিতেছিল, এমনসময় 'য়্যাঁ য়্যাঁ' শব্দ করিলেন।

মহাপ্রয়াণ আসন্ন বুঝিয়া সাধুরা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বার হইতে স্বামী অপূর্বানন্দজী কর্তৃক প্রেরিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল তাঁহার মুখে একটু দেওয়া হইল। তারপর মাত্র তিন বার মুখ নাড়িলেন। সকাল হইতেই তিনি ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত গম্ভীর। মহাপ্রয়াণের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মহারাজজীর পূর্ণ সংজ্ঞা ছিল।

সাধুগণ সমবেত হইয়া ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। এই মধুরধ্বনি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজজীর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল, তিনি মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন—তখন অপরাহ্ণ ৩.২০ মিনিট।

কিছুক্ষণের জন্য সাধু ও ভক্তগণ পুত্তলিকাবৎ নির্বাক ও নিস্পন্দ, কেহ তাঁহার পদপ্রান্তে আর্দ্রনেত্রে দণ্ডায়মান। সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে নূতন বস্ত্রাদিতে ভূষিত করিয়া চন্দন ও অগুরু ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা অপূর্ব সাজে সাজাইলেন।

কাশী ও বেলুড় মঠে মহারাজজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদ তারযোগে প্রেরিত হইল। রাত দশটায় কুড়ি জন সাধু-ব্রহ্মচারী মোটর বাসে আসিলেন। মহারাজজীর ঘরে বাতি ও ধূপ জ্বালা হইল। সাধুগণ কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া, কেহ ঘরে, কেহ উঠানে রাত কাটাইলেন। মহারাজজীর পায়ের ছাপ লওয়া হইল।

পরদিন ২৬ এপ্রিল, মঙ্গলবার। সকালে বাঁকুড়া হইতে স্বামী মহেশ্বরানন্দজী আসিলেন। হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ-ফেরত আরো সাধু আসিলেন। বেলা আটটার সময় বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট খাটে তাঁহার তপঃপূত দিব্যদেহ রাখা হইল। খাটটির উপর একটি চাঁদোয়া খাটাইয়া নানা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল।

অতঃপর সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ মিলিত হইয়া তাঁহার দিব্যদেহ শোভাযাত্রাসহ পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণীসঙ্গম অভিমুখে লইয়া চলিলেন।

যমুনার তীরে খাটের চারিদিকে সকলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কীর্তন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও মহারাজজীর মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতিঃ লক্ষিত হইতেছিল। যমুনার তীর হইতে ত্রিবেণীসঙ্গমে বৃহৎ বজরাযোগে যাইবার সময় যমুনাতীরবর্তী নর-নারীর মনে হইতেছিল, যেন কোনো দেবপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য ত্রিবেণীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ত্রিবেণীসঙ্গমে মহারাজজীর দেহকে স্নান করানো হইল। ফুল, চন্দন, আতর ও নানা সুগন্ধি তৈল মাখানো হইল এবং নূতন গৈরিক বস্ত্র পরানো হইল। পরে পূজা ও আরতি করা হইল।

অতঃপর পূতদেহ প্রস্তরনির্মিত সুদৃশ্য শবাধারে ভালভাবে শোয়াইয়া উহার মুখ বন্ধ করা হইল। ঠিক ত্রিবেণীসঙ্গমে নৌকা রাখিয়া 'জয় শ্রীগুরু মহারাজকী জয়' এই ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে পুণ্যদেহ সলিল-সমাধি দেওয়া হইল। যে পুণ্যতীর্থে এই মহাপুরুষ ত্রিবেণীদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবীক্ষেত্রেই তাঁহার স্থূলশরীর বিসর্জিত হইল। ব্রহ্মজ্ঞ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের ভৌতিক দেহ তাঁহার সাধনপুরী সিদ্ধপীঠ প্রয়াগধামে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। পড়িয়া রহিল তাঁহার জীবন ও সাধনার পুণ্যকাহিনি, পড়িয়া রহিল মহাপুরুষের দিব্যপ্রসঙ্গ।

(উৎস ঃ দিব্যপ্রসঙ্গে)

মহাসমাধি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গত ২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার, অপরাহ্ণ ৩.২০ মিনিটে এলাহাবাদ মুঠিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সত্তর বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন।

গত ৮ মার্চ তিনি বেলুড় মঠ হইতে এলাহাবাদে যান। সেইখানে যাইবার পরই তাঁহার শরীর ক্রমেই অধিকতর খারাপ হইতে থাকে। মঠের সন্ন্যাসিগণ ও তাঁহার অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চিকিৎসার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। তিনি কোনোপ্রকার চিকিৎসা করাইতে সম্মত ছিলেন না। আপনার দেহের প্রতিও তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার নিকট আপন ইচ্ছা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস তিনি বেরিবেরি রোগে ভুগিয়াছিলেন। শেষদিকে তাঁহার উদরীর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং তাহাতেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ হয়। দেহত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার দেহাবসানের সময় স্বামী শর্বানন্দ, স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী রঘুবরানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নশ্বরদেহ শোভাযাত্রা সহকারে পুণ্যক্ষেত্র ত্রিবেণীসঙ্গমে নীত হইয়া একটি প্রস্তরনির্মিত সুদৃশ্য শবাধারে পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তিনি এটাওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তদবধি তিনি তাঁহার বন্ধু শশী ও শরতের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ) সহিত প্রায়ই দক্ষিণেশ্বর যাইতেন।

তিনি পুনা হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিয়া ক্রমশ পদোন্নতির মাধ্যমে যুক্তপ্রদেশে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ গ্রহণ করেন। সেইসময় তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি চিরতরে সংসার পরিত্যাগ করিয়া ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে আলমবাজার মঠে যোগদান করেন।

পূজনীয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ মঠে যোগদানের প্রথম হইতে মঠের গৃহাদি নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণ করিবার

সঙ্কল্প করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে বিস্তারিত নির্দেশ দান করেন। তদানীন্তন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গুয়ইথারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মন্দিরের একটি নক্সা প্রস্তুত করিলে স্বামীজী তাহা অনুমোদন করেন। এই নক্সার উপর ভিত্তি করিয়াই বেলুড় মঠের বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। গত মকরসংক্রান্তি দিবসে (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে) তিনি বেলুড় মঠের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ নামক স্থানে মঠ ও সেবাশ্রম স্থাপন করেন। তিনি 'জল সরবরাহের কারখানা', 'ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা' প্রভৃতি বাংলা পুস্তক প্রণয়ন এবং 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত' বাংলাতে ও 'দেবী ভাগবত' ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ইহার কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচরগণের প্রায় সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রেরণালাভের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিলেন। তাঁহার শূন্যস্থান কখনো পূর্ণ হইবার নহে। এই মহাপুরুষের পবিত্র জীবন, জ্বলন্ত বৈরাগ্য, তিতিক্ষা এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই প্রার্থনা।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৪০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

ঠাকুরকে যখন প্রথম ভালভাবে দেখি তখন আমার বয়স চোদ্দো-পনেরো বছর। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়িতে খেলা করছি, এমনসময় আমাদের আরেক বন্ধু এসে বলল, "তোরা পরমহংসকে দেখতে যাবি?"

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি কোথায় থাকেন?"

সে বলল, "এই তো কাছেই দেওয়ান-বাড়িতে তিনি এসেছেন।"

আমাদের ধারণাই ছিল না যে পরমহংস কাকে বলে বা পরমহংস কী। যাহোক আমরা তিন জনে দেওয়ান-বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

যখন আমরা দেওয়ান-বাড়িতে ঢুকছি, সমবেত সঙ্গীতের লহরি কানে এল। আমরা এক আশ্চর্য পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হলাম। বেশ কয়েক জন ভক্ত গান করছেন। ঠাকুর সকলের মাঝখানে দণ্ডায়মান, চারিদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেসবে যেন তাঁর কোনো বোধ-ই নেই। তাঁর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় দ্যুতি, ঠোঁটে ভুবন-ভোলানো হাসি ও চোখদুটি যেন অপার্থিব কিছু দেখছে। তাঁকে দেখে মনে হলো যেন আনন্দের সমুদ্রে ডুবে আছেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও মায়ের নাম-গান করলেন। গাইতে গাইতে তিনি যেন ভাবসমুদ্রে একেবারে মগ্ন হয়ে গেলেন। আমার যেন মনে হলো, বিশ্বমাতাকে তিনি গান শোনাচ্ছেন। গান শেষ হওয়ার পর তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের দেওয়ানমশাই দোতলায় নিয়ে গেলেন। আমরা যে-যার বাড়ি ফিরে গেলাম। মণি মল্লিকের বাড়িতে আরেক বার ঠাকুরকে দেখেছিলাম, সঙ্গে ছিল আমার সহপাঠী শরৎ (পরবর্তিকালে স্বামী সারদানন্দ)। বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেল। তখন সতেরো-আঠারো বছর বয়স হবে—কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম ঠাকুরকে দেখতে। সময় দ্বিপ্রহর, কয়েক জন ভক্ত তাঁর ঘরে বসে আছেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এককোণে বসলাম। একটা ছোট খাটে বসে তিনি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কথা বলছেন। শরীরের গঠন একজন সাধারণ মানুষের মতো, কিন্তু তাঁর হাসিটি স্বর্গীয়। যখন তিনি হাসছেন, যেন আনন্দের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। সে আনন্দতরঙ্গ

তাঁর চোখ-মুখ ছাড়িয়ে যেন দেহের সমস্ত অঙ্গ-ভঙ্গে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই হাস্য-বিভা তাঁর সামনে বসে থাকা সমস্ত মানুষের সমস্ত দুঃখ-চিন্তা যেন দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। তাঁর চোখদুটি নয়নাভিরাম—উজ্জ্বল অথচ কোমল এবং স্নেহভরা।

আমি অনুভব করলাম, ঠাকুরের ছোট ঘরটি যেন ঘনীভূত শান্তির মাধুর্যে ভরপুর। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর কথামৃত, ঈশ্বরকথা ও উপদেশ স্থির-নিস্পন্দ হয়ে শুনছেন। তিনি কী বলেছিলেন, এখন আর তা স্মরণে নেই। কিন্তু যে শাশ্বত আনন্দ-স্পর্শের ছোঁয়া সে-দিন পেয়েছিলাম, তা যেন আমার কাছে চিরনূতন হয়ে আছে। তাঁর দিকে সমস্ত মন-প্রাণকে কেন্দ্রীভূত করে অনেকক্ষণ সেখানে বসে ছিলাম। তিনি সরাসরি আমাকে কিছু বলেননি বা আমিও তাঁকে কোনো প্রশ্ন করিনি। এক-এক করে ভক্তরা সবাই চলে গেলেন। আমি একলা বসে আছি। ঠাকুর আমার দিকে চেয়ে আছেন। বুঝলাম, এবার যেন আমারও চলে যাওয়া উচিত। সেজন্য তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "কিগো, লড়াই করতে পার! এসো, কাছে এসো, দেখি কেমন লড্ডুয়ে।" এই বলে তিনি যেন আমায় ধরার জন্য কাছে এলেন। তাঁর এই ধরন-ধারণে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। মনে মনে ভাবলাম, এ কীরকম মহাপুরুষ! যাহোক, বললাম—"হ্যাঁ, আমি লড়তে জানি।" হাসতে হাসতে তিনি কাছে এসে আমার কাঁধ-দুটো ধরে বেশ জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। তখন আমি পূর্ণযুবক, গায়ে বেশ জোর। তাঁকে দেওয়ালের দিকে একটু ঠেলে দিলাম। তখনো তিনি হাসছেন, আর আমাকে শক্ত করে ধরে আছেন। মনে হলো যেন তাঁর হাতদুটো থেকে বিদ্যুৎ-শক্তির মতো তরঙ্গের পর তরঙ্গ আমার সমস্ত শরীরে প্রবেশ করছে। সেই স্পর্শ যেন আমার সমস্ত শরীরকে অবশ করে দিল। এক দিব্য আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। শরীরের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি আমায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, "বেশ বেশ, তুমিই তো জিতলে।" এই বলে তাঁর খাটে গিয়ে বসলেন। আমার মুখ দিয়ে তখন কোনো কথা বেরুচ্ছে না। সমস্ত সত্তা যেন আনন্দের সমুদ্রে ভাসমান—এক অনির্বচনীয় শক্তির স্পর্শ যেন আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর, ঠাকুর উঠে এসে আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "এখানে মাঝে মাঝে আসবে।" আমাকে তিনি কিছু মিষ্টিপ্রসাদ দিলেন। তারপর আমি কলকাতা ফিরে গেলাম। বেশ কয়েক দিন সেই দিব্যভাবে পরিপূর্ণ ছিলাম। বেশ বুঝলাম, তিনি কৃপা করে আমার মধ্যে অধ্যাত্মশক্তি চালনা করে দিয়েছেন। মনে হলো, তিনি আমায় সব দেবেন—কত দয়া তাঁর!

আমরা কে কেমন আছি, তার খবরাখবর তিনি সবসময় রাখতেন। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছে না গেলে, অন্যদের জিজ্ঞাসা করে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ভক্তদের খোঁজখবর নিতেন। একবার বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি। একদিন লোক দিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে ঢুকতেই নালিশ-মাখানো স্নেহভরা স্বরে বললেন, "কিগো, কেমন আছ? তোমাকে অনেক দিন দেখিনি কেন? কী খবর তোমার?"

সত্যকথাই বললাম, "আমার আসতে ইচ্ছা হয়নি।" ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশ বেশ! তা, তুমি ধ্যানের অভ্যাসটা রেখেছ তো?" আমি বললাম, "চেষ্টা তো করি, কিন্তু হচ্ছে কই।" ঠাকুর আমার কথায় আশ্চর্য হয়ে বললেন, "সেকী! তুমি ধ্যান করতে পারছ না? চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তিনি কিছু বলবেন ভেবে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। লক্ষ করলাম, তাঁর মুখাবয়ব ও চোখের ভাবের পরিবর্তন হলো। আমার দিকে একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন। আরো কিছুক্ষণ পর বললেন, "এসো, কাছে এসো।" তাঁর কাছাকাছি গেলে জিভ বার করতে বললেন। জিভ বার করলাম। তিনি জিভের ওপর আঙুল দিয়ে কী যেন লিখে দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড কম্পনের সৃষ্টি হলো। অনুভব করলাম, আমার সমস্ত সত্তা ও বোধের মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দ খেলা করে চলেছে। তারপর তিনি বললেন, "যাও, পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যান করো।" তাঁর আদেশানুযায়ী, সেই স্পর্শের আনন্দধারায় মাতালের মতো টলতে টলতে কোনোরকমে পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যান করতে বসলাম। সমস্ত বহির্জগৎ আমার কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। জানি না, কতক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক জগতে মন ফিরে এসেছিল। চোখ মেলে দেখলাম, ঠাকুর পাশে বসে আছেন। অতি স্নেহের সঙ্গে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর ঠোঁটে এক স্বর্গীয় হাস্যচ্ছটা। তখনো আমার ধ্যানের রেশ কাটেনি।

ঠাকুর ঃ কিগো, কেমন ধ্যান হলো?

আমি ঃ এবার খুব হয়েছে।

ঠাকুর ঃ এবার থেকে ধ্যান খুব জমবে। কিগো, কিছু দেখলে-টেখলে?

বিস্তারিতভাবে যতটা পারি সব বললাম।

তারপর তাঁর পিছন পিছন তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

সে-দিন তিনি আমার সঙ্গে কত কথা বললেন, অনেক আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলেন। অপার তাঁর দয়া, যার কোনো তুলনা হয় না। তাঁর অসীম ভালবাসার কথা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

কিছুদিন পর কলকাতা থেকে পাটনায় গেলাম। একরাতে যেন স্পষ্ট মনে হলো, তিনি আমার সামনে দণ্ডায়মান। ঠিক বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ কেন তাঁকে এভাবে দেখলাম। পরের দিন সকালে খবর পেলাম তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

একবার ঠাকুর একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা খুলে আমাকে পড়তে বললেন। তাতে লেখা আছে—'সর্বদা সত্য বলবে। সঞ্চয় করবে না, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করো।' একথা শুনে খুবই খুশি হলেন। কোনো কথা না বলে এমন একটি ভাব প্রকাশ করলেন যে স্পষ্ট বুঝলাম, এই তিন সত্য পালন করলে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। ঠাকুরকে আমি কোনো বই পড়তে দেখিনি বা পড়তেও কখনো কাউকে বলেননি। তিনি চাইতেন, ঈশ্বরকে অনুভব করে যেন আমরা আনন্দসাগরে অবগাহন করি।

ঠাকুর ছিলেন সত্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি; শিশুর মতো সরল। তাঁর কাছে গেলেই এই বোধ হতো যে—মানুষ বহির্জগতের আনন্দকে কেন আঁকড়ে ধরে, যখন সে-ই পারে শাশ্বত আনন্দকে খুঁজে নিতে! তিনি মনে করতেন, মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানকে পাওয়া এবং সেই চিন্তায় ও ভাবে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া। এই মায়াময় জগৎ থেকে মানুষ যদি মনকে সরিয়ে নিতে পারে, তবেই তার সত্য দর্শন হয়। সে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুতেই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের বিভূতিকে দেখতে পায়। মানুষ সবসময়ই কামনা-বাসনার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিচ্ছে। ভগবৎ-শক্তিকে সে ভুলে যায়, কারণ তার কামনা-বাসনা বহির্জগৎকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায়। কামনা ও বাসনাকে মোড় ঘুরিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হয়।

তিনি সবসময়েই ঈশ্বরীয় আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই এই পৃথিবীর কোনো কালিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তাঁর হৃদয় নিয়তই ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকত, আর সেই নেশায় তিনি সর্বদাই মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। তিনি বেদনা পেতেন এই ভেবে যে, ব্রহ্মানন্দের এই অপার্থিব বোধ কোনো কিছু বিচার না করে কেন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারছেন না; যদিও তিনি চাইতেন, প্রত্যেকেই এই আনন্দের অংশীদার হোক। ব্রহ্মানুভূতির আনন্দের

কাছে জগতের যতকিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ, সমস্তই যেন একমুঠো ধুলোর মতো মনে হয়। ঠাকুর সবকিছুর মধ্যেই সেই অনাদি ব্রহ্মের প্রতিভাত রূপ দর্শন করতেন। অন্যদিকে আমরা দেখি পৃথিবীকে শুধুমাত্র চোখে দেখার দৃষ্টি নিয়ে।

ঠাকুরকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তিনি সাকার-নিরাকার দুই-ই, আবার সাকার-নিরাকারের পারেও।" বললাম, "সবই যদি ঈশ্বর হন তবে এই খাটটাও কি তিনি?" ভাবের অনুভবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ গো, এই খাটটাও তিনি। এই যে ঘরে কাচ, বাসন, দেয়াল দেখছ, এসবও তিনি। সবকিছুই তিনি, সবকিছুতেই তিনি আছেন।"

এই কথাগুলি যখন তিনি বললেন তখন যেন আমার হৃদয় একমুহূর্তে ভাবজগতের উচ্চাবস্থায় চলে গেল; সেখান থেকে যেন দেখতে পেলাম, সবকিছুতেই সেই ব্রহ্মের আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিষয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ এক অতুলনীয় সত্তা। তাঁর যে তিনটি ছবি আছে, তার প্রত্যেকটাতেই কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণের চরমাবস্থার ভাব বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। মনে হয়, তিনি যেন শাশ্বত অনাদি সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবে আছেন। যখনই তাঁর ছবির দিকে তাকাই তখনই আমার হৃদয়ে নানারকম অধ্যাত্মবোধের অনুভূতি হয়। স্বামীজী ও রাজা মহারাজেরও এমনটি হতো, কিন্তু তাঁরা প্রকাশ করতেন না। একদিন ঠাকুর তাঁর একটি পট দেখিয়ে বললেন, "এঁকে ধ্যান করবে। আমি এর মধ্যে আছি।"

যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁদের সকলকে রক্ষা করবেন—তিনি তাঁদের জন্য সবকিছুই করবেন।

একদিন ঠাকুরের পদসেবা করছি, এমনসময় কোন্নগর থেকে এক ভদ্রলোক এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেলেন। ঠাকুর বললেন, "জানিস, মানুষের ভেতরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই—কাচের আলমারির মধ্যের সব জিনিস যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনি দেখতে পাই।" মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তো আমার ভিতরে কী আছে, না আছে সবই তিনি জানেন। এ তো বড় অদ্ভুত মানুষ! তিনি কখনো কারুর মন্দটা দেখতে পারতেন না, ভালটাই তাঁর চোখে পড়ত। আমরা তাঁর মধ্যে অতীতের সমস্ত পূর্ণসত্তার সমন্বয় অনুভব করেছি। প্রথম যখন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবারে রামকৃষ্ণরূপে এসেছে"—তখন কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। মনে মনে ভেবেছিলাম, এসব বাজে কথা। তবে এটা ঠিক যে—তিনি একজন সাধু, সজ্জন ও সৎ ব্যক্তি।

বেশ কিছুকাল পর—তখন আমি কলেজে পড়ি। ঠাকুর একদিন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলছেন, "যখন কৃষ্ণরূপে এসেছিলাম, রাখাল আর গোপীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কত খেলা করেছি!" তখন ঠাকুরের কথা মনে এতটুকু বিশ্বাসের রেখাপাত করেনি। তিনি যেন আমার সন্দেহকে বুঝতে পেরে গোপীদের উচ্চভাবের কথা সবিস্তারে ভাবস্থ হয়ে বলতে লাগলেন—গোপীরা কেমনভাবে প্রিয়সখা কৃষ্ণকে তাদের মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা—সমস্তই কোনো কিছুর হিসাব-নিকাশ না করে সমর্পণ করেছিল। এসব বলতে বলতে হঠাৎ তিনি বাক্যহারা হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। আমিও যেন তাঁর জ্যোতির্বৃত্তের, শক্তিবলয়ের অন্যতম একটি ভাব হয়ে এক অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। এই প্রথম বুঝলাম, গোপীপ্রেম কাকে বলে। সমস্ত সন্দেহ দূর হলো। ঠাকুর যখন সাধারণ অবস্থায় ফিরে এলেন, তখন তিনি যেন এক শিশু। তাঁর মুখে যেন বালগোপালের হাসি। বাস্তবিক, তিনি ছিলেন এক চিরন্তন শিশু। যেখানে কোনো মহৎ-সত্তা বিরাজমান, সেখানে একটি অধ্যাত্মশক্তির পরিমণ্ডল তাঁকে ঘিরে থাকে। যে সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে আসে, সে সেই সত্তায় উজ্জীবিত হয়। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারে যে, বিদ্যুৎ-শক্তির মতো এক সত্তা বা শক্তি তার অন্তরে প্রবেশ করে তার ভাবলোককে এক উচ্চগ্রামে নিয়ে চলেছে। এ এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি! একবার আমি যখন স্বামীজীর পাদস্পর্শ করি, তখন যেন সেই স্পর্শ বিদ্যুৎস্পর্শের অনুভূতি দিয়েছিল। মহারাজেরও (স্বামী ব্রহ্মানন্দেরও) ক্ষমতা ছিল অন্যের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চারিত করার। একদিন তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন, আমি তাঁর কাছে বসে আছি; অনুভব করলাম—এক আনন্দ-শক্তি যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করছে, আমি ধ্যানানন্দে বিভোর হয়ে গেলাম। অন্যের অজ্ঞাতেই এইরকমভাবে যিনি অধ্যাত্মশক্তি বিতরণ করতে পারেন, তিনি এক উচ্চাতি-উচ্চ জ্ঞানসত্তা। রাজা মহারাজ ছিলেন একদিকে অধ্যাত্মশক্তির এক প্রকাণ্ড আধার, আবার অন্যদিকে হাস্যরসের পরম রসিক। স্বামীজী ও মহারাজ ছিলেন অন্তর্মনের আকর্ষক দুই মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁরা অন্যদের আকর্ষণ করতেন তাঁদের অপরিমেয় মাধুর্যময় ভালবাসার মাধ্যমে। তাঁদের অধ্যাত্ম-পরিমণ্ডলের কাছাকাছি যাঁরা আসতেন, তাঁরা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে উন্নীত হতেন।

স্বামীজী ও মহারাজের মধ্যে একজনকে অন্য জনের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। নিজ নিজ অধ্যাত্মানুভূতির ক্ষেত্রে তাঁরা এক-একজন রাজাধিরাজ। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। স্বামীজীর আদর্শ ও কর্মকে মহারাজ বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। স্বামীজী জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু অন্তরে তাঁর ছিল চরম ভক্তি। মহারাজ ভক্তি ও উপাসনার কথা বলতেন, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী।

স্বামীজীর হৃদয় ছিল কোমল ও স্নেহে পরিপূর্ণ। আমাদের সকলের জন্য, সকল গুরুভাইদের জন্য, বিশেষ করে মহারাজের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। কী গভীর ভালবাসা! মহারাজের প্রতি স্বামীজীর ভাব ছিল—'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'।

বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে পোস্তা তৈরি হচ্ছে, আমি তার তদারক করছি। বেশ গরম পড়েছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছি। লক্ষ করলাম, দোতলার বারান্দায় বসে স্বামীজী সরবত পান করছেন। আমারও ইচ্ছা হলো ঠান্ডা সরবত পান করার। যেই আমার মনে এই ইচ্ছা জাগল, ফিরে দেখলাম—এক সেবক মারফত স্বামীজী এক গ্লাস সরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব খুশি হয়ে সরবত খেতে গিয়ে দেখি—গ্লাসটা প্রায় খালি, মাত্র কয়েক ফোঁটা সরবত গ্লাসের নিচে পড়ে রয়েছে। স্বামীজী আমার সঙ্গে এসময়ে এধরনের রসিকতা করছেন ভেবে মনে খুব কষ্ট পেলাম। যাহোক, ভাবলাম একজন মহাত্মা যখন তাঁর প্রসাদ পাঠিয়েছেন, সে যত অল্পই হোক না কেন, গ্রহণ করা উচিত। এই ভেবে সেই কয়েক ফোঁটা সরবত পান করলাম। কী আশ্চর্য! সেই কয়েক ফোঁটাতেই আমার সমস্ত তৃষ্ণার নিবারণ হয়ে গেল। দিনের শেষে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তখন বললেন, "সরবত পাঠিয়েছিলাম, খেয়েছ?" উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ, তাতেই আমার তেষ্টা মিটেছিল।" উত্তর শুনে স্বামীজী খুব খুশি।

একবার আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠল। ঠাকুর আমাদের বলতেন, সাধুরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে না, এমনকী তাদের ছবিও দেখবে না। বিশেষ করে তিনি আমায় বলেছিলেন, ভক্তিমতী হলেও কোনো নারীর মুখের দিকে চাইবে না। স্বামীজী কিন্তু সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন, বিদেশে মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন। এই নিয়ে ভাবতাম—স্বামীজী কী ঠাকুরের পথ ধরে চলছেন, না চলছেন না? একদিন তিনি ঘরে একলা রয়েছেন, সেই সুযোগে আমার সন্দেহের কথা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনতে শুনতে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, "পেসন, যত সোজা ভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ অত সোজা নন। জান, তিনি আমার অন্তর থেকে সমস্ত ভেদাভেদ ধুয়ে-মুছে শেষ করে দিয়েছেন! তাঁর কৃপায় বুঝেছি, আত্মার কোনো ভেদ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি সকলের জন্য এসেছিলেন। তিনি কী শুধু পুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য এসেছিলেন? তাঁর কৃপা জাত-পাত বিচার করেনি। তোমাকে তিনি যা বলেছেন তা তুমি বর্ণে বর্ণে মানবে, কিন্তু আমায় তিনি অন্য ভাব

দিয়েছেন। তিনি শুধু আমায় শিক্ষাই দেননি, এখনো আমার হাতটাকে মুঠো করে ধরে চালাচ্ছেন। তিনি যা করান—তা-ই আমি করি।"

স্বামীজীর প্রতি আমার সন্দেহ হয়েছিল বলে অনুতপ্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। স্বামীজী একটু হেসে বললেন, "মাতৃশক্তিই হচ্ছে সমস্ত শক্তির কেন্দ্রবিন্দু। এই শক্তিরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে এদেশেই হোক বা অন্য দেশে। দেখছ না, শ্রীশ্রীমা সেই ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য এসেছেন। এ তো সবে শুরু। সমস্ত পৃথিবীতে এই মাতৃশক্তি কালে এক বিরাট রূপ নেবে।"

বেলুড় মঠে আমি দোতলায় যে ছোট ঘরটাতে থাকতাম; রাতে শোয়ার সময় বারান্দার দিকের দরজা খুলে রাখতাম। স্বামীজী মাঝে মাঝে গভীর রাতে বারান্দায় পায়চারি করতেন। একরাতে তিনি বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করছেন আর গান গাইছেন—"আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে।" বারবার গানটি গাইছেন আত্মভোলা হয়ে, মাঝে মাঝে ভাবানন্দে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। দু-গাল বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসছে। ভোর হওয়া অবধি তাঁর এই গান চলল। আনন্দধারায় আমারও সমস্ত মন-প্রাণ প্লাবিত হয়ে গেল।[১]

(উৎস : উদ্বোধন ৯১তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

১ Vedanta Society of Southern California থেকে প্রকাশিত Vedanta and the West, March-April 1955 সংখ্যায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 'With My Master, Swamiji and Maharaj' লেখাটির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন রমানাথ ঘোষ।

পরিশিষ্ট—২

বিজ্ঞান মহারাজের ‘পরমহংস-চরিত’

অরুণকুমার বিশ্বাস

কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি পুস্তকের[১] বিষয়বস্তু বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৮৬৮-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ), যাঁকে ভক্তরা ‘বিজ্ঞান মহারাজ’ নামে অভিহিত করেছেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের আকাশে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মালি, তাঁর শিষ্যেরা এক-একজন উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষস্বরূপ। বিজ্ঞান মহারাজের চরিত্র-সৌরভে সত্যই রামকৃষ্ণ-কানন আমোদিত।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কয়েকটি জীবনী-গ্রন্থ[২] প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু উপাদানের অভাবে এখনো অনেক ফাঁক, শূন্যস্থান রয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান মহারাজের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাবলির উপযুক্ত আলোচনা এবং অনুশীলন হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ—হিন্দি ‘পরমহংস-চরিত’ তো একরকম অনাদৃত—রামায়ণের ঊর্মিলা চরিত্রের মতো ‘কাব্যে উপেক্ষিতা’।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের চতুর্থ সংস্করণের ‘প্রকাশক কা নিবেদন’-এ স্বামী ধীরাত্মানন্দ লিখেছেন, “পরমহংস-চরিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব কে সন্ন্যাসি-শিষ্য দ্বারা লিখিত সবসে প্রথম রামকৃষ্ণ-জীবনী হৈ।” স্বামী সারদানন্দের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’-এর প্রথম খণ্ড (তৃতীয় ভাগ), ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়; অতএব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণজীবনী প্রণয়নে এবং উপদেশ সঙ্কলনে সন্ন্যাসি-শিষ্যদের মধ্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সর্বপ্রথম। এবিষয়ে হিন্দি সাহিত্যে বিজ্ঞান মহারাজেরই একমাত্র রচনা আছে। উপদেশ-সঙ্কলনেও

---

১ Swami Vijnanananda and His Paramahamsa Charita. Translated and Annotated by Arun Kumar Biswas, July 1994, Sujan Publication, 7B Lake Place, Calcutta-700 029

২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ; সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ জীবন ও বাণী—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ; প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস এবং জ্যোতির্ময় বসুরায় (সম্পাদিত), ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ; শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ বিজ্ঞানানন্দ—জ্যোতির্ময় বসুরায়, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

মহারাজের নৈপুণ্য বিশেষ লক্ষণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থনা করেন।

বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বামী ধীরাত্মানন্দ ব্যতিরেকে আর কেউই ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগে উপরি-উক্ত তথ্যগুলি অনুধাবন করেননি। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছিলেন যে, 'পরমহংস-চরিত' সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর হিন্দি অনুবাদ। এই ধারণাই ভক্তমণ্ডলীতে বলবৎ রয়েছে। ফলত, বর্তমান লেখকের কাছে কয়েক জন প্রাচীন সন্ন্যাসী সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেন, 'পরমহংস-চরিত' মৌলিক রচনা কি না।

হিন্দি গ্রন্থটিতে সুরেশচন্দ্র দত্তের বইয়ে অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট তথ্য নিঃসন্দেহে রয়েছে, আবার অনেক তথ্য আছে যা সুরেশবাবুর উক্ত গ্রন্থে নেই। 'পরমহংস-চরিত' বইটির প্রথম সংস্করণের (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) ভূমিকায় বিজ্ঞানানন্দজী নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, সুরেশবাবুর বই ছাড়াও বাংলা ভাষায় রচিত আরো কয়েকটি গ্রন্থের সহায়তায় এই পুস্তকের সঙ্কলনকর্ম করা হয়েছে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও কিয়দংশে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, অথচ একথা বিজ্ঞান মহারাজ ভূমিকায় লেখেননি, নিজেকে সঙ্গোপন করে রেখেছেন। উত্তরকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে উৎসুক ভক্তগণের কাছে তিনি অনেক স্মৃতিচারণা করেছেন। বিজ্ঞান মহারাজ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে 'পরমহংস-চরিত' বর্ধিত কলেবরে লিখিত হবে। কিন্তু সতীর্থ এবং গুরুভাই স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশিত হলে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর ইচ্ছা সম্বরণ করেন।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে যখন হিন্দি গ্রন্থটির ইংরেজিতে অনুবাদকার্যের সূত্রপাত হয়, তখন কয়েক জন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন সন্ন্যাসী সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, একটি অনুবাদগ্রন্থের (!) অনুবাদকার্যের কোনো সার্থকতা আছে কি না। ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদ আশ্রম, বেলুড় মঠ, উদ্বোধন কার্যালয় এবং অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃপক্ষ বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করেন। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে ইংরেজি পাণ্ডুলিপিটির আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দেওয়া হয়। প্রকাশের পর বইটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'পরমহংস-চরিত' রচনার ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট (১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের

পূর্বাশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফাদার লাফেঁর কাছে বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছিলেন (১৮৮৩-১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং উত্তরকালে কুশলী ইঞ্জিনিয়ার-রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপালাভ করেন এবং অতি সঙ্গোপনে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন। তাঁর সতীর্থ এবং গুরুভাই সারদানন্দজী লিখেছেন ২৬ নভেম্বর ১৮৮৩ তারিখের কথা, যে-দিন তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে সিঁদুরিয়াপট্টির মণিলাল মল্লিকের বাসায় গিয়েছিলেন ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে (এই তারিখের আগেই বিজ্ঞান মহারাজ কয়েক বার শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পান)। 'কথামৃত'তে কিন্তু হরিপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ নেই। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে হরিপ্রসন্ন কলকাতা ছেড়ে পাটনা চলে যান; শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখের তখন সবেমাত্র সূত্রপাত। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর মরজীবনের শেষ এক বছর হরিপ্রসন্ন অনুপস্থিত।

অথচ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমের বাঁশি হরিপ্রসন্নের হৃদয়ে সদাই বেজেছে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন ঃ "আমরা ভেবেছিলাম—হরিপ্রসন্ন হয়তো ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছে; এখন (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ) তাঁর কীর্তিকলাপ শুনে হুঁশ হলো—প্রভু যাকে কৃপা করেছেন, সে কী তাঁকে ভুলতে পারে? ...তাই দেখি, কতকালের পর সর্বত্যাগী হয়ে বেলুড় মঠে উপস্থিত।"[৩] হরিপ্রসন্ন আলমবাজার মঠে যোগদান করেন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট তিনি বেলুড় মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি পরিচিত হন 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় এলাহাবাদে উপস্থিত হন এবং সেখানেই তিনি সাধুজীবনের সুদীর্ঘ ৩৮ বছর অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদে তাঁর কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত হয় 'পরমহংস-চরিত' রচনাকার্য দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে)। শ্রীশ্রীঠাকুর নিষেধ করেছিলেন, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর জীবনী যেন লেখা না হয়। মানযশের আকাঙ্ক্ষা ঠাকুরের ছিল না; তিনি চাইতেন, তাঁর অশরীরী বাণীই প্রাধান্য লাভ করুক। স্বামীজীর মতও ছিল অনুরূপ; রামচন্দ্র দত্তের লেখা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী (১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ) এবং সুরেশচন্দ্র দত্তের লেখা জীবনী (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) স্বামীজীর মনঃপূত হয়নি। সিদ্ধাই নিয়ে মাতামাতি, অলৌকিক

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ ১৬৭

বর্ণনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল স্বামীজীর তীব্র সমালোচনার বস্তু। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে যখন স্বামীজী দেখলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী গ্রহণ করতে চলেছে, তখন তিনি অবতারবরিষ্ঠের উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করতে আরম্ভ করলেন।

তবুও স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী রচনা করতে সঙ্কোচবোধ করেছেন। বোধ করি, গুরুভাইদের জন্যই তিনি এই গুরুভার রেখে গিয়েছিলেন। হিন্দি ভাষার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বাণীর প্রচার-সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক দিন ধরেই পরিকল্পনা করেছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন, "একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit করতে হবে, অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক হিন্দি...গুপ্ত (স্বামী সদানন্দ) হিন্দি দিকটা লিখুক...।" ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে বলছেন—কলকাতা, মাদ্রাজ আর আলমোড়া ছাড়া বোম্বাই এবং এলাহাবাদেও কেন্দ্র খুলতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখের পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ করছেন, "তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) 'রাজযোগ' বইটির একটা হিন্দি তর্জমা করুক।" স্বামী নির্মলানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বারাণসীতে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন; দু-জনেই হিন্দি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবত স্বামীজীই স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে অনুরোধ করেন এলাহাবাদে মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে এবং হিন্দি ভাষায় 'পরমহংস-চরিত' প্রণয়ন করতে। এই প্রসঙ্গে স্বামী অপূর্বানন্দ বর্তমান লেখককে জানান (১৮ মে ১৯৮৬ তারিখের পত্রে) যে, স্বামী শিবানন্দ ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা করে স্বামীজীর 'চিকাগো-বক্তৃতা' এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর প্রথম ভাগের হিন্দি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া ঝাবরমল শর্মার সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে, স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ির মহারাজার কন্যা সূর্যকুমারী স্বামীজীর রচনার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর বদান্যতায় এবং পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর সম্পাদনায় স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ'-এর হিন্দি অনুবাদ দু-খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল।[৪]

অবশ্য হিন্দি ভাষায় রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মৌলিক গ্রন্থ বিজ্ঞান মহারাজের 'পরমহংস-চরিত'। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে এই পুস্তকটির বাংলা খসড়া তৈরি করা হয়। বাংলা থেকে হিন্দিতে ভাষান্তর-কার্যে সহায়তা করেছিলেন এলাহাবাদের আদিত্যরাম ভট্টাচার্য ও সরযূপ্রসাদ মিশ্র এবং আলিগড়ের মুন্নালাল ভকীল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভে একবার বিজ্ঞান মহারাজ বইটির কাজে আলিগড় গিয়েছিলেন; তখন স্বামীজীর অসুস্থতার খবর শুনে দ্রুত বেলুড় মঠের

৪ দ্রঃ খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ—ঝাবরমল শর্মা, পৃঃ ১২-১৩

উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে 'পরমহংস-চরিত' প্রকাশিত হয় (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫৯০টি বাণী বিজ্ঞান মহারাজ উক্ত গ্রন্থে ১১৯টি বিষয়ে বিভক্ত করেন। এক বছর পরে প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাংলা সঙ্কলনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ২৪৮টি বাণী ২৫টি অংশে বিভক্ত হয়েছিল। অতএব, রামকৃষ্ণ-বাণীগুলিকে সুচারুরূপে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে বিজ্ঞান মহারাজকেই পথিকৃৎ বলা যায়, অবশ্য মূলভাব স্বামীজীরই। ২৪ জুন ১৮৯৬ তারিখে স্বামীজী শশী মহারাজকে লিখেছিলেন ম্যাক্স মূলারকে সমগ্র 'রামকৃষ্ণ-বাণী' পাঠাতে—"সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্ম-সম্বন্ধে সব একজায়গায়, বৈরাগ্য-সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে।" শশী মহারাজ উক্তিগুলি সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন কি না জানি না, তবে ম্যাক্স মূলারের ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখি, ৩৯৫টি উক্তি মুদ্রিত কোনোরকম শ্রেণিবিভাগ ছাড়াই। সুরেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থেও শ্রেণিবিভাগ নেই। অতএব, বিজ্ঞান মহারাজই সর্বপ্রথম স্বামীজীর চিন্তা অনুযায়ী উক্তিগুলির শ্রেণিবিভাগ করেন। তাছাড়া, তিনি অনেক জায়গায় মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং হিন্দি ভক্তিশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি পাদটীকা হিসাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

'পরমহংস-চরিত'-এ বিজ্ঞানচেতনা

বিজ্ঞান মহারাজের গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অনুবাদ (ইংরেজিতে) এবং বিস্তৃত আলোচনা উল্লিখিত গ্রন্থে করা হয়েছে, যার পুনরুদ্ধৃতি বর্তমান স্বল্পকলেবর প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ (১) আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং বিজ্ঞান মহারাজের সচেতনতা, (২) হিন্দি ভক্তিসাহিত্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মানসের নিবিড় সংযোগ এবং (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি।

বিজ্ঞান মহারাজ ভূমিকায় লিখেছেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অবদান জড়বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার সমন্বয়সাধন ঃ "ভূতাত্মবাদ কা উনহোঁনে নিরাকরণ নহীঁ কিয়া, বলকি উসকো অপনি শান্তিময় অঙ্কমেঁ লেকর পবিত্র ঔর ঈশ্বরভক্ত বনা দিয়া—অর্থাৎ ভূত কো আত্মা কা সাধক বনাকর দিখলায়া।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভূতাত্মবাদ বা জড়জগৎকে তাত্ত্বিকরূপে বিসর্জন দেননি, ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে পবিত্র করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন

যে, ভূত আত্মার উপাসক অর্থাৎ জড়শাস্ত্র অধ্যাত্মবিদ্যার উপাসক। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জলসরবরাহের কারখানা' শীর্ষক বাংলা গ্রন্থে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আরো পরিষ্কার করে রামকৃষ্ণ-মানস বর্ণনা করেছেন ঃ "ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কলকারখানার আভ্যন্তরিক শক্তি অনুভব করে বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করতেন ও শিল্পাদি বিদ্যার বড়ই আদর করতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল; বালক ও সাধক সেই নবাগতকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'পরমহংস-চরিত'-এর উপদেশাবলিতে উক্ত সমন্বয়চিন্তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে, যথা ঃ

রেলওয়ে ইঞ্জিন যেমন অনায়াসে ভারি মালগাড়ি টেনে নিয়ে চলে, বড় জাহাজ যেমন অনেক ছোট ছোট নৌকাকে টেনে নিয়ে চলে, তেমনই অবতারপুরুষ বহু পাপিতাপীকে অধ্যাত্মজগতে নিয়ে যান অক্লেশে (উক্তি নং ১২৪, ১৩১, ৪৬১ ইত্যাদি)। ইলেকট্রিক বা বিজলি পাখা চললে আর হাতপাখার প্রয়োজন কী? শ্রীভগবানের কৃপালাভ করলে আর সাধনভজনের প্রয়োজন নেই (৪৭৪)। জ্বালানি গ্যাস একজায়গায় তৈরি হয়ে নলের মধ্য দিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত হয়; সেরকম একই ভগবানের প্রেরণায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে (১৫৭)।

কুম্ভকার এবং কর্মকারদের ভালভাবে লক্ষ করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কামারপুকুরে তিনি লালিতপালিত হয়েছেন, তাই কামারশালার খুঁটিনাটি বিষয়ও 'পরমহংস-চরিত'-এর বাণীতে বিধৃত (১৬৫-১৬৬, ২৫৬, ৪৬৩ ইত্যাদি)। ধাতুবিদ্যাও বাদ যায়নি। কষ্টিপাথরে যেমন সোনা ও পিতলের পার্থক্য বোঝা যায়, তেমন শ্রীভগবানই বিচার করবেন সাধুতা আন্তরিক কি না, কারণ তিনিই একমাত্র কষ্টিপাথর (৩৪৫)। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতে পাচ্ছি—দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার (২৪৭, ২৮৭), ওজনের ভারে স্প্রিং-এর প্রকৃতি (২৫৫), সূর্যরশ্মি থেকে বর্ণালি-উৎপাদক প্রিজম (৩৯৮), মুক্তার জন্মকথা (১৭১), প্রজাপতি, গুটিপোকা ও রেশম (২৮৯), সমুদ্রের নিচে মহাদেশ, পর্বত ও উপত্যকা (৫০৯) এবং আরো কত কী! শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকশিখার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন (৫০১)। তিনি চালুনি/চালনি এবং কুলো বা শূর্পের ব্যবহারের প্রকৃতির পার্থক্য বুঝিয়েছেন এবং এই পার্থক্য উপমারূপে কাজে লাগিয়েছেন সাধু ও অসাধু প্রকৃতির বর্ণনায় (২৬৬-২৬৭)। অসাধু

লোকের মতো চালুনি অসারবস্তু রেখে দেয়, সারবস্তু পরিত্যাগ করে। সাধুর কাজ বিপরীত, যেমন কুলোর ঝাঁকুনিতে (winnowing) সারবস্তু (ওপরে) থেকে যায় এবং অসারবস্তু (নিচে) পরিত্যক্ত হয়। এই উক্তিতে বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাত্ম-চেতনার অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই।

স্বামীজীর যেমন ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরেরও তা-ই। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'পরমহংস-চরিত'-এর ১২৬ নং উক্তিতে পাই ঃ "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা সম্পর্কে শাস্ত্রের বিভিন্ন উক্তির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে, যদিও তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত অনেক ঘটনা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য নাও হতে পারে।" এটি সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্কলিত উক্তির (৫৩৫) পরিপূরক (অনুবাদ নয়!)। শ্রীকৃষ্ণের কথায় যে কোনো ঐতিহাসিক সত্য নেই—একথা শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীকার করতেন না। বলা বাহুল্য, এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তথ্য ও তত্ত্ব সমান মর্যাদা পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব বক্তব্য নির্বিবাদে মেনে নিতেন—এমন বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন—অ্যামিনো অ্যাসিড, আর.এন.এ., ডি.এন.এ. ইত্যাদির সংমিশ্রণে জীবন এবং চৈতন্যের উৎপত্তি হয়েছে। 'পরমহংস-চরিত'-এর ১৯০ নং উক্তিতে পাই যে, ব্রহ্মশক্তিই জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। অতএব এখানে সমন্বয় হলো না। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্র কটাক্ষপাত করেছেন—"সায়েন্স-এর খবরের কাগজে অবতারদের কথা লেখা নেই, অতএব কী করে ওরা বিশ্বাস করবে!" এটুকু বাদ দিলে আমরা বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে একমত যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন[৫] এবং বিজ্ঞানচিন্তাকে পরমার্থ-উপাসনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দি ভক্তিসাহিত্য ও রামকৃষ্ণ-মানস

'পরমহংস-চরিত'-এর কয়েক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি (উক্তি নং ২৬৫, ৩৪৪, ৩৫০, ৪৪০, ৫১৭ ইত্যাদি), শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দি ভক্তিসাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এগুলি কী বিজ্ঞান মহারাজের উদ্ধৃতি, না শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত; তিনি কি হিন্দি জানতেন? আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে—জটাধারী, তোতাপুরী, নারায়ণ শাস্ত্রী, শিখ এবং মাড়োয়ারি ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দিতে ভালই কথা বলতেন এবং উদ্ধৃতিগুলি তাঁরই মুখনিঃসৃত।

---

৫ দ্রঃ 'রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সুবর্ণযুগে বিজ্ঞানচেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য'—অরুণকুমার বিশ্বাস, উদ্বোধন, ৯২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২১৫-২১৮, ২৪৯-২৫৬

৩৫০ নং উক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তিন প্রকার অসাধু ব্যক্তির কথা বলছেন ঃ নেশাখোর, সাধুর ভানকারী গৃহস্থ এবং কামার্ত যোগী। এটি তুলসীদাসের পদ, সুরেশচন্দ্র দত্তও উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর সঙ্কলনে (২৪৪ নং), তবে শেষ দুটি লাইনে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তুলসীদাসের দোঁহা উদ্ধৃত করেছেন এবং সম্ভবত দু-ভাবে ঐ দোঁহাটি জানতেন। যতই সেয়ানা হোক, কাজলের ঘরে থাকলে কালি লাগবে—'পরমহংস-চরিত'-এ এই উক্তিটিও (৩২২ নং) দোঁহার বিষয়বস্তু। মূল হিন্দিটি সুরেশচন্দ্রের সঙ্কলনে (২০৬ নং) পাই।

'পরমহংস-চরিত'-এর ৫১৭ নং উক্তিতে আছে যে, প্রকৃত ভক্তি এবং মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলে পাপীরাও মুক্তি পাবে। এপ্রসঙ্গে মীরাবাঈ-এর যে-ভজনটি লিপিবদ্ধ আছে—"অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে...তারো মীরাবাঈ...হরিসে লাগি রহোরে ভাই"—সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গাইতেন, একথা স্বামী অখণ্ডানন্দের সাক্ষ্যেও[৬] পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া আরেকটি ভজনের কথা স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন ঃ

"দিল রাম কো নহী জানা হৈ
তো জো জানা হৈ সো ক্যা রে?"[৭]

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে শ্রুত আরেকটি দোঁহার কথা ঃ

"জো রাম দশরথ কা বেটা
ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা।"[৮]

কথ্য হিন্দি ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন শ্রীম। ২০ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম বড়বাজারে মাড়োয়ারি ভক্তমন্দিরে গিয়েছিলেন। এক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয় ঃ

"পণ্ডিতজী হিন্দিতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দিতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের ('প্রেম কাকে বলে?') উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন। ...পণ্ডিতজী হিন্দিতে এ-সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন।"[৯]

---

৬ দ্রঃ স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৫-৩৭

৭ তদেব, পৃঃ ৩৭

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (সাধকভাব, জটাধারী ও বাৎসল্যভাব-সাধন) পৃঃ ২৩০

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (২০ অক্টোবর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ), প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ ৬৭৩

অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দি ভক্তিসাহিত্য ভালভাবেই জানতেন এবং 'পরমহংস-চরিত'-এ উদ্ধৃত হিন্দি দোঁহাগুলি তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তদের কাছে বলতেন।

মৌলিক রচনা ও নিজস্ব অনুভূতি

'পরমহংস-চরিত' যে বিজ্ঞান মহারাজের মৌলিক রচনা, সুরেশবাবুর গ্রন্থের অনুবাদ নয়—এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ) পর গ্রন্থটির আরো তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে—১৯২১, ১৯৩৬ (মহারাজের জীবদ্দশায়) এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু উক্তি প্রসঙ্গে (যথা নং ১, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ২১৬, ২৪৯, ২৫৯, ২৭৪, ৩৬১ ইত্যাদি) বিজ্ঞান মহারাজ পাদটীকা সন্নিবিষ্ট করেছেন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি উপযুক্ত সমাদর পায়নি, তার কয়েকটি কারণ দেখানো যেতে পারে ঃ (১) বাঙালি এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তগণের হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞতা এবং অনুবাদের অভাব এবং (২) 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' গ্রন্থ-দুটির জনপ্রিয়তা। তাছাড়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রচারবিমুখতা এবং নিজেকে সঙ্গোপনে রাখার প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তিনি উত্তরকালে ভক্তবৃন্দকে জানিয়েছেন, যা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধও হয়েছে এবং 'পরমহংস-চরিত'-এর 'Reminiscences of the Master' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হয়েছে; কিন্তু স্বলিখিত 'পরমহংস-চরিত'-এ আত্মগোপন করবার প্রবল তাগিদে তিনি উক্ত অভিজ্ঞতার অনেকটাই লিখে যাননি।

তবুও দেখি, গ্রন্থটিতে অনেক বিষয় ও মন্তব্য রয়েছে, যা রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না। সেরূপ কয়েকটি বিষয় ও উক্তির উল্লেখ করে বর্তমান প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি করব।

'শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনজীবনের একপর্বে সূর্যের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে শ্রীভগবানের আরাধনা করতেন'—একথা বিজ্ঞান মহারাজ লিখেছেন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কানপুর আশ্রম উদ্বোধন করার সময় বক্তৃতায় বলেছেন। উক্ত সাধনা বিশেষ বিপজ্জনক এবং সম্ভবত সেকারণে অন্যান্য গ্রন্থকার বিষয়টি বর্জন করে গিয়েছেন। একদিন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার কাছে অনুযোগ করেন, কেন মা তাঁকে মূর্খ করে রেখেছেন। তখনই তাঁর দর্শন হলো যে, মা জ্ঞানের পাহাড় এনেছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন, "কিতনি বিদ্যা লোগে?"

(কত বিদ্যা নেবে?) তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞানপিপাসা মিটে যায়! এই প্রসঙ্গটিও অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান মহারাজ আনন্দময় রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের হাবভাব নকল করে দেখাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন তিনি বউ সেজে আমাদের কাছে অভিনয় করে দেখান, কেমন করে স্ত্রীরা স্বামীদের বশ করে। মধুর কটাক্ষপাত করে স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'আরো কিছু খাও না! আরেকটা সন্দেশ কি জিলিপি?' আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোমটা টেনে অভিনয় করে চলেছেন, 'অমুক ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ কেমন একটা সাতনরি গলার হার কিনেছে, আমি যদি ঐরকম একটা পেতুম!'"[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণ আগত ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন এবং সবাইকে, বিশেষ করে বালক ও যুবকগণকে অল্পকিছু প্রসাদ দেওয়ার চেষ্টা করতেন— 'অন্তত একখণ্ড মিছরি'। আবার এ-ও বলতেন যে, সাধুদর্শন করতে গেলে সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে হয়—'অন্তত একটি ছোট হরীতকী'। এপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজ পাদটীকায় লিখেছেন যে, ভক্তগণের উচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে বেলুড় মঠ বা অন্য মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন করা এবং উৎসবের খরচ বহন করা।

'পরমহংস-চরিত'-এ আমরা বিশেষভাবে পাই, বালক হরিপ্রসন্নের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা—বর্ণপ্রথা, জাতিভেদ, রাম ও কৃষ্ণাদি অবতারপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার এবং 'আরো কত কিছু'—ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এই গোপনীয় তথ্য বালক হরিপ্রসন্ন শোনেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে।

'পরমহংস-চরিত'-এ ৫৯০টি উক্তি/প্রসঙ্গ তো আছেই, তবে কয়েকটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান, যা রামকৃষ্ণ-জীবনীর শেষে সন্নিবিষ্ট করেছেন বিজ্ঞান মহারাজ।

---

১০ উত্তরকালে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই ধরনের মজার গল্প রেঙ্গুনের মহিলা ভক্তমণ্ডলীর কাছে করেন। (দ্রঃ দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ, পৃঃ ১৪৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে ঃ "যেমন রাজা গুপ্তবেশে রাজ্য পরিদর্শনে আসেন, সেরকমই (আমার) এবারের আসা। মাত্র কয়েক জনই চিনতে পারছে।"

অনেককে বলেছেন ঃ "এখানে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো। এখানে বিশ্বাস রাখতে পারলে আর ভয় নেই।" বিজ্ঞান মহারাজের মন্তব্য ঃ "পরমেশ্বরকে বিনা ভলা কৌন অ্যায়সা কহ সকতা হৈ?" (স্বয়ং পরমেশ্বর ছাড়া আর কে এই ধরনের উক্তি করতে পারেন?)

পরমহংসদেব একজনকে বলেছিলেন, "প্রাতঃকালে আমার মন বিশ্বচরাচরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে; তখন আমায় স্মরণ কোরো।"

তিনি আরো বলেছেন, "আমি ছাঁচ বানিয়ে গেলাম। তোমরা সেই ছাঁচে জীবন গড়ে তোলো। আমার মন সর্বদাই সমাধিতে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আমি জোর করে মনকে নিচের দিকে নামিয়ে রাখি।"

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর কালীমাতার সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন যে, মামার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জন্য আরও ভাল একটা সিংহাসন বানানো যেতে পারে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দেন, "বেটা হৃদয়! তু ইসসে উত্তম আসন কৈসে বনা সকতা হৈ? এক আসন বনানে কো ক্যা কহতা হৈ? মাতা কহতী হৈঁ কি গাঁও গাঁও, ঘর ঘর মেরা আসন হোগা। ঘর ঘর লোগ মেরি প্রতিমা পুজেঙ্গে।" (ভাষা বিজ্ঞান মহারাজের)

জগজ্জননী বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আসন গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পাতা হবে। সত্যই তা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন বিশ্বজোড়া প্রতিটি ভক্তহৃদয়ে। সন্ন্যাসি-শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই শুভসংবাদ গ্রন্থরূপে গেঁথে দিলেন বিজ্ঞান মহারাজ।

(উৎস ঃ উদ্বোধন ৯৮তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)